যৌবরাজ্য

যৌবরাজ্য

শৈবাল মিত্র

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন ১৩৬১ সন

প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদপট
শ্রীগণেশ বসু
হাওড়া-৪

ব্লক
মডার্ণ প্রসেস
কলেজ রো
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদমুদ্রণ
ইম্প্রেসন হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

মুদ্রক
শ্রীনেপালচন্দ্র পান
সোনালী প্রেস
২/১, ভোলানাথ পাল লেন
কলকাতা-৬।

অভিষেক

স্নান, খাওয়া সেরে ঘরের দরজা ভেজিয়ে সিগারেট টানছিল মিলিন্দ। দরজায় হাল্কা টোকার আওয়াজ শুনে সিগারেট আড়াল করে দরজার সামনে গিয়ে মিলিন্দ দাঁড়াতে ভেজানো পাল্লা খুলে ঘরে ঢুকল নবনীতা। এক পলক মিলিন্দর দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে নবনীতা বলল, হ্যাপি বার্থ্ ডে।

বাদামি কাগজে মোড়া একটা প্যাকেট মিলিন্দর হাতে দিল নবনীতা। আজ যে তার জন্মদিন, উনিশ শেষ, কুড়ি শুরু মিলিন্দ ভুলে গিয়েছিল। নবনীতা এসে শুভেচ্ছা, উপহারে কথাটা মনে করিয়ে দেওয়ায় খুশি হলো মিলিন্দ। বাড়িতে কেউ মনে না রাখলেও কবে, কোথাও, কলেজে বা আড্ডায় মিলিন্দর মুখ থেকে জন্মতারিখ শুনে নবনীতা যে খেয়াল রেখেছে, এটা কম কথা নয়। নবনীতার দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে মিলিন্দ বলল, থ্যাংক্যু।

নবনীতার ফর্সা চিবুকে, টিকোলো নাকে গুঁড়ো ঘাম শুকিয়ে যাচ্ছে। ফ্যানের হাওয়ায় অল্পস্বল্প উড়ছে পিঠে ছড়ানো কোঁকড়া, এলো চুল। মোড়ক খুলে দুটো নতুন বই হাতে নিয়ে গন্ধ শুঁকলো মিলিন্দ। তারপর পড়ল বই দুটোর নাম। বই কিনে নতুন বই-এর সুবাস বুকে ভরে নেয় মিলিন্দ। স্নিগ্ধ কাকজ্যোৎস্নার মতো আলোয় ভেসে যাচ্ছে শরতের সকালের আকাশ।

মিলিন্দর মুখচোখের মুগ্ধতা নজর করে নবনীতা বলল, এই প্রথম হাসতে দেখলাম তোমাকে।

নবনীতার কথাটা বিদ্যুতের চাবুক মেরে সজাগ করে দিল মিলিন্দকে। বইদুটো পড়ার টেবিলে রেখে গম্ভীর মুখে সে বলল, এখনই বেরোতে হবে আমাকে।

নবনীতার দিকে না তাকিয়ে কাপড়ের ঝোলা ব্যাগে বই-খাতা ঢোকাতে শুরু করল মিলিন্দ। মজা করে মিলিন্দকে খোঁচাতে গিয়ে তার মেজাজ বিগড়ে দেওয়ার জন্যে আপসোস করছে নবনীতা। মিলিন্দ এতো অনুভূতিপ্রবণ, জটিল, যে, কোনো কথায় তার কী প্রতিক্রিয়া হবে, বুঝতে পারে না নবনীতা। কিন্তু এই মুহূর্তে তার কথায় মিলিন্দ অখুশি, টের পেয়ে নবনীতা আর মুখ খুলল না।

মিলিন্দ জানে, ছেলেবেলা থেকেই তার হাসি কম, সে হাসতে পারে না। অনেক ভেবেও হাসির এই অভাবের কারণ সে খুঁজে পায় নি। বলা ভুল হলো। না হাসার একটা কারণ যে হাসির কোনো কারণই নেই, অকারণে মূর্খরাই হেসে গড়িয়ে পড়ে, এ ধারণা তার আছে। সে মনে করে এই মূর্খরা মানুষ নয়, তাদের করুণাও করা যায় না। তাই তার গোমড়া মুখে হাসি ফোটার কথা নবনীতা বলতে মিলিন্দর জন্মদিনের আনন্দ, বিস্ময় হাওয়ায় উবে গেল। টেবিল থেকে জন্মদিনে নবনীতার উপহার দুটো বই ঝোলায় ঢোকাতে গিয়েও রেখে দিল সে। মিলিন্দর মনে হলো, তার জন্মদিন, বাবা-মা ভুলে গিয়ে কোনো অন্যায় করে নি। সাত ছেলেমেয়ের জন্মদিন মা,

বাবার মনে রাখা সম্ভব নয়। মনে রাখলেও জন্মদিন নিয়ে আদিখ্যেতা করার সঙ্গতি তার মা বাবার নেই। সে বড়োলোকের লাল্টু ছেলে নয়। তার কোনো অভিমান সাজে না। দরকারী বই খাতা ঝোলায় পুরে মিলিন্দ সোজা হয়ে দাঁড়াতে তার মুখ দেখে কিছু বুঝতে চাইল নবনীতা।

হাতঘড়ি নজর করে মিলিন্দ বলল, ইস্, সওয়া দশটা বেজে গেছে। ঠিক সময়ে বোধহয় কলেজে পেঁছতে পারবো না।

আমিও কলেজে যাবো, নবনীতা বলল।

স্কুলে যাওয়ার পথে মিলিন্দর ভাইবোনেরা সিঁড়ি থেকে আড়চোখে তার ঘরের দিকে তাকাচ্ছে। মিলিন্দর পরের বোন, ষোল বছরের মুন্নি, ইলেভেনে পড়ে। ঘরের ভেতরটা এক চমক দেখে মুচকি হেসে সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে গেল সে। হালকা খয়েরি রঙের, ঘন গোঁফদাড়ির জঙ্গলে আঙুল চালাতে চালাতে আরো গম্ভীর হলো মিলিন্দ। বিরস মুখে রাস্তায় এসে দাঁড়ালো সে। পাশে নবনীতা। হাঁটা পথে কলেজ দশ মিনিট। কিছুটা এগিয়ে নবনীতা বলল, এ্যাই মিলিন্দ, দক্ষিণেশ্বর যাবে ?

কেন ?

মিলিন্দর প্রশ্ন শুনে নবনীতার সব আগ্রহ দপ করে নিভে গেল। শরতের এই ঝলমলে, সুন্দর সকালে দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে যাওয়ার কারণ যে জানতে চায়, তাকে কী জবাব দেবে নবনীতা ?

বিবেকানন্দ রোড দিয়ে পাশাপাশি দুজন হাঁটছে। মিলিন্দ কথা বলছে না। নবনীতাও চুপ। কথা বলার ভরসা পাচ্ছে না সে। মিলিন্দ এতো তাড়াতাড়ি হাঁটছে যে তার সঙ্গে তাল রাখতে দম আটকে যাচ্ছে নবনীতার। সে বলল, একটু আস্তে।

গতি কমালেও বিরক্ত বিলিন্দ ভাবলো, আমার সঙ্গে কে আসতে বলেছিল তোমাকে ?

কথাটা বলতে গিয়েও চুপ করে গেল সে। কোনো বান্ধবী, সহপাঠিনীকে সে দশ, পনেরো মিনিটের বেশি সহ্য করতে পারে না। মেয়েরা ন্যাকা, পুরুষদের সঙ্গে আড্ডা মারা, গল্প করার অযোগ্য। কলেজে পড়া মেয়েরা আবার এককাঠি সরেস, তারা সফিস্টিকেটেড ন্যাকা। নবনীতার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার প্রস্তাব তাই এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিয়েছে মিলিন্দ। একপলক নবনীতার শুকনো মুখের দিকে নজর চালিয়ে কিছু ভেবে মিলিন্দ বলল, আজ দুপুরে একটা ইণ্টারকলেজ ডিবেটে যেতে হবে আমাকে।

নবনীতা বলল, আমিও জানতাম, ভুলে গেছি।

এক সেকেণ্ড চুপ থেকে নবনীতা প্রশ্ন করল, কখন শুরু ?

তিনটেয়।

জবাব শুনে একবার মিলিন্দর দিকে তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নিল নবনীতা। নবনীতার মুখ দেখে সে কী বলতে চায়, মিলিন্দ বুঝল। দক্ষিণেশ্বর থেকে তিনটের মধ্যে ফিরে ডিবেটে যাওয়ার কোনো অসুবিধে নেই। মিলিন্দও ভালো জানে। কিন্তু একজন সহপাঠিনী, বান্ধবীর সঙ্গে একা দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার ইচ্ছে তার নেই। বরং

যথেষ্ট অনিচ্ছে আছে। দু'তিন ঘণ্টা কী বিষয়ে সে কথা বলবে নবনীতার সঙ্গে ?

নবনীতা নীরব। তার কপালে, নাকের পাটায় বিজ-বিজ ঘাম। চাপা এক ব্যক্তিত্ব আছে নবনীতার। আর পাঁচজন সহপাঠিনীর মতো নবনীতা ছেলেন্যাকড়া, হ্যাহ্যা পার্টি নয়। সে বেশ সংযত, গম্ভীর, প্রখর তার আত্মসম্মানবোধ। শুধু মিলিন্দকে দেখে একটু অন্যরকম হয়ে যায়। তার কাছে বারবার ছুটে আসে। কেন আসে, কোন্ প্রত্যাশায়, মাথায় ঢোকে না মিলিন্দর।

মাথার ওপর শরতের নীল আকাশ। রাস্তার পাশে সবুজ পাতাভর্তি আচমকা একটা গাছ, মানুষ, গাড়ি, অদৃশ্য অনেক রঙ, পাখি, রামধনুর মতো মিলিন্দর মাথায় স্থির হয়ে থাকে। খুশির গোপন মৌতাতে বুঁদ হয়ে যায় সে। তার পাশে নবনীতা নেই, কলেজ, মা, বাবা, বাড়ি, আধডজন ভাইবোন নেই, এখন সে মিলিন্দ বোস, মিলিন্দ দ্য গ্রেট, একা। তুড়ি মেরে দেশ, দুনিয়া, সময়, ইতিহাস নস্যাৎ করে দিতে পারে সে। নবনীতার কথা শুনে তার মনে যে বিরক্তি জেগেছিল, হঠাৎ কেটে গেছে। ভালো লাগতে শুরু করেছে চারপাশ। কলেজে গিয়ে মনের মতো বন্ধুদের সঙ্গে এখন চুটিয়ে আড্ডা দিতে পারবে সে। ছেলে বন্ধুদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটাতে কোনো অসুবিধে হয় না তার। বন্ধুরা তাকে পেলে জমে যায়, কান খাড়া করে তার কথা শোনে। পৃথিবীর সব খবর, জ্ঞান যেন মিলিন্দর হাতের মুঠোয়। তার মতো বোদ্ধা, বুদ্ধিমান পৃথিবীতে নেই। তার মতো সুখিই বা কে আছে। মাঝে মাঝে এক গভীর, গোপন দুঃখও তাকে বিব্রত, বিপন্ন করে। অকারণে মনটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেলে সে চুপ হয়ে যায়। বন্ধু, আড্ডা কিছুই ভালো লাগে না। একা, নিজের ঘরে সে তখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপচাপ বসে থাকে। বই পড়ে।

কলেজের গেটের সামনে নচিকেতার সঙ্গে কল্যাণ আর অতনু গল্প করছে। কল্যান, অতনু এ কলেজের ছাত্র নয়, অন্য কলেজে পড়ে। মিলিন্দর স্কুলের বন্ধু ওরা। তার টানেই এখানে রোজ আসে। মিলিন্দর কলেজের ডিবেট্ সেক্রেটারি হলো নচিকেতা। মিলিন্দকে দেখে হৈ হৈ করে উঠল তিনজন। নবনীতা কলেজে ঢুকে যেতে কল্যাণ, অতনুর সঙ্গে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরালো মিলিন্দ। রাস্তার মোড়ে কৃষ্ণচূড়ার গাছের তলায় বলাকাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, একটু আসছি, বলে প্রায় হুড়কে বেরিয়ে গেল নচিকেতা। তার যাওয়ার ভঙ্গি দেখে কল্যাণ বলল, পচা আলু। একসঙ্গে পাঁচ ছ'জনের সঙ্গে প্রেম করছে।

অতনু বলল, নচিকেতার এলেম আছে।

গেটের পেছনে ছড়ানো, বিশাল কলেজ চত্বরে, লম্বা টানা সিঁড়ির ধাপে ছেলে-মেয়েদের ছোটোবড়ো জটলায়, মিলিন্দকে দেখে চাপা কথা, উত্তেজনা কানাকানি জাগলো। রোজই এরকম হয়। মিলিন্দ গেটের সামনে এসে দাঁড়ালেই বিদ্যুৎপ্রবাহের মতো, এক তীব্র শিহরন ছাত্রীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। পেছনে না তাকিয়েও সে ঢেউ টের পায় মিলিন্দ। জ্বলন্ত সিগারেটে টান দিয়ে টুকরোটা পায়ের তলায় পিষে দিল মিলিন্দ।

নবনীতার দিকে তাকিয়ে আছে কল্যাণ। কলেজের ভেতরে নবনীতা চলে যাবার কয়েক সেকেন্ড্ পরে ফোঁস করে শ্বাস ফেলে কল্যাণ বলল, অসাধারণ!

চাই?

অতনু খোঁচাতে মিলিন্দর দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে কল্যাণ বলল, ক্ষেপেছিস। কার জিনিস কে নেয়?

মিলিন্দ আবার চটলো। গম্ভীর গলায় বলল আমার সামনে মেয়েদের জিনিস বলবি না। কোনো মেয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই। কলেজের যে কোনো মেয়ের সঙ্গে, নবনীতার সঙ্গেও, প্রেমপীরিতের ইচ্ছে হলে, করতে পারিস তুই।

মিলিন্দর গলার স্বর শুনে ভড়কে গেল কল্যাণ তখনই গেটের কাছে পেতলের ভারী ঘণ্টায় কলেজ শুরুর গম্ভীর ধাতব ধ্বনি বাজলো। ক্লাস আছে জেনেও গেটের বাইরে সবান্ধবে দাঁড়িয়ে আছে মিলিন্দ। ফার্স্ট ইয়ারের শুরুতে কয়েকমাস ক্লাসে যাওয়ার পর আর যাচ্ছে না সে। ক্লাসে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। এ কোনো শিক্ষা নয়, ক্লাস ঘরে বসে কিছু শেখার নেই, এই হলো মিলিন্দর সিদ্ধান্ত। পচা, গলা সেই ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার বমি গিলে কী লাভ? লেখাপড়া শেখানোর নামে তারুণ্য যৌবনকে বন্দী করে রাখার ষড়যন্ত্র এ শিক্ষাব্যবস্থা। কলেজে ঢোকার এক বছরের মধ্যে এ ধারণা, মিলিন্দর মাথায় চেপে বসেছে। তারপর থেকে আনুষ্ঠানিক লেখা-পড়ায় গুলি মেরে দিয়েছে সে। তাছাড়া অধ্যাপকদের লেখাপড়া, জ্ঞানের বহর দেখেও ক্লাস সম্পর্কে তার মনে অবজ্ঞা, অবহেলা ঘন হয়েছে। বেশির ভাগ অধ্যাপক অশিক্ষিত, নোটবই মুখস্থ করে কোনো রকমে কুঁতিয়ে এম. এ. পরীক্ষাটা উতরে গেছে। এম. এ. পাশ করে কলেজে মাস্টারি পাওয়ার পর আর একটাও বই পড়ে নি শতকরা আশিভাগ মাস্টার ফাঁকিবাজ, ভণ্ড, আধুনিকতার ধার ধারে না। একুশ শতকের দরজায়, হাই টেক, হাই টাচের যুগেও তারা মান্ধাতার আমলে পড়ে আছে বব্ ডিলানের নাম শোনে নি। গ্রাম্‌চি, কার্ল রোজার্সের নাম শুনে হাবার মতো তাকিয়ে থাকে। মিলিন্দর শিক্ষক হবার যোগ্য এরা কেউ নয়। অযোগ্য শিক্ষকদের মূর্খতার হাত থেকে রেহাই পেতে মিলিন্দ ক্লাস করা ছেড়ে দিয়েছে। পরীক্ষায় পাশ করা নিয়ে সে ভাবে না। তার বন্ধু, অনুগামী, গুণমুগ্ধরাও একমত। তারাও ক্লাসে যাওয়া ছেড়ে দিয়ে মিলিন্দকে ঘিরে থাকে। তার মুখে রোজ নতুন নতুন ইংরিজী পেপারব্যাকের নাম শুনে কিনে নিয়ে পড়ে ফেলে এবং বলে, আমাদের খাতায় কোনো পরীক্ষক কলম ছোঁয়াতে সাহস পাবে না।

তাদের কথা শুনে হাসিমুখে দেশলাই বাক্স বাজায় মিলিন্দ। বারীনের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট নিয়ে মিলিন্দ বলল, জোসুয়া ডি কাস্ত্রোর লেখা জিওগ্রাফি অব হাঙ্গার বইটার নতুন সংস্করণ বাজারে এসেছে। বইটা পড়বি।

খাতায় তাড়াতাড়ি বইটার নাম লিখে নিল বারীন। মৃণাল বিদেশী উপন্যাসের ভক্ত। সে খোঁজ করতে মিলিন্দ বলল, আম্‌বার্তো একোর লেখা, দ্য নেম অব দ্য রোজেস্, প্রাইমো লেভির পিরিয়ডিক্ টেব্‌ল্।

তিনটের মিনিট পাঁচ সাত পরে দারভাঙা হলে দলবল নিয়ে ঢুকে মিলিন্দ দেখল, বিতর্ক প্রতিযোগিতা শুরু না হলেও বিচারকর্তারা নিজেদের চেয়ারে বসে গেছে। হলে বেশ ভিড়। ফি বছরের মতো মফস্বল আর কলকাতার বহু কলেজের প্রতিযোগী এ'বারও এসেছে। এটা খুব নামী প্রতিযোগিতা। শ্রেষ্ঠ বক্তাকে সোনার মেডেল দেওয়া হয়। ঠিক সোনার নয়, স্বর্ণখচিত রৌপ্যপদক। বছরের পর বছর রৌপ্যপদককে কী করে যে উদ্যোক্তারা সোনার মেডেল বলে চালাচ্ছে, মিলিন্দ বুঝতে পারে না। একতাল রুপোর মধ্যে এককণা সোনা থাকলে রুপোতে কি সোনার গুণ বর্তায়? মানুষের বিচারবুদ্ধি ভারী বিচিত্র, অদ্ভুত। অবশ্য সোনা, রুপোয় মিলিন্দর কিছু যায় আসে না। অনেক পুরস্কার পেয়ে, পুরস্কারের মোহ কেটে গেছে তার। পুরস্কারের ক'টা যে তার ঘরে আছে, বলা মুশকিল। এমনও ঘটেছে, পুরস্কার নিয়ে সে পুরস্কার তার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছোয় নি। গত বছরে এই দারভাঙা হলের প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ বক্তার পুরস্কার না পেয়ে অভিমানে, অপমানে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান হিসেবে পাওয়া বড় কাপটা সে কলেজের পাশে হরির পানের দোকানে রেখে গিয়েছিল। সে কাপ ছ'মাস পরে তার বিতর্কের পার্টনার, মৃণাল উদ্ধার করে বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল।

প্রতিযোগিতা শুরু হবার মুখে মিলিন্দকে সদলে ঢুকতে দেখে হলের মধ্যে উত্তেজনা ছড়ালো। শুকিয়ে গেল অনেক প্রতিযোগীর মুখ। গত পাঁচ-সাতটা বিতর্ক প্রতিযোগিতায়, মিলিন্দ যেখানে গেছে, সেখানেই সেরা বক্তার সম্মান পেয়েছে। ফলে বিতার্কিকদের মনে তৈরী হয়েছে মিলিন্দ-ভীতি। প্রতিযোগীদের মুখ দেখে মজা পেল সে। হলের মাঝখানে একটা খালি বেঞ্চে কল্যাণ, অতনু, বারীন, মৃণালকে নিয়ে বসল মিলিন্দ। ডিবেট সেক্রেটারি নচিকেতা মঞ্চের কাছে গিয়ে তার কলেজ টিমের আসার খবর জানাল উদ্যোক্তাদের। নিজের জায়গায় ফেরার সময় সামনের বেঞ্চে নবনীতাকে দেখে তার পাশে বসার ইচ্ছে ছিল নচিকেতার। নবনীতার গম্ভীর মুখ, ঠাণ্ডা চোখ দেখে ভরসা না পেয়ে মিলিন্দর পাশে বসল নচিকেতা।

নচিকেতাকে কল্যাণ বলল, গুরু, শুধু নবনীতা নয়, তোমাদের কলেজের আরো মেয়ে এসেছে। এ সবই কি তোমার লীলা?

জবাব না দিয়ে নচিকেতা হাসল। কোনো বিতর্ক প্রতিযোগিতায় মিলিন্দ নাম দিলেই কলেজের কিছু ছেলেমেয়ে সেখানে ভিড় করে। এদের মধ্যে বিতর্কপ্রেমীও আছে কয়েকজন। কিন্তু বেশির ভাগ আসে মিলিন্দর টানে। কলেজে ভর্তি হবার পর এখনও দু'বছর হয় নি, এর মধ্যেই কলেজের হিরো সে। কলেজে ঢোকার পর প্রথম দু'মাসে কলেজের তিন সেরা বিতার্কিককে প্রায় টোকা মেরে মিলিন্দ হটিয়ে দিয়েছে। প্রথম বছরে তিনটে সারাবাংলা প্রতিযোগিতায় সেরা বিতার্কিক হয়েছে সে। সেই

থেকে তার জয়ের রথ, বাঁটরা, বহরমপুর, এলাহাবাদ যেখানেই গেছে, সেখানেই ধরাশায়ী করেছে প্রতিযোগীকে। সব প্রতিযোগিতাতেই সে এক নম্বর, অদ্বিতীয়। এই দু'বছরে যে কতো মেডেল, পদক, কাপ, বই সে পেয়েছে, তার হিসেব নেই। বই ছাড়া বাকি জিনিস সে বাড়িতে রাখে নি। মঞ্চে দাঁড়ালেই তার মাথার মধ্যে এক অলৌকিক রঙমশাল জ্বলতে থাকে। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে যা দেখেছে, পড়েছে, তীব্র আলোয় সব তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আবছা, ধোঁয়াটে চিন্তা, যুক্তি স্বচ্ছ, ধারালো হয়। জিভের ডগায়, কি ইংরিজি, কি বাংলা, শব্দস্রোত দীপ্তিদাহে বিদ্যুতের মতো ঝলসে উঠতে থাকে। অন্যমানুষ হয়ে যায় সে। সারা পৃথিবী, বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার, সমস্ত যুক্তি, তর্ক, ফাঁকা, ফাঁপা, ভুয়ো প্রমাণে কচুকাটা করার জন্যে নিষ্ঠুর নৃশংস এক জেদ পেয়ে বসে তাকে।

আজকের বিতর্কের বিষয়, সভার মতে সমাজতন্ত্রই মানুষের মুক্তির একমাত্র পথ।

ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, যুক্তির ঝড় তুলেছে বক্তারা। প্রায় দশ জন বক্তার পর মিলিন্দর পার্টনার মৃণালের ডাক পড়লো। কলেজ টিমে প্রায় সব সময় মিলিন্দর সঙ্গী হয় মৃণাল। মৃণাল পড়ে মিলিন্দর এক ক্লাস ওপরে। মিলিন্দ ভর্তি হবার আগে মৃণাল ছিল কলেজের একনম্বর বিতার্কিক। এখন সে শুধু মিলিন্দর সঙ্গী, তাকে ছাড়া কোথাও যেতে ভরসা পায় না মৃণাল। প্রস্তাবের পক্ষে অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের সমর্থনে বলা শুরু করেছে মৃণাল। প্রস্তাবের পক্ষেই বলতে চেয়েছিল সে। মিলিন্দ অরাজি হয় নি। বলা যায় খুশিই হয়েছিল সে। মিলিন্দ জানে, নিজের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেই তার বক্তব্য জোরদার হয়, আগুনের মতো জ্বলে ওঠে। তাই যেকোনো বিতর্কে সে প্রস্তাবের বিরুদ্ধে থাকে। নিজের বিশ্বাসকে প্রচণ্ডতম আঘাত করে বিশ্বাসের শক্তি যাচাই করে নেয়, মজবুত করে বিশ্বাসের ভিত।

মৃণাল ভালো বক্তা। মিলিন্দকে সঙ্গী পেলে মৃণালের বক্তৃতার দাপট আরো বেড়ে যায়। সমাজতন্ত্রের সমর্থনে যুক্তিনিষ্ঠ, তথ্যবহুল, তীক্ষ্ণ ছ মিনিটের বক্তব্য রেখে মৃণাল মঞ্চ থেকে নেমে যেতে মিলিন্দর ডাক পড়লো। হলের ফিসফিস কথা, চাপা গুঞ্জন, মিলিন্দর নাম শুনে মুহূর্তে থেমে গেল। প্রস্তাবের বিরোধিতা করার জন্যে মঞ্চের ওপর গিয়ে দাঁড়ালো মিলিন্দ। সমাজতন্ত্রের সমর্থকদের যুক্তি, ব্যাখ্যা ক্ষুরধার আক্রমণে তছনছ করে নিজের মতামত প্রতিষ্ঠার কাজে মন দিল। সব দর্শনই তাৎক্ষণিক, আপেক্ষিক। ধর্মীয়, রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক সমস্ত দর্শন, সামাজিক উপাদানের পরিবর্তনের সঙ্গে বিবর্ণ, বাসি হয়ে যায়। দর্শন হিসেবে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রও একদিন জীর্ণ হয়ে যাবে। যীশুর করুণাধর্ম, হজরত, মহম্মদের ইসলামী সাম্যবাদ, গৌতমবুদ্ধের নির্বাণতত্ত্ব, চৈতন্যের প্রেমধর্ম, গুরু নানকের মানবতাবাদ, মানবজীবনে সাময়িক নিরাময়, শান্তি, আরাম দিয়ে শেষ পর্যন্ত, নিষ্প্রাণ, আচার-সর্বস্ব হয়ে গেছে। আজ যা প্রগতিশীল, কাল তা রক্ষণশীল, জড়, হতেই পারে। এক সময়ের সাড়াজাগানো ঘটনা অল্প কাল পরেই জোলো, তাৎপর্যহীন হয়ে যায়।

সময়বন্ধ কোনো দর্শনই শাশ্বতের দায়িত্ব নিতে পারে না। আজকের বামপন্থা, সমাজতন্ত্র কাল যখন একটা প্রতিষ্ঠান হবে, তখন সেই প্রতিষ্ঠানও হয়ে উঠবে শোষণ আর হিংসার হাতিয়ার। এ ঘটনার জন্যে শুধু তত্ত্ব, ব্যাখ্যা, নেতারা নয়—সমাজ, ইতিহাসে বস্তুগত বিকাশের ধারা, আন্তর্সম্পর্কও দায়ী। প্রশাসনের সঙ্গে বামপন্থা যুক্ত হলে নিষ্ঠুরতম আমলাতন্ত্র, রক্তপিপাসু অর্থনীতির জন্ম হয়। আদর্শবাদ এবং আমলাতন্ত্র কথনও সহবাস করতে পারে না। আদর্শ মারা যায়।

এক অচেনা ঘোরের মধ্যে ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজবিবর্তন, বিপ্লবের সমস্ত কেতাবী তত্ত্বকে বেপরোয়া আক্রমণ শুরু করল মিলিন্দ। তার যুক্তি, বিচার এতোটুকু শিথিল, ঘোলা হলো না। চোখা, মানানসই ইংরেজি শব্দ আগুনের ফুলকির মতো তার জিভ থেকে ছড়িয়ে পড়তে থাকলো। মিলিন্দর নিজেকে বার্ক, ডিস্রেলির সমান মনে হলো। পাঁচ মিনিটের প্রথম ঘণ্টা বাজতে ছড়িয়ে পড়া যুক্তি বাকী এক মিনিটে গুছিয়ে ফেলার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে। উপসংহারে সে বলল, সমাজতন্ত্র কোনো আদর্শ নয়। বলা যায়, সমাজতন্ত্র একটি বিশেষ সময়ের পরীক্ষামূলক কর্মসূচি। সামাজিক রূপান্তরের এক অন্তর্বর্তী, অস্থায়ী স্তর।

একটু দম নিয়ে মিলিন্দ বলল, মানুষের সচেতনতাই তার শেষ হাতিয়ার। সচেতনতা মানে হাজার হাজার বছরের অর্জিত জ্ঞান, যুক্তি, অনুভব, উপলব্ধির সার। একে গতিময় প্রজ্ঞাও বলা যায়। ছকবাঁধা সমাজতন্ত্র, ধনতন্ত্রের চেয়ে গতিময় প্রজ্ঞার চর্চা তাই বেশী জরুরী।

বক্তব্য শেষ। লম্বা শ্বাস ফেলে মঞ্চ থেকে বন্ধুদের পাশে এসে বসার আগে মিলিন্দর জন্যে নির্ধারিত ছ মিনিট শেষ হওয়ার বেল বাজলো। সূচিভেদ্য স্তব্ধ হলঘর, শ্রোতাদের মুখে চোখে কুহক। বিশ্বাস, অবিশ্বাসের এই কুহকই তৈরি করতে চেয়েছে মিলিন্দ। দৃপ্ত পায়ে চেয়ারে ফিরে এলো সে। তখনও তার মাথায় হাজার হাজার যুক্তি, প্রতিপাদ্য, মহাকাল, পৃথিবী ঝমঝম করে বাজছে।

একঘণ্টা পরে রুপোর তৈরি সোনার পদক পকেটে পুরে শ্রেষ্ঠ বক্তা, মিলিন্দ বোস দলবল নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের একতলার ক্যাম্পাসে এসে দাঁড়ালো। বিকেলের আলো তখন মরে এসেছে। মিলিন্দকে ঘিরে খলবল করে কথা বলছে একঝাঁক ছেলে-মেয়ে। পকেট থেকে মেডেল বার করে তরুণকে মিলিন্দ বলল, কফি হাউসে কাটলেট, কফির অর্ডার দিচ্ছি আমরা। বৌবাজারের কোনো দোকানে এটা বেচে কিছু টাকা তাড়াতাড়ি নিয়ে আয় তুই।

মিলিন্দর কথা শুনে ঘাবড়ে গেল তরুণ। নচিকেতা ভয় পেল। ডিবেট সেক্রেটারি হিসেবে পদক বিক্রি ঠেকাবার জন্যে সে বলল, এটা বোধহয় ঠিক হবে না। কলেজে প্রিন্সিপ্যাল, প্রোফেসার, ছেলেমেয়েরা মেডেল দেখার জন্যে কাল অপেক্ষা করবে। না দেখাতে পারলে!

নচিকেতাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে মিলিন্দ বলল, কফিহাউসের খরচ তাহলে তোর।

নবনীতা বলল, আমি খাওয়াবো তোমাদের।

তরুণ বলল, নবনীতা হাজরা যুগযুগ জিও।

মেডেল বিক্রির বিপদ কেটে যেতে সকলে খুশী হলেও, নচিকেতার প্রস্তাব জিতে যাওয়ায় মিলিন্দ চটে গেল। নচিকেতাকে জব্দ করার এরকম সুযোগ হাতছাড়া হচ্ছে দেখে ঘন হলো তার জেদ। তাছাড়া একটা পদক নিয়ে এ হ্যাংলামি তার অসহ্য। কতো পদক, পুরস্কার তার হারিয়ে গেছে, নষ্ট হয়েছে। হরির পান সিগারেটের দোকান খুঁজে তার দু'চারটে মেডেল, পদক এখনও পাওয়া যাবে। হরির কাছ থেকে চেয়ে সেগুলো বাড়ি নিয়ে যাওয়ার তাগিদ মিলিন্দ কোনোদিন অনুভব করে নি। জমিয়ে, সাজিয়ে রাখার মতো দামী কোনো কিছু আজ পর্যন্ত নজরে পড়ে নি তার। একটা সামান্য মেডেল আগলে রাখার জন্যে নচিকেতার হ্যাংলাপনা দেখে তাই গা ঘিনঘিন করছে মিলিন্দর।

নচিকেতাকে নবনীতা বাঁচিয়ে দিচ্ছে দেখে ঠাণ্ডা গলায় মিলিন্দ বলল, মেডেল বেচেই আজ আমরা কফিহাউসে খাবো।

নবনীতার ফর্সা মুখ কালো। সে মুখ সকাল দশটার উজ্জ্বল, আনন্দিত একটা মুখ, জন্মদিন, একজোড়া নতুন বই-এর সুবাস মনে করালো মিলিন্দকে। এখনই বাড়ি ফিরে একটা বই খুলে বসলে বেঁচে যায় সে। বাড়ি ফেরার তাগিদ বোধ করল মিলিন্দ। নবনীতা বলল, আমি চলি।

কেউ কিছু বলার আগে রাস্তা পেরিয়ে বাসস্টপের দিকে নবনীতা চলে গেল। মিলিন্দর মাথায় দপ করে ওঠে মস্ত গোঁ। নচিকেতার দিকে মেডেলটা ছুঁড়ে দিয়ে সে বলল, তোর শ্রদ্ধেয় প্রিন্সিপালবাবাকে কাল এটা পৌঁছে দিস।

পদকটা নাচিকেতা লুফতে না পারায়, ফুটপাতে পড়ে গেছে। ভয়ে গুটিয়ে পদকটা এক সেকেন্ড নজর করে তুলে নিল নচিকেতা। বলল, আধ ঘণ্টার মধ্যে কফিহাউসে ফিরে আসছি।

তরুণকে ডেকে ধর্মতলার একটা চলন্ত ট্রামে লাফিয়ে উঠলো সে।

য়ুনিভার্সিটির ভেতর থেকে এক অচেনা মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বেরিয়ে এলো মৃণাল। মেয়েটির সঙ্গে মিলিন্দর পরিচয় করিয়ে মৃণাল বলল, কমলকলি। রামমোহন কলেজের ছাত্রী, ছাত্র সংসদের সম্পাদক, আমার বোন ইন্দ্রাণীর বন্ধু।

ঠাণ্ডা, উদাসীন চোখে কমলকলিকে এক লহমা দেখে আবছা হাসলো মিলিন্দ। কমলকলি বলল, আপনার ডিবেট আগেও শুনেছি আমি। আজ বেস্ট স্পিকার হলেও আপনার বলা খুব ভালো হয়নি।

কমলকলির কথা শুনে মিলিন্দ বিস্মিত, হতবাক। সামনে দাঁড়িয়ে কেউ তাকে ডোবাতে পারে, সে কখনও ভাবেনি। খুঁটিয়ে সে দেখলো কমলকলিকে। কমলকলির দু'চোখের ঝকঝকে কালো তারায় গভীর, অকুণ্ঠিত দৃষ্টিতে ফিকে বিষাদ। সরু, মসৃণ চিবুক। এক হারা ছিপছিপে লম্বা শরীর। গায়ের রঙ কি উজ্জ্বল শ্যাম? নাহ্, ঠিক শ্যাম নয়। নরম, উর্বর পলিমাটির সঙ্গে গুঁড়ো সোনা, বা হলুদবাটা মেশালে রঙের এরকম আভা জাগে। কমলকলির শ্যামলা দেহবর্ণে সেই সোনালী

আভা। লাল ডোরাকাটা সবুজ তাঁতের শাড়ির আঁচল পিঠে জড়ানো। লম্বা, কালো বিনুনি কোমরের তলা ছুঁয়েছে। পোশাকে, প্রসাধনে কোনো বাড়াবাড়ি নেই। চার-পাঁচজন ছেলেমেয়ের সঙ্গে আজকের বিতর্ক, কে কেমন বলেছে, আলোচনা করছে কমলকলি। একবার আড়চোখেও সে দেখলো না মিলিন্দকে। মিলিন্দ বুঝল, আর পাঁচজন মেয়ের থেকে কমলকলি আলাদা।

কফিহাউসে মৃণাল ধরে নিয়ে যেতে চাইলে কমলকলি বলল, আজ ব্যস্ত, পরে একদিন যাবো।

কীসের ব্যস্ততা ?

মৃণালের প্রশ্নে কমলকলি বলল, দেখা করতে হবে একজনের সঙ্গে।

সে কে ?

চাপা রহস্যের গলায় মৃণাল প্রশ্ন করতে তার দিকে স্নিগ্ধ হাসি ছড়িয়ে মিলিন্দকে কমলকলি বলল, দেখা হবে।

ট্রামস্টপের দিকে পা বাড়ালো কমলকলি।

মিলিন্দর উনিশ বছরের জীবনে জমা সোনা, রুপো, অহংকার, আত্মবিশ্বাসের মূলে প্রবল এক ঝাঁকুনি দিয়ে কমলকলি চলে যেতে অপমানে বিষিয়ে গেল তার মন। তেঁতো গলায় মৃণালকে সে প্রশ্ন করল, পেত্নীটাকে জোটালি কোথা থেকে ?

জবাব না দিয়ে মৃণাল হাসল। মিলিন্দর বুকের গভীরে জ্বালার সঙ্গে একটা জলছবি, কমলকলির মুখ আটকে গেছে।

মেডেল বিক্রি করে পকেটে বোঝাই টাকা নিয়ে আধঘণ্টার মধ্যে নচিকেতা, তরুণ কফি হাউসে ফিরলো। নচিকেতার মুখ দেখে মিলিন্দর মনে হলো, সে যেন সবে মৃত বাবার মুখাগ্নি করেছে। সামান্য একটা প্রাইজের জন্যে এতো মোহ, শোক, মিলিন্দর ভালো লাগে না। বিস্তর সোনাদানা, হীরের পাহাড় মাড়িয়ে সারাজীবন হাঁটতে হবে। এখন থেকে ইঁদুরের মতো জমানো বাতিক হলে, বোঝার ভারে এক কদম এগানো যাবে না। দুটো টেবিল জুড়ে বন্ধুদের নিয়ে বসেছে মিলিন্দ। খাবার আসতে শুরু করেছে টেবিলে। মিলিন্দ বলল, সবচেয়ে বড়ো বাটার চিকেনটা নচিকেতা খাবে।

ব্যাজার মুখ নাচিকেতা বলল, খিদে নেই আমার।

এ্যাভো অরুচি কেন, ক'মাস ?

মিলিন্দর প্রশ্ন শুনে কল্যাণ, অতনু, তরুণ, বারীন হৈ হৈ করে হেসে উঠল। লজ্জায় লাল হয়েছে বলাকা, প্রিয়দর্শিনীর মুখ। বলাকা ফিলোসফি, প্রিয়দর্শিনী ইংরিজি অনার্সের ছাত্রী। মিলিন্দ, নচিকেতার সহপাঠিনী। কফিহাউসে এলো সেণ্টপলস্ কলেজের কিংকর, হীরক। দুটো খালি চেয়ার টেনে মিলিন্দর টেবিলে ঢুকে পড়ল তারা। আলাদা কলেজে পড়লেও কিংকর ঘনিষ্ঠ বন্ধু মিলিন্দর। কিংকরের কাকা থিয়েটারের এক দিকপাল মানুষ। কিংকরও দারুণ নাটক করে। আন্তর্কলেজ একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় গত বছর শ্রেষ্ঠ পরিচালক, সেরা চরিত্রাভিনেতার

পুরস্কার পেয়েছিল। যে কোনো কারণে সব সময়ে কিংকরকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে মিলিন্দ। নবনীতা চলে যাবার পর থেকে অচেনা কষ্টে রিনরিন করছে মিলিন্দর বুক। নবনীতাকে ক্ষুণ্ণ করা তার উচিত হয়নি। মাঝে মাঝে মাথা কেন এমন তেতে উঠে, বুঝতে পারে না মিলিন্দ। বাবার ঘরে ফোন থাকায় সে পারতপক্ষে বান্ধবীদের ফোন করে না। তারা কেউ ফোন করলে মিলিন্দ বিব্রত, বিরক্ত হয়। কিন্তু আজ সে একটা ফোন করে নরম গলায় নবনীতার সঙ্গে কথা বলবে। তার ভদ্রতায় নবনীতা জুড়িয়ে গেলে তার পৌরুষ, ব্যক্তিত্ব খাটো হবে না নিশ্চয়।

দলের পরবর্তী প্রযোজনা স্যামুয়েল বেকেটের একটা নাটক নিয়ে কথা বলছে কিংকর। বলাকাকে নায়িকা করার জন্যেই যে কিংকরের এই সাতকাহন কথা, মিলিন্দ ধরতে পারে। খ্যাতি, প্রশংসা থাকলেও ওদের দলে মেয়ে নেই। দলে অভিনেত্রীর অভাবের কথা কিংকর প্রায়ই বলে। বলাকা, প্রিয়দর্শিনী মন দিয়ে শুনছে কিংকরের কথা। মিলিন্দকে দেখলেই কিংকর নাটকের আলোচনা শুরু করে।

কফি হাউসের সব আলো জ্বলে উঠেছে। কফি, পকোড়া, ওমলেট, সিগারেটের গন্ধ, বাষ্প, ধোঁয়ায় কফিহাউসের বাতাস মন্থর, ভারী। কলেজের ইংরিজির অধ্যাপক, পুলকেশ সেনকে দেখে হাতের সিগারেট লুকোলো মিলিন্দ। সেদিকে নজর না করে পুলকেশ বলল, চাঁদের হাট বসেছে দেখছি।

বসুন স্যার।

চেয়ার ছেড়ে মৃণাল উঠে দাঁড়াতে পুলকেশ বলল, আমার বন্ধুরা ওপাশে অপেক্ষা করছে।

ধোঁয়া, কুয়াশা, অন্ধকারে ঝাপসা হয়ে আছে বাইরের পৃথিবী। একটু আগে বলাকা, প্রিয়দর্শিনী চলে গেছে। অতনু বলল, পুরী গেলে কেমন হয় ?

দারুণ, কিংকর বলল, দল বেঁধে বেধড়ক মজা করা যাবে।

তাড়াতাড়ি, এই ক্রিসমাসের ছুটিতে প্রোগ্রামটা কর, মৃণাল বলল অতনুকে।

মিলিন্দর মাথায় দুষ্টুমির বিদ্যুৎ নেচে গেল। সে দেখল কল্যাণের মুখে সাঙ্কেতিক হাসি। এ হাসি স্কুলে পড়ার সময় থেকে মিলিন্দ চেনে। অতনুর পুরীতে যাবার প্রস্তাব, কল্যাণের হাসি যোগ করে অঙ্কটা কষে ফেলতে মিলিন্দর অসুবিধে হলো না। সে বলল, ক্রিস্‌মাস এখন অনেক দেরি। পুরী যেতে হলে আজ, এখনই, রাত সাড়ে ন'টার গাড়িতে স্টার্ট করা উচিত।

মিলিন্দর প্রস্তাবে আঁতকে উঠলো কিংকর। মৃণালের মুখ ফ্যাকাসে।

অতনু বলল, কোথাও যাবার হলে, ট্রেন ছাড়ার এক, দেড় ঘণ্টা আগে সাধারণত বলে থাকি আমি।

কল্যাণ ফিকফিক করে হাসছে।

অতনু বলল, সাড়ে ন'টার ট্রেন ধরতে হলে এখনই আমাদের উঠতে হয়।

চেয়ার ছেড়ে অতনু উঠে দাঁড়াতে পকেট থেকে দামী সিগারেট বার করে, আগুন ছুঁয়ে গম্ভীর মুখে টানতে শুরু করল কিংকর। পুরো একপ্লেট্ বাটারচিকেন, চারপিস্ রুটি, একটা কোলড্-ক্রিম্‌কফি খেয়ে ঢেঁকুর তুলে নচিকেতা তাকিয়ে আছে

মিলিন্দর দিকে। অতনু, কল্যাণকে নিয়ে মিলিন্দ যে এখনই পুরী রওনা হবে, নচিকেতা বুঝে গেছে।

তরুণ প্রশ্ন করল, তোর বাড়িতে কি খবর দেবো ?

নাহ্, মিলিন্দ বলল।

চলন্ত ট্রেনের কামরায় গাদাগাদি বসে রাত বারোটায় টাকাপয়সার হিসেব করছিল অতনু। কফি হাউস থেকে অতনুর বাড়ি পাঁচ মিনিটের রাস্তা। মিলিন্দ, কল্যাণ বাড়ি না যাওয়ায় তাদের জন্যে সুটকেসে নিজের জামা, প্যান্ট এনেছে অতনু। তিন-জনের শরীরের মাপ প্রায় সমান। পোশাক নিয়ে অসুবিধে হবে না। আলমারি হাতড়ে টাকা যা ছিল, অতনু পকেটে পুরেছে। হীরক বাড়ি চলে গেলেও কফিহাউস থেকে কিংকর, তরুণ, মৃণাল, নচিকেতা হাওড়া স্টেশনে ওদের তিনজনকে পৌঁছে দিয়েছিল।

ট্রেন ছাড়ার আগে কল্যাণকে কিংকর প্রশ্ন করেছিল, কবে ফিরবি ?

আর ফিরবো না। বাকী জীবন নুলিয়া হয়ে কাটিয়ে দেবো, কল্যাণ বলেছিল।

শুধু মেয়েদের চান করাবো, যোগ করেছিল অতনু।

ট্রেন থেকে ঘন অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বার বার কমলকলির মুখ মিলিন্দর মনে পড়ছে। কমলকলি আহামরি সুন্দরী নয়। শ্যামলা, রোগা, লম্বা চিবুক, দুচোখের তারা দুটো বড়ো বেশী কালো, যেন খুব জ্বর, তবু তাকে ভুলতে পারছে না মিলিন্দ। কলেজে অনেক মেয়ের সঙ্গে তার জানাশোনা। ঘনিষ্ঠও কেউ কেউ। তাদের মধ্যে সত্যিকার রূপসীও দু'একজন আছে। নবনীতা রীতিমতো সুন্দরী। কিন্তু মিলিন্দকে এভাবে নাড়া দেয় নি কেউ। কেন এমন হলো ? কারণ কী ? এ প্রশ্নের ব্যাখ্যা না পেলেও মিলিন্দর মনে হলো, এক গোপন কারসাজিতে সে জড়িয়ে গেছে। আরো অনেক জড়াতে হবে তাকে। মনের কোথাও লুকোনো শক্তিশালী, সূক্ষ্ম অনুভূতিপ্রবণ এক গ্রাহকযন্ত্র, রাডারে ভবিষ্যতের ছবি দেখতে পেল সে। ফালতু, যুক্তিহীন চিন্তা মাথা থেকে সরাতে চাইলেও অস্বস্তি, অনিশ্চয়তায় গুড়গুড় করছে তার বুক, গলা শুকিয়ে কাঠ, ছটফটানি চেপে স্থির হয়ে বসে আছে সে।

মাসখানেক আগে মৃণাল একদিন তার বোন ইন্দ্রাণীর বন্ধু কমলকলির নাম শুনিয়েছিল মিলিন্দকে। মৃণাল বলেছিল, কমলকলি অসাধারণ মেয়ে। তোর সঙ্গে আলাপ করতে চায়।

মৃণালের কথা এক কানে শুনে আর এক কানে বার করে দিয়েছিল মিলিন্দ। তারপর আরো দু'তিনবার কমলকলির প্রসঙ্গ তুলে মৃণাল বলেছিল, তোর সঙ্গে আলাপ করতে চায় কমলকলি।

করবো।

ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিয়ে কমলকলির কথা ভুলে গিয়েছিল মিলিন্দ। সেই কমল-কলি আজ কয়েক মিনিটের পরিচয়ে ঘায়েল করে দিয়েছে মিলিন্দকে। এই একটা চিন্তা মাথার মধ্যে অবিরত ঘুরপাক খেয়ে মিলিন্দকে অসুস্থ, অসহায় করে তুলছে। কলকাতা ছেড়ে হঠাৎ পুরীতে আসার হঠকারী, নির্বোধ সিদ্ধান্ত নিয়ে হাত কামড়াচ্ছে সে। কলকাতা ছাড়া এখন উচিত হয় নি। বেপরোয়া, অযৌক্তিক অভিমানে সে ডুবতে বসেছে। পৃথিবী, মানুষের দিকে ঠাণ্ডা মাথায় সে তাকাতে পারে না। দুমদাম একটা গোলমাল পাকানোর নেশা তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে তাকে। না জেনেও এই নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে সে। নেশার কারণ জানে না। সত্যি কি জানে না?

প্রশ্ন জাগতেই জবাব পেল মিলিন্দ। হ্যাঁ, জানে। গোলমাল পাকিয়ে পাঁচ-জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায় সে। শীতল, নিষ্প্রাণ হলে কেউ তার দিকে তাকাবে না। কোনো একটা ঝামেলা সবসময়ে পাকিয়ে রাখা দরকার। কিংকরের সঙ্গে টেক্কা দিতে পুরীর ট্রেনে সে চেপে বসেছে। কিংকরের মতো হিসেবি বন্ধুকে সে দেখাতে চায় যে, যে-কোনো দুঃসাহসী কাজ অনায়াসে, অবলীলায় করতে পারে সে। কিংকরের সঙ্গে কফিহাউসে দেখা না হলে সে বাড়ি ফিরে যেতো। আরো একটা কারণ, গোপন, প্রচ্ছন্ন অভিমান, সে ভুলতে পারছিল না। নবনীতা ছাড়া বাড়ির কেউ তার জন্মদিনের কথা মনে রাখে নি। নানা যুক্তি, তর্কে এই ভুল, বিস্মরণকে হজম করতে চেয়েও মিলিন্দ পেরে ওঠে নি। বাড়ি ছেড়ে অনেক দূরে চলে যাওয়ার সুযোগ আসতেই অভিমানের সেই সাপ চিকণ ফণা তুলেছে। সব রাগ নবনীতার ওপর চাপিয়ে দিল মিলিন্দ। নবনীতাই জন্মদিনের শুভেচ্ছায়, উপহারে স্মরণ করিয়ে বিষ ঢেলে দিয়েছে তার মন।

টাকাপয়সার হিসেব শেষ করে কল্যাণের কাঁধে মাথা রেখে অতনু ঘুমোচ্ছে। হঠাৎ ধড়ফড় করে জেগে উঠে সে বলল, একটা মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে।

অতনুর কথা শুনে চোখ খুলে তাকালো কল্যাণ। মুখোমুখি বসে গভীর উদ্বেগে মিলিন্দ দেখছে অতনুকে।

দুশ্চিন্তা, অস্বস্তিতে কালো হয়ে আছে অতনুর মুখ।

কী হলো?

কল্যাণের প্রশ্ন শুনে ট্রাউজার্সের পকেট থেকে ট্রামের মান্থলি টিকিট বার করে অতনু বলল, হাওড়া স্টেশনে টিকিটটা কিংকরকে দেবো ভেবেও ভুলে গেলাম। এখন কী হবে?

অতনুর উদ্বেগ, সমস্যা শুনে চোখ বুজলো কল্যাণ। ট্রেনের কামরায় মাঝরাতে ন'টাকার মান্থলি টিকিট নিয়ে অতনুর এই উদ্ভট আকুলতার কোনো যুক্তি নেই। কিন্তু মিলিন্দ জানে, অতনু চিরকাল এরকম। এ বছর বি. এস.-সি পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় কোনো দিন পাঁচটা পর্যন্ত অতনু পরীক্ষার হলে থাকে নি। পরীক্ষা শেষ হওয়ার এক ঘণ্টা আগে, চারটে বাজতেই অতনু খাতা জমা করেছে। অতনুর পাশের ঘরে দরজার কাছে, বসে পরীক্ষা দিচ্ছিল মিলিন্দ। ফিসফিস করে তাকে ডেকে

রোজ অতনু বলতো, চললাম।

কেন ?

চাপা গলায় মিলিন্দ জানতে চাইলে অতনু বলতো, ট্রামে ভিড় হয়ে যাবে।

জবাব শুনে খাতা থেকে মুখ তুলে মিলিন্দ বলতো, হেঁটে ফিরবি।

মান্থলি রয়েছে যে।

অতনুর জবাব শুনে কথা না বাড়িয়ে উত্তর লেখায় মন দিতো মিলিন্দ। অতনুর ওপর রাগও হতো। হাঁটা পথে য়ুনিভার্সিটি থেকে অতনুর বাড়ি পাঁচ মিনিট। তবু ট্রামের মান্থলি কাজে লাগাতে এক ঘণ্টা আগে পরীক্ষার হল ছেড়ে কেন চলে যায় ও ? পরীক্ষা না দেবার এ বিলাসিতা অতনুরই সাজে।

অতনুর পরিবার কলকাতার বনেদী বড়লোক। অঢেল পয়সা ওদের। কলকাতার দুটো বিখ্যাত বাজার, দশ-বারোটা বিশাল বাড়ির মালিক ওরা। অতনুর বাবা নেই। মা পাগল, অন্ধ। অতনুর দুই দাদা। বড়দা বিবাহিত, সংসারী, ব্যস্ত মানুষ। মেজদা আর অতনুর বিয়ে হয় নি। এজমালি সম্পত্তি থেকে তিন ভাই মাসে সমান টাকা পায়। তিনজনের আলাদা সংসার। কারো ব্যাপারে নাক গলায় না কেউ। মাসোহারা দু'আড়াই হাজার টাকা কীভাবে খরচ করবে, ভেবে পায় না অতনু। পকেটে গোছাগোছা চকচকে নতুন নোটের বান্ডিল, দামী সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে অতনু ঘুরে বেড়ায়। অভাব, দুশ্চিন্তা কাকে বলে জানে না। নানা জটিল ধাঁধা, পরিকল্পনা তার মাথায় গজগজ করছে। কফিহাউস থেকে বেরিয়ে ট্রামে ওঠার সময় কয়েকদিন আগে অতনুকে কল্যাণ প্রশ্ন করেছিল, বাড়ি যাবি ?

প্রশ্ন শুনে থমকে দাঁড়িয়ে একটু ভেবে অতনু বলল, বাড়ি যাচ্ছি না। বাড়ি এগিয়ে আসছে আমার দিকে।

গম্ভীর গলায় সায় দিয়ে কল্যাণ বলেছিল, ঠিক। তোর দিকে এগিয়ে আসছে বাড়ি। আমি চলি।

মুচকি হেসে অতনু বলেছিল, আমরা কোথাও যাই না। গন্তব্য আমাদের কাছে এগিয়ে আসে। আমরা যেতে না চাইলেও যেমন মৃত্যু হাজির হয়।

কথা শেষ করে রাত প্রায় আটটায় বাড়ি ফেরার ট্রামে চেপেছিল অতনু। কলেজ স্ট্রিট তখন ফাঁকা। কয়েকজন মানুষ, অথবা মানুষের ছায়া রাস্তায় চলাফেরা করছিল। অতনু চলে যেতে মিলিন্দকে কল্যাণ বলল, একটা ভালো গড়গড়া আর কাশীর তামাক কিনেছি। তামাক খাওয়ার ইচ্ছে থাকলে আমার সঙ্গে চল্।

আজ নয়, মিলিন্দ বলেছিল, আর একদিন। রাতে তোর ঘরেই থেকে যাবো সেদিন। গড়গড়া টানবো সারারাত।

ঝমঝম শব্দ তুলে একটা ব্রিজের ওপর দিয়ে ট্রেন ছুটে চলেছে। বাইরে অন্ধকার। মিলিন্দর হঠাৎ মনে হলো, কার সঙ্গে দেখা করার জন্যে কমলকলি ব্যস্ত হয়ে চলে গেল ?

এক মনোরম স্বপ্ন, সুখ মিলিন্দর মাথায় বয়ে চলেছে। ঘুম জড়ানো আধবোজা চোখে বিছানায় শুয়ে আছে সে। মৃদু হাওয়ায় উড়ছে জানলার পর্দা। পর্দার ওপাশে ভোররাতের আবছা পৃথিবী হালকা রুপোলি মলমলে ঢাকা নবীন কিশোরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে। এমন সকাল বড়ো একটা হয় না। রূপকথার মতো এরকম ভোরে আশ্চর্য সব প্রত্যাশা মিলিন্দর মাথায় খেলা করে। মনে হয়, দারুণ কিছু আজ ঘটবে, যা চাইবে পেয়ে যাবে। পৃথিবীতে অসম্ভব, অবাস্তব কিছু নেই। খুশির থইথই সমুদ্রে ভেসে সে ভাবে, সকালের এই স্বপ্ন, ঘুমের ঘোরে আরো কিছুক্ষণ মাথায় ছড়িয়ে থাকুক। আলতো হাতে গলা পর্যন্ত চাদর টেনে চোখ বুজে শুয়ে থাকে মিলিন্দ।

আজ দুপুরে কমলকলির সঙ্গে মিলিন্দর দেখা করার কথা। কখন দুপুর হবে, আজ সারাদিনে দুপুর আসবে কিনা, মিলিন্দ জানে না। দুপুর না হলেই বা কী ক্ষতি? ফাঁকা বিছানায় শুয়ে নিজের শরীরের তাপ, গন্ধে মিলিন্দ যেন কমলকলির সান্নিধ্য পাচ্ছে। নিবিড়, ঘন পাতায় ঢাকা কমলকলির দু চোখের কালো তারা, পাতলা ঠোঁটের অপরূপ হাসি, চোখ বুজে দেখতে পাচ্ছে সে।

মলমলের বোরখা সরিয়ে মুখ দেখাচ্ছে পৃথিবী। জানলার খড়খড়িতে বসে হাঁক-ডাক করছে দুটো কাক। ঘুমের আবেশ কেটে ক্রমশ সজাগ হচ্ছে মিলিন্দর মন। বুক থেকে হাঁটুর নিচে চাদর নামিয়ে দিল মিলিন্দ।

আজ তার অনেক কাজ। কলেজে প্রথম ক্লাসটা নমো নমো করে সেরে স্টার থিয়েটারে যাবে মিলিন্দ। নানা দাবিতে কর্মীদের সঙ্গে থিয়েটারের লবিতে অবস্থান ধর্মঘট করছে সবিতাব্রত দত্ত। হাতিবাগানের মোড় থেকে কিংকর, কল্যাণ, অতনুকে নিয়ে ধর্মঘটী শিল্পীদের নৈতিক সমর্থন জানাতে যাবে মিলিন্দ। স্টার থিয়েটার ছুঁয়ে কোনো এক ফাঁকে কেটে পড়বে সে। ভরদুপুরে বন্ধুদের এড়ানো খুব কঠিন। বসন্ত কেবিন, কফি হাউস, সারা শহর যখন আয় আয় করে ডাকে, তখন সে ডাক না শুনে পালাবে কোথায়? কিন্তু আজ তাকে পালাতেই হবে। টেলিফোনে তাকে ডেকেছে কমলকলি। কমলকলি কী বলে শোনার জন্যে মিলিন্দ খুব ব্যগ্র, উত্তেজিত। থরথর করে কাঁপছে তার বুক। ফলে, আজ সংগ্রামী নাট্যকর্মীদের জন্যে আন্দোলন নয়, আড্ডা নয়। উনিশ বছরের ছেঁদো, এলেবেলে আড্ডা, অপচয় ছেড়ে আজ বের হয়ে আসবে সে। অনেকদিন পরে একজন মরমী বন্ধুর সন্ধান পেয়েছে। এ বন্ধুকে হারাবে না। হারাবার সময় তার আর নেই। কিছুদিন পরে সে বুড়ো হয়ে যাবে। তখন কোনো তরুণী, যুবতী ফিরে তাকাবে না তার দিকে। সেই দুঃসময়ের কথা ভেবে এ সুযোগ হারাতে রাজি নয় সে। সুযোগ আগেও পেয়েছে মিলিন্দ। কলেজের কয়েকজন সহপাঠিনী চুম্বকের মতো তাকে আকর্ষণ

করলেও লজ্জায়, সংকোচে সে সাড়া দিতে পারে নি। নবনীতা, বলাকা, প্রিয়দর্শিনী, শ্রীরূপা, আম্রপালির মুখ গভীর রাতে হানা দেয় তার মনে। তাকে কামড়ায়, কুরে কুরে খায়। এক তীব্র তাড়না, ইচ্ছায় সারারাত ছটফট করলেও দিনের আলোয় সব ভুলে যায় মিলিন্দ। নিজের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল, অম্লান রাখতে রাতের বুভুক্ষা ভুলে যেতে বাধ্য হয়। নিজের মায়াবী ভাবমূর্তির ফাঁদে পড়ে ক্লান্ত, ফতুর হচ্ছে সে। পাঁচজনের থেকে নিজেকে আলাদা, ব্যক্তিত্ববান, গুরুত্বপূর্ণ করার কসরতে কখন যেন ঠুঁটো জগন্নাথ বনে গেছে। মাঝে মাঝে বেপরোয়া হবার, সাজানো বাগান লণ্ডভণ্ড করে ফেলার বাসনা ঝড়ের মতো তার মনে ফুঁসতে থাকে। কিন্তু সংকোচ, দ্বিধায় সে গুটিয়ে থাকে। অনেকের সঙ্গে মিশেও তাই সে একা, তার বন্ধু নেই। মনের গোপন, নিভৃত কথা যে বলে না, কে তার বন্ধু হবে?

কমলকলির সঙ্গে পরিচয়ের পর তাই ঝলমল করে উঠেছিল মিলিন্দর মন। প্রথম কারণ, কমলকলি ন্যাকা নয়। দ্বিতীয় কারণ হলো, মিলিন্দর কলেজে কমলকলি পড়ে না। তার সঙ্গে খোলামেলা ঘনিষ্ঠতার খবর মিলিন্দর বন্ধুরা, কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা জানবে না। চেনা ছকের শক্ত বাঁধনের বাইরে অবাধ স্বাধীনতা পাবে সে। পুরী থেকে তিনদিন পরে ফিরে মহাজাতি সদনে রামমোহন কলেজের ছাত্রীদের বার্ষিক সোশ্যাল ফাংশনে আবার কমলকলির সঙ্গে মিলিন্দর দেখা হয়েছিল। মৃণালের হাতে মিলিন্দর জন্যে গেস্টকার্ড পাঠিয়েছিল কমলকলি। অনুষ্ঠানের পর মিলিন্দ গ্রিনরুমে যেতে কমলকলি বলেছিল, আপনাকে খুব খুঁজছি।

মিলিন্দর বুকের রক্ত সে কথায় চলকে উঠেছিল। মৃণালের বোন ইন্দ্রাণী আরো কয়েকজন তরুণী হাসিমুখে দেখছিল মিলিন্দকে। তারা সকলেই কমলকলির সহপাঠিনী, বন্ধু। কমলকলি কেন খুঁজছে, বুঝতে পারছিল না মিলিন্দ। নানা কথার পর কমলকলি বলল, কাল একবার আমাদের বাড়িতে আসুন, অনেক কথা আছে।

রোমাঞ্চ, উত্তেজনা নিয়ে পরের দিন কমলকলির বাড়ি গিয়েছিল মিলিন্দ। কিংকর, অতনু আগেই এসে গিয়েছিল সেখানে। কমলকলি বলল, কলকাতার কলেজের ছেলেমেয়েদের নিয়ে একটা সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ার কথা আমরা ভাবছি। আপনাকেও চাই।

শেষ বিকেলের আলো কমলকলির ঘরের পশ্চিমের খোলা জানলা দিয়ে তার পিঠে, ঘাড়ে, আলগা ঢাউস খোঁপায় ঝিকমিক করছিল।

কমলকলি হঠাৎ বলল, আর আপনি নয়, সকলকে এখন থেকে তুমি বলবো।

মুগ্ধ মিলিন্দ বলল, তাই ভালো।

তারপর প্রশ্ন করল, কেন এই সংগঠন?

কলকাতার ছাত্রছাত্রীদের একটা মঞ্চ, মেলামেশার জায়গা তৈরি করতে চাই, কমলকলি বলল, নাটক, গান, বিতর্ক, আর যা যা করা যায়, আমরা করবো।

সংগঠনের খুঁটিনাটি বিষয়, কর্মসূচি, সংবিধান নিয়ে তারপর আরো কয়েকদিন আলোচনা হলো। মিলিন্দ, তার বন্ধুরা, কিংকর, অতনু, কল্যাণ, মৃণাল, তরুণ,

বারীন, হীরক, সবাই আলোচনায়, সংগঠন গড়ার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল। জন্ম নিল রূপান্তর সাংস্কৃতিক সংস্থা। গত আড়াই মাসে রূপান্তর-এর খবর কলকাতার প্রায় সব কলেজের ছেলেমেয়েরা জেনে গেছে। বিডন স্ট্রিটে একটা ঘর রূপান্তরের জন্যে ভাড়া নেওয়া হয়েছে। কিংকরের উদ্যোগে সেখানে শুরু হয়ে গেছে নতুন নাটকের মহড়া। নাটকের পরিচালক, মুখ্য অভিনেতা কিংকর। রূপান্তরের এখন চল্লিশ জন সদস্য। রোজ সদস্য হতে আসছে দু'একজন।

সংস্থার সংবিধান লেখার জন্যে আজ দুপুর দুটোয় একা মিলিন্দকে বাড়িতে ডেকেছে কমলকলি। বেশি লোক থাকলে গল্প, আড্ডায় সময় চলে যায়, কাজের কাজ কিছু হয় না। এ যুক্তি কমলকলি দেখালেও মিলিন্দর ধারণা শুধু সংবিধান লেখার জন্যে ভরদুপুরে তাকে একা যেতে বলে নি কমলকলি। আরো কোনো কারণ কাছে। কথাটা ভেবে গত দু'দিন মাঝে মাঝে শিহরন জাগছে তার। কমলকলি এতো সরল, স্বাভাবিক যে তার অভিধানে গোপন, নিষিদ্ধ, নিঃসঙ্গতা, একাকীত্ব, শব্দগুলো নেই। দলবল নিয়ে সবসময়ে সব কথা সে খোলাখুলি বলে, আলোচনা করে। নাটক, গান, আবৃত্তির আসর, অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা আর মজার গল্প, চুটকি, হাসিতে ঝরনার স্রোতের মতো সে অবিরাম বয়ে চলেছে। তার চাল-চলন, ব্যবহারে এমন এক সর্বজনীন, মজলিসী ভঙ্গি আছে, যে, মিলিন্দর মনে হয়, সকলের খুব কাছাকাছি থেকেও সে কারো নয়, অনেক দূরের মানুষ। তবু কখনো কমলকলির বাড়িতে, বিডন স্ট্রিটের ঘরে দলবল, ভিড়ের মধ্যে তার সঙ্গে চোখাচোখি হলে মিলিন্দর মনে হয়, এক অদৃশ্য চোখে তাকেই দেখছে কমলকলি। তাই সংবিধান লেখার জন্যে একা তার সঙ্গে কমলকলি বসতে চায় শুনে, অসম্ভব কিছু ঘটার প্রত্যাশায় ছমছম করছে মিলিন্দর মন, শরীর।

স্টার থিয়েটার থেকে বন্ধুদের ছেড়ে সরে পড়ার একটা মোক্ষম অজুহাত, ছুতো বিছানায় শুয়ে খুঁজে বার করতে চাইছে মিলিন্দ। কী বলা যায়? কাল রাতে বাথরুমে পা পিছলে পড়ে মায়ের পায়ে চোট লেগেছে। মা'র পা ভাঙার কথা বললে কেমন হয়? সহজেই বলা যায়। সংসারের সব কাজ আজ সকালে মা করলেও, মা'র ডান পায়ের গোড়ালি এখনও ফুলে আছে। বেশ ব্যথা। বন্ধুদের এড়াতে মাকে কাজে লাগানোই সবচেয়ে ভালো। তাছাড়া মাকে ঘিরে এমন এক সেন্টিমেন্ট, আবেগ থাকে, যে কোনো গল্পই বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। বিয়ের জন্যে ছোটপিসিকে দেখতে আসার কথাও মিলিন্দ বলতে পারে। হপ্তায় এক, দুদিন ছোটপিসিকে দেখতে আসার ঘটনা গত দুমাস বাড়িতে লেগেই আছে। পাত্রপক্ষের জহুরিদের সামনে সেজেগুজে হাজির হতে হতে সাজায় ঘেন্না ধরে গেছে সাতাশ বছরের অপর্ণার।

কিন্তু বাড়ির লোকদের জড়ানোর বিপদও আছে। মিলিন্দর ওপর অতনু, কল্যাণের অগাধ বিশ্বাস থাকলেও ধূর্ত, কুচুটে কিংকর যে কী করবে বলা মুশকিল। মিলিন্দর সব কথা চুপচাপ শুনে হয়তো হঠাৎ আজ, অথবা কাল, বাড়িতে এসে মাকে কিংকর প্রশ্ন করবে কেমন আছেন মাসিমা? পা একসুরে হয়েছে? শুনলুম, মাল্টিপল ফ্র্যাকচার, প্লাস্টার হচ্ছে কবে?

প্রশ্ন শুনে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকবে মা। হেনস্তার একশেষ হবে মিলিন্দ। ছোটপিসির সঙ্গে দেখা হলে গায়ে পড়ে কিংকর বলবে, কবে লাগছে শুভকাজ? আমরা কিন্তু পরিবেশনের চার্জে থাকবো অপুপিসি।

ছোটপিসি, অপর্ণাকে মিলিন্দর বন্ধুরা অপুপিসি বলে ডাকে। কিংকর মহা ঘোড়েল। পিটপিটে, সরু দু'চোখে সে যখন কারো দিকে তাকায়, তার বুকের ভেতর পর্যন্ত দেখতে পায়। বেশ কয়েকবার সে নাজেহাল করেছে মিলিন্দকে। আজই তাদের বাড়ি গিয়ে পিসিকে দেখতে আসার খবরটা যাচাই করতে পারে কিংকর।

মিলিন্দ জানে সত্যবাদী যুধিষ্ঠির নয় সে। মাঝে মাঝে নিরীহ, হার্মলেস মিথ্যে দু'একটা বলে। মিলিন্দর এখন সন্দেহ, কমলকলির ওপর কিংকরেরও নজর পড়েছে। মিলিন্দকে হিংসে করে কিংকর। তার নরুণচেরা চোখের কুঁতকুঁতে চাহনি দেখে তার মনের খবর টের পেয়েছে মিলিন্দ। বাড়ির লোকদের না জড়িয়ে দিদিমার গুরুতর অসুস্থতার কথাও বলতে পারে সে। বাষট্টি বছরের দিদিমার অসুস্থতায় অবাক হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু কিংকরকে বিশ্বাস নেই। মিলিন্দর মাকে দিদিমার শরীর নিয়েও জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে কিংকর।

খোলা জানলা দিয়ে হেমন্তের ফুরফুরে ঠাণ্ডা হাওয়া মুখে লাগতে মিলিন্দ আরাম পেল। মুন্নি চা নিয়ে ঘরে ঢুকতে চোখ বুজলো মিলিন্দ। তাকে জেগে শুয়ে থাকতে দেখলে মুন্নি বলবে, কাল থেকে নিজের চা নিজে আনবে। আমি পারবো না।

ঘরের ঝাপসা আলোয় মিলিন্দকে স্পষ্ট দেখতে না পেয়ে বিছানার পাশে টেবিলের ওপর কাপ রেখে মুন্নি বলল, চা।

সাড়া না দিয়ে গভীর ঘুমের ভান করে ঘাপটি মেরে মিলিন্দ শুয়ে আছে।

কী ঘুমই ঘুমোতে পারে, মুন্নি বলল, কুম্ভকর্ণ।

শেষ শব্দটা শুনে বিছানার ওপর তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে মিলিন্দর বলতে ইচ্ছে হল, কুম্ভকর্ণের বোনের নাম কি বলতো?

কিন্তু ঘুমের মধ্যে কথা শোনার রীতি নেই। অনেক কষ্টে সংযত, চুপ থাকলো সে। মুন্নি চলে যেতে বালিশ টেনে বিছানার ধারে এসে হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে চায়ের কাপ তুলে নিল। বিছানায় আধশোয়া হয়ে কাপে চুমুক দিল।

সিঁড়ি থেকে কমলকলির নাম ধরে কেউ ডাকতে চমকে উঠল মিলিন্দ। কমলকলির ঘরে খাটের ওপর বিছানায় বসে তার সঙ্গে গল্প করছিল সে।

ঘণ্টাখানেক আগে সে এসেছে কমলকলির বাড়িতে। খাটের গা ঘেঁষে একটা চেয়ারে পা মুড়ে আয়েস করে চমৎকার ভঙ্গিতে বসে আছে কমলকলি। কিছু আগে লাল গোলাপটা মিলিন্দ উপহার দিয়েছিল, সে ফুল কমলকলির হাতে। একতলায়

সিঁড়ির মুখে নিচু গলায় কথা বলছে কয়েকজন। মিলিন্দর বুঝতে অসুবিধে হয় না, ওরা কারা।

চাপা,গম্ভীর গলায় কিংকর আবার ডাকল, কমলকলি।

খোলা জানলা দিয়ে ঝিরঝির হাওয়া আর হেমন্তের নরম রোদ ঘরে ঢুকে কমল-কলির পিঠভাসানো ঝকঝকে দামী রেশমের মতো ঘন কালো, ভিজে চুলে বিলি কাটছে। ফ্যানের হাওয়ায় উড়ছে কপালের ওপর লম্বা, কুঁচো কিছু চুল। মিলিন্দর ফ্যাকাসে করুণ মুখ দেখে অভয় হাসি ছড়াল কমলকলি। হঠাৎ বন্ধুদের এসে যাওয়ায় মিলিন্দ যে ভড়কে গেছে, টের পেয়ে কমলকলি বলল, পাশের ঘরে বসাচ্ছি তোমার বন্ধুদের। তুমি এখানে থাকো।

চেয়ার ছেড়ে উঠে বাইরে বেরিয়ে ঘরের দরজা ভেজিয়ে বন্ধ করার সময় কমলকলি বলল, পাঁচ-সাত মিনিটে ফিরে আসছি।

ঘরের ভেজানো দরজার সামনে দিয়ে কিংকর, অতনু, কল্যাণ পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল। ভয়ে ধড়াস ধড়াস করছে মিলিন্দর বুক। বিছানার এক কোণে গুটিসুটি হয়ে বসে আছে সে। চার জোড়া পায়ের শব্দ ঘরের সামনের দালান ধরে এগিয়ে যাবার সময় শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল মিলিন্দর। কমলকলির চেয়ারে নজর করে আতঙ্কে পাথর হয়ে গেল সে। সর্বনাশ হয়ে গেছে! খালি চেয়ার, বিছানায় আঁতি-পাতি নজর চালিয়েও লাল গোলাপটা দেখতে পেল না সে। তার দেওয়া লাল গোলাপ হাতে নিয়ে বন্ধুদের কাছে চলে গেছে কমলকলি। ধরা পড়ে যাবার আশংকায় মিলিন্দর গলা শুকিয়ে গেল। গোলাপ ফুলটা ডোবাল তাকে। কিন্তু কে জানতো যে এই শেষ দুপুরে কিংকর, অতনু, কল্যাণ এখানে হাজির হবে? কলেজে পড়া একজন অবিবাহিতা তরুণীর বাড়ি অসময়ে দল বেঁধে আসা যে উচিত নয়, বোঝা উচিত ছিল তাদের। কমলকলির বাবা, মা, দাদা, ভাইবোনরাও কিছু ভাবতে পারে। যতো নষ্টের গোড়া কিংকর। কোনো আক্কেল নেই তার। সে ফুসলে নিয়ে এসেছে অতনু, কল্যাণকে। দুম করে বাড়ি আসার মতো ঘনিষ্ঠতা এখনও কমলকলির সঙ্গে কিংকরের হয় নি। কমলকলিও আজ দুপুরে নিশ্চয় আসতে বলে নি কিংকরকে। তাহলে কিংকর এলো কেন?

সন্দেহ, দুশ্চিন্তায় মিলিন্দর মনে হলো, তার ওপর নজর রাখছে, তাকে অনুসরণ করছে কিংকর। দিদিমার অসুখের কথাটা বিশ্বাস হয় নি কিংকরের। অতনু, কল্যাণকে নিয়ে কিংকর তাই এখানে হাজির হয়েছে। এখান থেকে সে হয়তো যাবে মিলিন্দর বাড়ি। দিদিমার শরীরের খবর সোজাসুজি মাকে জিজ্ঞেস না করে কিংকর বলবে, চা খাবো মাসিমা।

তারপর চা খেতে খেতে খেজুরে আলাপের মধ্যে কিংকর বলবে, দিদিমার শরীর খারাপ শুনে দুশ্চিন্তা হচ্ছে। দরকার হলেই ডাকবেন আমাদের।

কিংকরের কথা শুনে আকাশ থেকে পড়বে মা। প্রশ্ন করবে।

ব্যস্, ভরাডুবি! কিন্তু কিংকর এরকম করছে কেন?

কমলকলিকে দেখে কিংকরও অভিভূত, মজেছে, মিলিন্দ বুঝতে পারে। এখানেও

কি তার প্রতিদ্বন্দ্বী হবে কিংকর ? সন্দেহটা মাথায় জাগতে হিংসেতে কুঁকড়ে যায় মিলিন্দ। তাকে যে কিংকর ল্যাং মারার চেষ্টা করছে, টের পেতে অসুবিধে হয় না। প্রায়ই তাকে ধারালো, পিটপিটে চোখে কিংকর জরিপ করে। তার সঙ্গে কমলকলির সম্পর্ক নিবিড় হয়েছে, আর কেউ না হলেও আঁচ করেছে কিংকর। কমলকলির বাড়িতে আজ এমন বেফাঁস কান্ডের জন্যে তৈরি ছিল না মিলিন্দ। এরকম ঘটবে, ভাবতে পারে নি। কিন্তু কমলকলি গেল কোথায় ? কিংকর, অতনু, কল্যাণকে বিদায় করে কমলকলি তো এখন ফিরে আসতে পারে! পাঁচ-সাত মিনিট বলে কমলকলি কি ওদের সঙ্গে জমে গেল ? অভিমান, বিভ্রমে খিঁচড়ে গেল মিলিন্দর মেজাজ। গত তিনমাস মেলামেশা করেও আজ পর্যন্ত সে ভালোভাবে বুঝতে পারে নি কমলকলিকে। কমলকলি রহস্যময়ী, ধাঁধা, কাছে থেকেও সুদূর, তার কূল নেই, তল নেই। রূপান্তরের কাজকর্ম, আরো নানা বিষয়, কথায় কমলকলি যতো সিরিয়াস, গম্ভীর, ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে ঠিক ততই নীরব, দুর্বোধ্য। কমলকলি যেন ব্যক্তি নয়, সমষ্টি, প্রতিষ্ঠান। ব্যক্তিগত কথা আজ পর্যন্ত বিশেষ বলে নি সে। যখন বলেছে, তখনও খুব ভাসাভাসা, অগোছালো, হাল্কা তার কথা। অপমান, গ্লানিতে মাঝে মাঝে নিজেকে ধিক্কার দেয় মিলিন্দ। সে মিলিন্দ বোস, মিলিন্দ দ্য গ্রেট। তেজ, দাপট, আত্মসম্মানে সংসার, দেশ, দুনিয়াকে তুড়ি মেরে এতোকাল উড়িয়ে দিয়েছে। দীনতা, হ্যাংলামি ঘৃণা করে সে। আজ পর্যন্ত কোথাও মাথা নোয়ায় নি, মাথা নোয়াবার চিন্তাও করতে পারে না। নবনীতা, বলাকা, প্রিয়দর্শিনী, আম্রপালি, আরো অনেক মেয়েকে দশ, পনেরো মিনিটের বেশি কাছে ঘেঁষতে দেয় নি। অথচ কমলকলিকে দেখে এ তার কী হলো, কেন নেতিয়ে পড়লো সে ? নিজের ওপর রাগে, ঘৃণায় মিলিন্দ গুমরোতে থাকে।

কোথায় গেল তার আত্মসম্মান, তেজ, সাহস ? মিলিন্দ ভাবলো, কেন এভাবে একজনের ঘরে চোরের মতো লুকিয়ে বসে আছি আমি ? এ লজ্জার শেষ কোথায় ?

সূর্য আরো পশ্চিমে হেলেছে। ঘরের সবুজ মেঝে ছুঁয়ে দেওয়ালে উঠেছে ঘন রোদ। রাস্তার ওপারে বিশাল লাল বাড়ির সামনে সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠে শ্বেতপাথরের ডানাওয়ালা পরীর মূর্তি যেন এখনি উড়ে যাবে। বাগানের মধ্যে ফুলের কেয়ারি। লম্বা, ডালপালাওলা, ঝাঁকড়া আম, কাঁঠাল গাছের তলায় স্থির ছায়া। লাল বিশাল বাড়ির সব দরজা, জানলা, বন্ধ। চুপচাপ, স্তব্ধ প্রাসাদের মতো বাড়িতে মানুষের সাড়া নেই। মাঠে, গাছের ছায়ায় নেচে নেচে ডেকে বেড়াচ্ছে একদল শালিক।

তার কথা আজও যে কিংকর বিশ্বাস করেনি, বুঝতে পেরেছিল মিলিন্দ। স্টার থিয়েটারের ধর্মঘটী কর্মীদের ফুলের তোড়া, মালা দিয়ে মিলিন্দ, কিংকর, অতনু, কল্যাণ যখন ট্রামরাস্তায় এসে দাঁড়ালো, তখন মাঝদুপুর, দেড়টা বেজেছে। রোদের ঝাঁঝ কম থাকলেও রাস্তায় মানুষ বিশেষ ছিল না। রেষারেষি করে দুটো বাস ঝড়ের বেগে তাদের প্রায় গা ছুঁয়ে চলে গেল। হাতিবাগানের মোড়ে একটা

ঠেলাগাড়ির পেছনে অধৈর্য এক ট্রাম ঢং ঢং করে সমানে ঘণ্টা বাজাচ্ছে। মিলিন্দর মনে হলো, এটাই দিনের শেষ ট্রাম, এ ট্রাম না ধরলে সে আর কোনোদিন কমলকলির কাছে পৌঁছতে পারবে না। আধফোটা একটা লাল গোলাপকুঁড়ি হাতে চাপা উত্তেজনায় মিলিন্দ ঘামছিল। গোলাপকুঁড়িটা একবার শুঁকে মিষ্টি সুবাসের সঙ্গে সাহস, ধৈর্য ভরে নিতে চাইল বুক। হাতিবাগান বাজার থেকে ধর্মঘটী নাট্য-কর্মীদের জন্যে কেনা মালা, ফুলের তোড়ার সঙ্গে একটা বাড়তি গোলাপকুঁড়ি এসে গিয়েছিল। পায়ে হেঁটে আসে নি, হাতসাফাই করেছিল মিলিন্দ। দোকানদার, বন্ধুরা খেয়াল করে নি। গোলাপকুঁড়ি দেখেই মিলিন্দর মনে জেগেছিল কমলকলির মুখ। গোলাপকুঁড়িটা কমলকলিকে দেবার প্রবল বাসনা জেগেছিল মনে। কমলকলি ছাড়া আর কাউকে এ ফুল মানায় না। স্টার থিয়েটারের বাইরে রাস্তার খররোদে মিলিন্দর হাতে একটা গোলাপফুল দেখে সরু চোখে তাকিয়েছিল কিংকর।

মিলিন্দ বলেছিল, এ ফুলটা আমি নিলাম।

তুই আবার ফুলপ্রেমিক হলি কবে থেকে?

কিংকরের কথার ভঙ্গিতে গা জ্বলে গেলেও মিলিন্দ বলেছিল, তোর সঙ্গে মেশার পর।

কিংকর আর কথা বলে নি। মিলিন্দ ভাবছিল, এই ফুল কমলকলিকে দেওয়া কি তার সাহসে কুলোবে! নিশ্চয়ই কুলোবে।

অতনু বলেছিল, আজ কলেজে গিয়ে আর লাভ নেই।

কল্যাণ বলল, এই বারবেলায় কোনো ভদ্রসন্তান কলেজে যায় না। নতুনবাজার থেকে কিছুটা ভালো তামাক কিনে আমার ঘরে সকলে মিলে বরং গড়গড়া টানা যেতে পারে।

পকেট থেকে দামী সিগারেটের প্যাকেট বার করে একটা সিগারেট ধরিয়ে কিংকর বলল, মালা, ফুল কিনে আমি ফতুর। আর পয়সা নেই।

টাকার কথা উঠতে মিলিন্দ জড়োসড়ো হয়ে গেল। একটু আগে ফুলের দামের সিংহভাগ দিয়েছে কিংকর। অতনু, কল্যাণও দিয়েছে তাদের চাঁদা। মিলিন্দর পকেটে এতো কম পয়সা ছিল যে, তাকে হাত গুটিয়ে থাকতে হয়েছে। সে কিছুই দিতে পারে নি। এরকম প্রায়ই হয়। কোনো দরকারে, নিজেদের মধ্যে চাঁদা, টাকাপয়সা তোলার সময়ে অসহায় বোধ করে মিলিন্দ। তার পকেটে বাড়তি পয়সাকড়ি প্রায় কখনও থাকে না। থাকবে কী করে? বাড়ি থেকে তার রোজের বরাদ্দ একটাকা। একটাকার বেশি পায় না সে। এই একটা টাকা পকেটে নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে না। ফলে চাঁদা, টাকাপয়সা দেবার ডাক পড়লে তার ব্যক্তিত্ব, তেজ, যুক্তি, বাগ্মিতা বরফের মতো ঠাণ্ডা, নিষ্প্রাণ হয়ে যায়। টাকা না থাকার হীনমন্যতায় আড়ষ্ট হয়ে যায় সে। তার মনে হয়, সব কাজে এগিয়ে থেকেও সে শেকড়হীন, পলকা। জীবনের মূল খেলা, প্রতিযোগিতায় হেরে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই তার। অতনু বলল, তামাকের দাম আমি দেবো।

দূর থেকে আর একটা ট্রাম আসতে দেখে চনমন করে উঠল মিলিন্দ। আর

দেরি নয়, এ ট্রামেই সে চলে যাবে। ট্রামটা সামনে আসতেই চলন্ত গাড়ির পাদানিতে লাফিয়ে উঠে মিলিন্দ বলল, আমি চললাম, দিদিমার শরীর খুব খারাপ।

বন্ধুরা কিছু বোঝার আগেই মিলিন্দর ট্রাম এগিয়ে গেল। মামারবাড়িতে নেমন্তন্নের বদলে মুখ ফসকে দিদিমার অসুখের কথা বলে মুষড়ে পড়েছিল মিলিন্দ। এই বাষট্টি বছরের জীবনে একবারের বেশি দিদিমার জ্বর হয়নি। সেই দিদিমার অসুখ, ভাবা যায় না। গোলাপকুঁড়িটা সযত্নে হাতে নিয়ে ফাঁকা ট্রামের মধ্যে দাঁড়িয়ে মিলিন্দ ভাবছিল, কমলকলির মুখ, দুটো গভীর চোখের কুচকুচে কালো তারা, নীরোগ দিদিমা, দিদিমাকে জড়িয়ে বেফাঁস মিথ্যে, চিত্রবিচিত্র ধোঁয়াটে স্রোত বয়ে যাচ্ছিল তার মাথার মধ্যে। তার মনে হচ্ছিল, গত কয়েকমাসে সে যেন একটু বোকা, ভোঁতা হয়ে গেছে।

পাশের ঘরে তিন বন্ধুর সঙ্গে কমলকলি যে আড্ডায় মশগুল, টুকরো কথা, হাসিতে টের পাচ্ছে মিলিন্দ। নির্জন, শান্ত এই দুপুরে কমলকলির মুখোমুখি বসে গল্প করার যে ইচ্ছে, স্বপ্ন, গত দু'দিন মনের নিভৃতে মিলিন্দ লালন করেছে, পুরো মাঠে মারা গেল। গত তিনমাসে কমলকলিকে এভাবে একান্তে পাবার সুযোগ হয়নি তার। হাতের মুঠোয় এসেও ভেস্তে গেল সুযোগ। যতো সময় যাচ্ছে, অস্থিরতা, অধৈর্য, মর্মপীড়ায় তছনছ হচ্ছে মিলিন্দ। সে বুঝতে পারছে একতরফা কিছু হয় না। মোহ, লোভ, আসক্তিতে চোখবাঁধা বলদের মতো আচরণ করছে সে। নিজেকে সস্তা, খেলো করার এই চটুল খেলা ছেড়ে এখনই তার সরে যাওয়া উচিত। কিন্তু খেলাটা যে একতরফা, একথাও সে মানতে পারছে না। কমলকলির কি কোনো তাগিদ, আকাঙ্ক্ষা নেই! সে কি কিছু বলতে চায় না মিলিন্দকে? কমলকলির অবাধ, সহজ আচারণে মিলিন্দর জন্যে ছিটেফোঁটা পক্ষপাত কি নেই?

মিলিন্দর তা মনে হয় না। তাকে দেখলে কমলকলির দুচোখে যে উজ্জ্বলতা, কারুণ্য টলমল করে, তার মানে কী? এ দেখা কি চোখের ভুল, বিভ্রম, হাবামি? ব্যাখ্যা পায় না মিলিন্দ। দ্বিধা আর অহমিকার টানাপোড়েনে ঘর ছেড়ে নিঃশব্দে চলে যাবার কথা ভেবেও বিছানায় কাঠের পুতুলের মতো সে বসে থাকে।

তিনজোড়া পায়ের শব্দ দালান ধরে সিঁড়ির দিকে এগোতে শুনে মিলিন্দ বুঝল, বন্ধুরা যাচ্ছে। নিজেদের মধ্যে কথা বলছে তিনজন। কমলকলির গলাও শুনতে পেল মিলিন্দ। কারো কথায় আগ্রহ নেই তার। আড়ষ্ট হয়ে গেছে অনুভূতি।

হাতে সেই লাল গোলাপকুঁড়ি, হাসিমুখে কমলকলি ঘরে ঢুকতে মিলিন্দর মাথায় বাজ পড়ল। ফ্যালফ্যাল করে একবার গোলাপকুঁড়ি, আর একবার কমলকলির মুখের দিকে তাকিয়ে মিলিন্দ ভাবলো, এ ফুল কেন আনতে গেলাম? কিংকর, অতনু, কল্যাণ এ ফুল দেখে সব বুঝে গেছে। মিলিন্দর মনে হলো, তার দেমাক, সম্মান ধুলোয় মিশে গেল।

মিলিন্দর মুখের চেহারা দেখে কিছু না বুঝে কমলকলি বলল, কিংকরদা বেশ স্মার্ট। খুব মজা করতে পারে।

রাগে পিত্তি জ্বলে গেলেও মিলিন্দ চুপ। এতোদিন সে নিজেই ছিল কিংকরের

গুণগ্রাহী। কিংকরের অভিনয়, নাটক সম্পর্কে মুগ্ধতা বহু জায়গায় বলে বেড়িয়েছে মিলিন্দ। কিন্তু সে যা করে, কমলকলি তা করবে কেন? কমলকলির মুখে কিংকরের প্রশংসা শুনে মিলিন্দর অসহ্য লাগল।

তোমার কথা আর একটু হলে বলে ফেলতাম, কমলকলি বলল, কোনমতে সামলে নিয়েছি। অবশ্য বললেই বা কী হতো? সকলে মিলে আড্ডা দিতাম একসঙ্গে। একা বসে থাকতে হতো না তোমাকে।

মিলিন্দর বুকের মধ্যে এক অস্ফুট বেদনা কিরকির করছে। সকলের সঙ্গে বসে আড্ডা দেবার সখ থাকলে তাকে একা কেন ডাকলো কমলকলি? একথা শোনার জন্যেই কি এক বুক অস্থির আবেগ নিয়ে এতোক্ষণ বসে আছে সে? এসব কথা মিলিন্দ বলতে পারল না কমলকলিকে। বরং কমলকলির সারল্য, সপ্রাণ উচ্ছলতায় তার ক্ষোভ, অভিমান মুছে গেল।

নাকের সামনে ফুলটা ধরে দুচোখ বুজে হালকা লম্বা শ্বাস টানল কমলকলি। সুগন্ধের আবেশ ছড়িয়ে পড়ল তার কপালে, মুখে। ঘরের আবহাওয়া হঠাৎ গম্ভীর, হয়ে উঠেছে। কমলকলির মুখোমুখি বসে মিলিন্দর আড্ডা মারার আগ্রহ প্রায় শেষ। দালানের দিকে ঘরের বন্ধ জানলা একটু আগে খুলে দিয়েছে কমলকলি। খোলা জানলার ওপাশে দালান দিয়ে পুলকেশবাবুকে মাথা নিচু করে হেঁটে যেতে দেখে অবাক হলো মিলিন্দ। কমলকলিকে মিলিন্দ বলল, ইংরিজির পি. এস.-কে দেখলাম।

কনককে ইংরিজি পড়ায় পুলকেশ, কমলকলি বলল। তার কলেজের ইংরিজির অধ্যাপককে নাম ধরে কমলকলি উল্লেখ করায় আহত হলো মিলিন্দ। কমলকলির পরের বোন কনকলতা ক্লাস টেনের ছাত্রী। মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। কনকের সঙ্গে পরিচয় হলেও সে যে পুলকেশের ছাত্রী, মিলিন্দ জানতো না।

পুলকেশ আমার বড়দার বন্ধু, কমলকলি বলল, ওরা একসঙ্গে কলেজে পড়েছে। ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে বড়দা এখন আমেরিকায়। গত বছর মাধ্যমিকে কনক ইংরিজিতে ফেল করায় দাদার অনুরোধে তাকে ইংরিজি পড়াচ্ছে পুলকেশ।

ছাব্বিশ, সাতাশ বছরের পুলকেশবাবুকে কমলকলি বারবার পুলকেশ বলায় মিলিন্দর বেশ খটকা লাগছে। মুখে কিছু বলল না সে।

কমলকলি বলল, কিংকরদা, অতনু,কল্যাণ পার্ক স্ট্রিটে গেল। সেখানে কোন একটা রেস্টুরেন্টে ওদের আরো কয়েকজন বন্ধু আসবে। আমাকেও যেতে বলেছিল।

কমলকলি হঠাৎ চুপ করতে মিলিন্দর মনে হলো, তার জন্যেই যে পার্ক স্ট্রিটে কমলকলি যায় নি, একথাটা শুনিয়ে দিল সে।

যেতে পারতে তুমি।

মিলিন্দর কথা কানে না তুলে কমলকলি বলল, আজ দক্ষিণেশ্বরে যাবো আমি। তুমি যাবে?

কমলকলির মুখের দিকে এক পলক তাকিয়ে মিলিন্দ বলল, যাবো।

ফাইন। আমি তৈরি হচ্ছি।

বাড়ি থেকে একটু ঘুরে আসবো, মিলিন্দ বলল, দশ মিনিটের মধ্যে ফিরবো।

কী দরকার ?

দরকার আছে।

বাড়ি ছুঁয়ে আসার জন্যে মিলিন্দ উঠে পড়ল। রাস্তা পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দিল কমলকলি। মিলিন্দর মনে পড়ল, কিছুদিন আগে তাকে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যেতে চেয়েছিল নবনীতা। সরাসরি নবনীতার অনুরোধ, কাজের অজুহাতে, ডিবেটের ছুতোয় নাকচ করেছিল সে। অপমানিত, আহত হলেও নবনীতা মুখে কিছু বলে নি। অথচ আজ দক্ষিণেশ্বরে যাবার কথা কমলকলি একবার বলতেই রাজি হয়ে গেল সে। সেদিনের চেয়ে আজ সন্ধ্যে সাড়ে ছটায় তার আরো জরুরী কাজ, ছাত্রসংগঠনের সভা আছে। রাজ্যের নানা জেলায় এ বছর ভয়ংকর বন্যায় ঘরবাড়ি, ক্ষেত, ফসল ভেসে গিয়ে হাজার হাজার মানুষ রাস্তার ভিখিরী হয়ে গেছে। বন্যার্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে যে ছাত্রসংগঠনের মিলিন্দ সমর্থক, তারা সভা ডেকেছে। সাতদিন আগেই এ সভায় হাজির থাকার কথা দিয়েছে মিলিন্দ। কিন্তু সভায় না গিয়ে কমলকলির সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে যাচ্ছে। নিজেকে খুব বেহায়া, স্বার্থপর মনে হলো মিলিন্দর। বুকের কোথাও তীক্ষ্ণ ধারালো দাঁতে একটা পোকা কামড়াচ্ছে। সে ঠিক করলো, বাড়ি ফিরে ফোনে প্রোগ্রামটা বাতিল করার কথা কমলকলিকে জানাবে। কিন্তু তার চোখের সামনে ভাসছে একটা মন্দিরের চূড়ো, গঙ্গার জোয়ার, ফুলে ওঠা ঢেউ, দু' তীরের সবুজ গাছগাছালি। কমলকলির ঘরে বসে একটু আগে যে স্বপ্ন, মেজাজ হারিয়ে গিয়েছিল, তা আবার ফিরে আসছে। কমলকলির প্রস্তাবে রাজি না হয়ে উপায় ছিল না তার। বাড়ির ছাতের ওপর তখন দুপদাপ শব্দ। কমলকলির ভাইবোনরা খেলা করছিল নিশ্চয়। এ বাড়ির ছেলেমেয়েদের খেলার ধরন গত দেড়-দু'মাসে মিলিন্দ জেনে গেছে। ছাতের ওপর কমলকলির ছোট তিন বোন ডাংগুলি খেলে, ঘুড়ি ওড়ায়, ভাইরা পুতুল খেলে, ছুঁচ, সুতোয় ফুল তোলে রুমালে। কমলকলির সঙ্গে একতলায় নামার সময়, সিঁড়ির মুখে তার বাবার মুখোমুখি হয়েছিল মিলিন্দ। কমলকলির বাবা বাইরে থেকে ফিরছে। দশাসই চেহারার মানুষটার পোশাক দেখে মিলিন্দ অবাক। সিল্কের লুঙি, সিল্কের পাঞ্জাবি, মাথায় জরির কাজ করা ভেলভেটের সাদা ফেজ টুপি, পায়ে শুঁড়তোলা লক্ষ্ণৌ নাগরা, নাকের নিচে দুপাশে পাকানো মোটা, পুরুষ্টু গোঁফ, কমলকলির বাবা যতীন দত্তকে প্রথমে চিনতে পারে নি মিলিন্দ। যতীন বাবুর গোঁফ ছিল না, সাতদিন আগেও এ গোঁফ মিলিন্দ দেখে নি।

সিঁড়ির শেষধাপে এসে কমলকলি ফিসফিস করে বলল, ছদ্মবেশে একটা কারখানার স্ট্রাইক ভাঙতে গিয়েছিল বাবা।

কোন্ কারখানা ?

মিলিন্দর প্রশ্নে বাগমারির এক ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার নাম বলল কমলকলি।

নাম শুনে ধক করে উঠলো মিলিন্দর বুক। গত তিনমাস, কিছু ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্যে ওই কারখানার শ্রমিকরা ধর্মঘট করছে। ধর্মঘটী শ্রমিকদের জন্যে গত মাসে কিছু টাকা মিলিন্দ তুলে দিয়েছিল। কারখানার আড়াইশো শ্রমিক না খেয়ে শুকিয়ে মরছে।

মিলিন্দর গা ঘিনঘিন করছিল। বুকের মধ্যে তুমুল হাহুতাশ। কমলকলি বলল, স্ট্রাইক ভাঙার কাজে বাবা খুব পাকা। নানা জায়গা থেকে প্রায়ই বাবার ডাক আসে। গত মাসে বাবা আসাম গিয়েছিল।

বাবার বন্ধু নৃসিংহ হাজারিকা সাতটা চা বাগানের মালিক। তিনটে বাগানে স্ট্রাইক চলছিল। বাবা যেতে সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

মাথা ঘুরছে মিলিন্দর। সে প্রশ্ন করল, তোমার বাবা শ্রমিকদের ধর্মঘটের বিরোধী?

হ্যাঁ, কমলকলি বলল।

এক মুহূর্ত থেমে কমলকলি বলল, কলকারখানা বন্ধ থাকলে দেশের ক্ষতি, জাতির ক্ষতি, আমিও স্ট্রাইকের বিরোধী।

কিন্তু রূপান্তর-এর তরফে আজ আমরা স্টার থিয়েটারের ধর্মঘটী কর্মীদের সমর্থন জানিয়ে এলাম, বিড়বিড় করে বলল মিলিন্দ।

সে স্ট্রাইক্ আলাদা, কমলকলি বলল, লেখক, শিল্পী, ভদ্রলোকদের স্ট্রাইকে রুচি, ন্যায্যতা থাকে। কুলিকামিনদের স্ট্রাইক হলো বজ্জাতি। আমি সহ্য করতে পারি না।

রাস্তা পর্যন্ত মিলিন্দকে পৌঁছে দিয়ে কমলকলি বাড়িতে ঢুকে যাবার পর, মাথায় নিদারুণ ঝড়, তুফান নিয়ে মিলিন্দ বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করেছিল। হঠাৎ মনে হচ্ছে বাড়ি অনেক দূর। কোনদিন সেখানে পৌঁছোনো যাবে না। বাড়ি ফিরে ফোন করে, কমলকলিকে জানাবে দক্ষিণেশ্বরে যাবে না সে। বন্যাদুর্গত মানুষদের জন্যে আজ জরুরী সভা আছে তার। তাছাড়া যে-বাড়ির গৃহকর্তা শ্রমিকদের ধর্মঘট ভেঙে বেড়ায়, যার মেয়ে শ্রমিক ধর্মঘটের বিরোধী, সে-বাড়ি, সেখানকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতে চায় না মিলিন্দ। সম্পর্ক যদি কিছু থাকে তা শত্রুতার সম্পর্ক। মিলিন্দ ভাবল, ছদ্মবেশ এঁটে ধর্মঘট ভাঙা কি যতীনের পেশা? যদি তাই হয়, তাহলে এর চেয়ে নোংরা, ঘৃণ্য পেশা আর কী হতে পারে? কমলকলিও ধর্মঘটের বিরোধী। ভদ্রলোকদের ধর্মঘট সমর্থন করলেও গরীব মানুষ, শ্রমিকশ্রেণীর ধর্মঘট তার মতে বজ্জাতি। কথাগুলো ভেবে অসহায়, শূন্য বোধ করছে মিলিন্দ।

গত বছর ছাত্রদের কিছু ন্যায়সংগত দাবির জন্যে তার কলেজের ছাত্রসংসদ ধর্মঘট করেছিল। এলেবেলে ধর্মঘট নয়, ছাত্রসংসদের নেতৃত্বে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা তেত্রিশ ঘণ্টা কলেজের প্রিনসিপালকে তার ঘরে ঘেরাও করে রেখেছিলো। সে আন্দোলনে নেতৃত্বের সামনের সারিতে ছিল মিলিন্দ।

ছাত্রদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট সব বিষয়, ম্যাগাজিন, ক্যান্টিন, কমনরুমের ষোলআনা দায়িত্ব দাবি করেছিল ছাত্রসংসদ। কলেজের পরীক্ষাপদ্ধতির সংস্কারও ছিল তাদের দাবি। ছাত্রদের একটা দাবিও মানতে রাজী হয় নি প্রিনসিপাল। তাই তাকে ঘেরাও না করে ছাত্রদের উপায় ছিল না। প্রিনসিপালের অফিসের ঠিক ওপরে, দোতলায় তার ফ্যামিলি কোয়ার্টার, বাসস্থান। প্রিনসিপালের ঘরের সামনে, পেছনে, দুটো দরজার সামনের দরজা দিয়ে কলেজে আর পেছনের দরজা দিয়ে কোয়ার্টারে

যাতায়াতের ব্যবস্থা। দুপুর দুটোয় ঘেরাও শুরু হতে দুটো দরজাই ছাত্রছাত্রীরা আটকে দিয়েছিল। ঘরের মধ্যে প্রিন্সিপাল একা। ঘটনাটা ঘটবে জেনেও প্রিন্সিপাল উপেক্ষা করেছিল ছাত্রদের অনুরোধ, দাবি। সন্ধ্যের পরও ঘেরাও উঠল না। ছাত্রনেতাদের সঙ্গে আলোচনা করতেও রাজী হলো না প্রিন্সিপাল। ছাত্রনেতারাও অদম্য। একটা ফয়সলা না করে ঘেরাও তারা তুলবে না। কলেজ লনে ছাত্রসভায় বক্তৃতা করেছিল ছাত্রনেতারা। বক্তৃতা করার জন্যে মিলিন্দকেও দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল তারা। ছাত্রসংগঠন, বা ছাত্রইউনিয়নের নেতা, কর্মী নয় মিলিন্দ। তবু তার বক্তৃতাতেই ছাত্রদের মধ্যে উদ্দীপনার জোয়ার বয়ে গিয়েছিল।

শেষ বিকেলে মিলিন্দকে একা নিজের ঘরে পেয়ে প্রিন্সিপাল প্রশ্ন করেছিল, তুমিও দলে ভিড়ে গেলে?

মিলিন্দ বলতে চেয়েছিল, স্যার আমাদের দাবিগুলো মেনে নিন। এগুলো ন্যায্য, ন্যায়সঙ্গত।

কিন্তু মুখে এলেও কথাটা বলতে পারে নি। এক কাপ চা হাতে করে ঘরে ঢুকেছিল সে। প্রিন্সিপালের সামনে টেবিলের ওপর কাপটা রেখে বলেছিল, স্যার, আপনার চা।

চায়ের কাপের দিকে এক সেকেন্ড তাকিয়ে সেটা তুলে নিয়েছিল প্রিন্সিপাল। টেবিলের ওপর প্রিন্সিপালের অকেজো টেলিফোন। ঘেরাও শুরু হতে ঘরের বাইরে টেলিফোন লাইন কেটে দিয়েছিল তরুণ। দোতলায় নিজের বাড়ির সঙ্গেও কথা বলার উপায় ছিল না প্রিন্সিপালের। ফোন লাইন কেটে দেবার খবর শুনে ক্ষুণ্ণ হয়েছিল মিলিন্দ। কিছু করার ছিল না তার। কিন্তু প্রিন্সিপালের সঙ্গে কথায়, ব্যবহারে ভদ্রতা বজায় রেখেছিল সে। বলা যায় ঘেরাও করার লজ্জায় আরো বেশি ভদ্র, বিনয়ী হয়ে উঠেছিল। ঘন ঘন চা, টোস্ট, কফি, বিস্কুট পাঠাচ্ছিল প্রিন্সিপালের ঘরে। ছাত্রসংসদের সভাপতি চন্দন প্রশ্ন করেছিল, স্যার রাতে ডিনারে কী খাবেন,—চিকেন, না মাটন?

প্রশ্ন শুনে প্রিন্সিপালের নির্বিকার মাংসল দুটো চিবুক তিরতির করে কেঁপে উঠেছিল। সহজ গলায় প্রিন্সিপাল বলেছিল, মাটন।

ডিনার শেষ হবার পরে, তখন রাত ন'টা, দোতলা থেকে নিচে নেমে এসেছিল প্রিন্সিপালের স্ত্রী, মেয়ে। তাদের হাতে খাবারের প্লেট, জলের ফ্লাস্ক, গ্লাস। প্রিন্সিপালের ঘরের পেছনের দরজা বন্ধ করে ঘাঁটি আগলে তিন-চারজন বসেছিল। খাবার হাতে মা, মেয়েকে দেখে কী করবে ভেবে পেল না তারা। প্রিন্সিপালের মেয়েকে ছাত্রছাত্রীদের অনেকে না চিনলেও স্ত্রী চেনা। কলেজের নানা অনুষ্ঠানে সস্ত্রীক প্রিন্সিপাল একাধিকবার এসেছে। প্রিন্সিপালের ঘরে পরিবারের লোকদের ঢুকতে দেওয়া যাবে কিনা, দরজায় যারা পাহারায় ছিল জানত না। তর্ক শুরু হয়ে গিয়েছিল দু'পক্ষে। মিলিন্দ সেদিকেই আসছিল তখন। কলেজের মাঠ, চারপাশ অন্ধকার। বন্ধ দরজার সামনে একজন বয়স্ক ভদ্রমহিলার সঙ্গে এক অসামান্য রূপসী তরুণীকে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিল মিলিন্দ। একবার দেখেই প্রিন্সিপালের স্ত্রী,

বিনতা সান্যালের পাশে দাঁড়ানো তরুণীকে চিনে ফেলেছিল মিলিন্দ। রিনরিনে তীক্ষ্ণ গলায় ইংরিজিতে মেয়েটা বলল, আমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে পারবো না আমরা? তাকে রাতের খাবার দেওয়া যাবে না? বয়স্ক মানুষটাকে উপোস করাবেন?

অবস্থা ঘোরালো হবার আগে প্রিন্সিপালের ঘরের পেছনের দরজা হাট করে খুলে দিয়ে মা, মেয়েকে মিলিন্দ বলেছিল, আপনারা ভেতরে যান।

দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকেছিল মিলিন্দ। ঘরের মধ্যে সূচিভেদ্য স্তব্ধতা। খাবারের প্লেট হাতে স্ত্রী, মেয়েকে এক মুহূর্ত দেখে প্রিন্সিপাল বলল, আমার ডিনার হয়ে গেছে। গ্র্যান্ড ডিনার দিয়েছিল ছেলেরা।

প্রিন্সিপালের পুরু দু'ঠোট ডিনারের তৃপ্তি, অথবা ব্যঙ্গে কুঁচকে গেল। টেবিলের ওপর প্লেট, ফ্লাস্ক, গ্লাস রেখে প্রিন্সিপালের দিকে তাকিয়ে মেয়ে বলল, বাবা আমি নিয়ে যাবো তোমাকে।

কোথায়?

প্রিন্সিপাল জানতে চাইলে মেয়ে বলল, দোতলায়, বাসাতে।

তা হয় না।

কেন?

তোমরা নিয়ে যেতে চাইলেও ছেলেরা ছাড়বে না।

মারবে আমাদের?

মেয়ের প্রশ্নের জবাব দিল না বাবা। দুচোখে দুনিয়ার ঘৃণা নিয়ে মিলিন্দর দিকে তাকিয়েছিল মেয়েটি। তারপর বাবাকে বলল, হুডলামস, আই হেইট দেম।

রাগে, অপমানে লাল হয়ে উঠল মিলিন্দর মুখ। চন্দন, নচিকেতা, তরুণ ঢুকতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল মিলিন্দ।

প্রিন্সিপালের মেয়ের মুখেচোখে ধর্মঘটীদের বিরুদ্ধে সেদিন যে রাগ, ঘৃণা মিলিন্দ দেখেছে, আজ সেই এক জিনিস, কমলকলির চোখেও নজর করল সে। ছদ্ম-বেশ বাবা পরে শ্রমিক, সাধারণ মানুষের ধর্মঘট ভেঙে বেড়ায়, এ কথা বলতে একটু গলা কাঁপে নি কমলকলির। বরং খুশি, দেমাক চলকে উঠেছিল তার কণ্ঠস্বরে। ধর্মঘট ভাঙাই যে কমলকলির বাবার পেশা, বা অনেক পেশার একটা, মিলিন্দর আর সন্দেহ নেই। এই পেশার জোরেই কমলকলিদের এতো বড়ো বাড়ি, সংসারে স্বচ্ছলতা, সমৃদ্ধি। মিলিন্দর শরীরে, মনে ছড়িয়ে পড়ল চোরা আতঙ্ক।

কমলকলির বাড়ি থেকে মিলিন্দর বাড়ি হাঁটা পথে পাঁচ, সাত মিনিটের বেশী নয়। বাড়ি ফিরে নিজের ঘরে গুম হয়ে বসে থাকলো মিলিন্দ। ঘরের তিনটে জানলাই বন্ধ। আলো জ্বলে নি। বিকেল চারটেতে আলো জ্বালার সময়ও নয়। আবছা অন্ধকার ঘরে বসে, কী করা যায় মিলিন্দ ভাবছে। বন্যার্তদের জন্যে সংগঠনের

জরুরী সভায় যাবার জন্যে বিবেকের তাগিদ আছে। পাশাপাশি চোখের সামনে ভাসছে কমলকলির মুখ, ঝকঝকে, গভীর দু'চোখ, হাসি, কথা। মাঝে মাঝে স্থির দৃষ্টিতে কয়েকমুহূর্ত চুপচাপ মিলিন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে কমলকলি। নরম, ফিকে হাসি ছড়িয়ে পড়ে তার মুখে। তারপর তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে নেয় সে। এমন কোমল, উদার মেয়ে কীভাবে ধর্মঘটবিরোধী, নিষ্ঠুর কথা বলল, বুঝতে পারছে না মিলিন্দ। তার মনে হলো, এর জন্যে কমলকলির বাবা যতীন দত্ত দায়ী। বাবার প্রভাবেই কমলকলির মাথায় যতো ভুল চিন্তাভাবনা ঢুকে গেছে। পরিবেশ মানুষকে গড়ে। কমলকলির জীবনেও তাই ঘটেছে। রক্ষণশীল, অমানবিক ধারণাগুলোর জন্যে কমলকলি দায়ী নয়। বিভ্রান্ত কমলকলির সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিলে তারই ক্ষতি করা হবে। চিকিৎসা, নিরাময়ের বদলে রুগীকে মেরে ফেলার হাতুড়েপনা সে দেখাবে না। কমলকলিকে তার বাবার খপ্পর থেকে বার করে আনবে। তার মনে জেবলে দেবে নতুন চেতনার আলো। এ এক চ্যালেঞ্জ, লড়াই। কিন্তু কীভাবে এগোবে ভাবতে গিয়েই মিলিন্দর মনে পড়লো তার সংগঠনের কথা। জীবন-যুদ্ধে ছাত্রদের সজাগ, সচেতন, দায়িত্ববান করার বিরামহীন চেষ্টা চালাচ্ছে সংগঠন। সে প্রচেষ্টার সঙ্গে মিলিন্দর একটা আলগা সম্পর্ক আছে। সংগঠনের নেতারা বিস্তর ডাকাডাকি করলেও, খুব আগ্রহ দেখায় না সে। মিলিন্দ ঠিক করলো, সংগঠনের কাজে আরো সক্রিয় হবে। কমলকলিকেও সঙ্গে নেবে। ছাত্রসংগঠন থেকে একসময়ে পার্টিতে চলে যাবে। জোরালো আদর্শ, জীবন্ত কর্মসূচী পেলে মানুষ বদলে যায়। সে নিজেকে বদলাবে, এবং কমলকলিকেও তার বাবার অশুভ মুঠো থেকে মুক্ত করবে।

বাড়ি এখন ফাঁকা। বিছানায় শুয়ে মা নিশ্চয় খবরের কাগজ পড়ছে। ছোটপিসি গেছে টিইশানিতে। স্কুল থেকে ভাই বোনেদের ফেরার সময় হলো। অফিস থেকে বাড়ি ফিরতে বাবার সাড়ে সাতটা। কমলকলিকে নতুন প্রেরণা, চিন্তায় দীক্ষিত করার কথা ভেবে মনে জোর পেল মিলিন্দ। চোখের সামনে সরল, সপ্রাণ একটি মেয়ে ঘুণধরা, জীর্ণ, অসৎ জীবনের বেনোজলে ভেসে যাবে, এ ঘটনা সে মেনে নিতে রাজি নয়। আলমারি খুলে একটা পোর্টফোলিও ব্যাগ থেকে চল্লিশ টাকা বার করে পকেটে পুরলো সে। টাকাটা তার নিজের নয়। গত মাসে বহরমপুরে ডিবেটে যাবার সময় ইউনিয়ন ফান্ড থেকে দুশো টাকা তার হাতে দিয়েছিল চন্দন। বহরমপুরের পর এলাহাবাদে আন্তর্কলেজ প্রতিযোগিতা আছে। মিলিন্দ আর মৃণালের জন্যে দুশো টাকা দিয়ে চন্দন বলেছিল, যা বাঁচবে, রেখে দিবি। এলাহাবাদে যাবার সময় আরো কিছু টাকা তুলে দেবো।

বহরমপুরে দু'জনের যাওয়াআসার ভাড়া, চা সিগারেটের খরচের পর পঞ্চাশ টাকা বেঁচেছে। দিন পনের পরে এলাহাবাদ যেতে হবে। বাড়তি টাকা তাই নিজের কাছে রেখে দিয়েছিল মিলিন্দ। কমলকলির সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর যাবার জন্যে সেখান থেকে চল্লিশ টাকা নিতে তার হাত কাঁপলো, বুক কাঁপলো। ছাত্রদের টাকা, পাবলিক ফান্ড নিজের জন্যে খরচ করাকে তছরুপ বলে। তহবিল তছরুপ শব্দটা কাঁটার মতো বিঁধে গেল মাথায়। কিন্তু উপায় কি? খালি পকেটে কমলকলির সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে

সে যাবে কোন মুখে! কমলকলি যদি কিছু খেতে চায়? না চাইলেও তাকে অফার করা উচিত। যাতায়াতের জন্যে কমলকলি যদি ট্যাক্সি ধরে, এক পিঠের ভাড়া মিলিন্দকে জোর করে হলেও দিতে হবে। তাছাড়া রাস্তায় বেরোলে দু'পাশের দোকানে কতো ফুল, ফল, রকমারি খাবারের সমারোহ। কমলকলিকে নিয়ে অসহায় চোখে সে সব শুধু দেখার লজ্জা মিলিন্দ সইতে পারবে না। রাস্তায় একা থাকলেই এক অসহ্য অনুভূতিতে দপদপ করে তার মাথা। চারপাশে এতো বিলাস, সুখ. সমৃদ্ধির আয়োজন দেখে যে-কোনোভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা উপায়ের স্বপ্ন দেখে সে। আজ তার সঙ্গী কমলকলি। লক্ষ, কোটি টাকার স্বপ্ন, অন্তত চল্লিশ টাকায় যতোটা মেটানো যায়, সে মেটাবে। খালি পকেটে রাস্তায় ঘোরার সময় কিংকর, অতনু, কল্যাণের বিরুদ্ধে গোপন হিংসের কালো ধোঁয়া মাঝে মাঝে মিলিন্দর মনে ছড়িয়ে পড়ে। কালো হয়ে যায় তার মন। স্টার থিয়েটারের কর্মীদের জন্যে ফুল কিনে, যে কিংকর বলল, টাকা শেষ, এক ঘণ্টা পরে সে পার্ক স্ট্রিটে যাবার নেমতন্ন করল কমলকলিকে। খরচ নিশ্চয়ই কিংকরের। কিংকরের পকেট খালি হয়ে যাবার কথা বিশ্বাস করে নি মিলিন্দ। শুধু মিলিন্দ কেন, অতনু, কল্যাণও বিশ্বাস করে নি। বন্ধুরা সকলেই জানে যে, কিংকরের পকেট কখনও খালি হয় না। ফুরিয়ে যাবার পরে যা থেকে যায়, তা ফুরোতেও অনেক সময় লাগে। কিংকরের বাবার পেশা, বন্ধুদের কথায়, ভগবানের ব্যবসা! গুরু হিসেবে তাঁর দেশজোড়া খ্যাতি। ভারতবর্ষের কতো নামী শিল্পপতি, ব্যবসায়ী যে কিংকরদের বাড়িতে আসে, তার বাবার পায়ের সামনে সাষ্টাঙ্গে শুয়ে প্রণাম করে, সে হিসেব মিলিন্দর জানা নেই। এক বৃদ্ধ বিড়লা, মাঝবয়সী এক বাজোরিয়াকে কাঠের চেয়ারে বসা, আটহাতি ধুতি পরা, আদুল গা কিংকরের বাবার পায়ের ধুলো খেতে দেখেছে মিলিন্দ। মাথায় বড়ো টাক, দু'চোখ ভাবাবিষ্ট, আপনভোলা মানুষটি তাকিয়েও দেখছিল না কে বিড়লা, কে বাজোরিয়া। দু' আড়াই বছর আগে হায়ারসেকেন্ডারি পরীক্ষার পর ব্যান্ডেল চার্চে ফিসটে যাবার মতলব করেছিল বন্ধুরা। কিংকরেরও যাওয়ার কথা। কিংকরকে দলে নিতে হলে তার বাবার অনুমতি দরকার। কিংকরের বাবাকে কথাটা বলার দায়িত্ব চেপেছিল মিলিন্দর ওপর। কিংকরই চাপিয়েছিল দায়িত্বটা। ব্যান্ডেল চার্চে চড়ুইভাতির নামে একপলক তাকিয়ে সেই গৃহী সন্ন্যাসী মিলিন্দকে বললেন, না বাবা, ব্যান্ডেলে তোমাদের যাবার দরকার নেই। জায়গাটা খুব খারাপ। বাঘ, ভালুকের উপদ্রব আছে।

ব্যান্ডেলে বিখ্যাত টায়ার কোম্পানির বিরাট ফ্যাক্টরি, চার্চ, গঙ্গা, গিজগিজ করছে মানুষ, সেখানে বাঘ, ভালুকের উপদ্রব শুনে মিলিন্দ হাসবে, না কাঁদবে ভেবে পেল না। তারপর অনেক বুঝিয়ে সে রাজী করিয়েছিল কিংকরের বাবাকে। সেই দুপুরে কিংকরের বাড়িতে খেয়ে, সারা দুপুর বিকেল তার দিদি, কাকিমা, ভাইবোনদের সঙ্গে গল্প করে রাত ন'টায় বাড়ি ফিরেছিল মিলিন্দ। কিংকরদের বাড়িতে একদিন কেন, দিনের পর দিন মিলিন্দ, শুধু মিলিন্দ কেন, কিংকরের সব বন্ধুই খেয়েছে। আজও খায়। কিংকরদের বাড়িতে গেলেই খেতে হয়। যে ভাড়াবাড়িতে কিংকররা থাকে,

সে বাড়িটা খুব পুরোনো, অগোছালো, জিনিসপত্রে ঠাসা। সারাদিন লোকজনের যাতায়াত লেগে আছে। ভিজে উঠোনের একপাশে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যে উনুনটা দাউদাউ জ্বলে, সেটা আসলে চুলো। লোক আসার যেমন শেষ নেই, খাওয়ারও শেষ নেই। কিংকরের বাড়িতে গেলে মিলিন্দর বিস্ময় জাগে। আনন্দ পায় সে। কিংকরের কাকিমা, দিদি, ভাইবোনদের আসলে খুব পছন্দ করে মিলিন্দ। স্নেহপ্রবণ কাকিমা, আমুদে ভাইবোন, অচেনা কেউ গেলে, সহজেই আপন করে নেয়। কিংকরের মা রাশভারি, কম কথা বলে, একটা বড়ো বঁটি পেতে সারাক্ষণ কুটনো কুটে যায়। কিংকরের কাকিমা দারুণ সুন্দরী, মাতৃত্বে ঢলঢল মুখ, চোখ, সংসারের সব ঝক্কি সামলায়। কিংকরের বন্ধুরা গেলে তাদের না খাইয়ে কাকিমা ছাড়ে না। মিলিন্দর ওপর কাকিমার যেন একটু বাড়তি স্নেহ আছে। কিংকরের খুড়তুতো বোন চিনু, ভালো নাম চিন্ময়ী, মিলিন্দ গেলে চঞ্চল হয়। চিনু পড়ে ক্লাস নাইনে। মায়ের সোনার মতো রঙ, দেবীপ্রতিমার মতো চোখ, গড়ন চিনু পেয়েছে। দুচোখে কৌতুক, কৌতূহল নিয়ে সে কথা বলে মিলিন্দর সঙ্গে। কখনো ফ্রক, কখনো শাড়ি পরা দেখে বোঝা যায় নিজেকে নিয়ে চিনু বিপন্ন। মিলিন্দকে চিনু প্রায়ই বলে, আপনার ডিবেট শুনতে যাবো মিলিন্দদা।

ওটা শোনার মতো কিছু নয়, মিলিন্দ বলেছিল।

তবু আমি শুনবো।

চিনুকে তাড়া লাগিয়ে কিংকর বলেছিল, যা, ভাগ এখান থেকে।

কাকিমা হেসেছিল।

বাড়ির আর সবার তুলনায় কিংকর একটু শীতল, অন্যরকম। মিলিন্দর মনে হয়, কিংকরের বুকের মধ্যে তাপ কম, অনুরাগের অভাব। সামান্য আত্মকেন্দ্রিক, হামবড়া সে। পকেটে সবসময়ে অনেক টাকা থাকার জন্যেই বোধহয় এরকম হয়েছে। অবশ্য শুধু টাকার জন্যেই কিংকর এরকম, তা নাও হতে পারে। কল্যাণের পরিবারও কম বড়লোক নয়। তিন পুরুষের ত্রিপলের ব্যবসা তাদের। মিলিটারির ত্রিপল যোগানদার। মিলিটারির বাতিল ত্রিপল নিলামে কিনে মিলিটারিকেই আবার বিক্রি করে। ত্রিপলের ব্যবসায় তিনপুরুষে ফুলে ফেঁপে উঠেছে তারা। অতনু, কিংকরের মতো কল্যাণের পকেটে গোছাগোছা নোট না থাকলেও তার টাকার অভাব কখনও দেখেনি মিলিন্দ। কিন্তু টাকার গরম নেই কল্যাণের। এদের সঙ্গে বন্ধুত্বের পাল্লায় একজন চাকরিজীবীর ছেলে হয়ে মিলিন্দ পারবে কেন? তবু বন্ধুদের সঙ্গে নিজের মেধা, তেজ, তীক্ষ্ণতায় মাথা উঁচু করে সগৌরবে মধ্যমণি হয়ে আছে সে। তা না হলে বাড়ি থেকে রোজ এক টাকা পকেট খরচ নিয়ে কলেজ স্ট্রিট দাপিয়ে বেড়াবার দুঃসাহস হতো না তার। কিন্তু এ অবস্থা যে বেশীদিন থাকবে না, বুঝতে পেরে আজকাল অস্বস্তিতে খচখচ করে তার বুক। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে টাকার হাঁ মুখ বন্ধুত্বকে গিলে নেবে, আগাম টের পেয়ে এক বেপরোয়া রুক্ষতা ভর করছে মিলিন্দকে। তার মনে হয় শুধু মেধা, শিক্ষা, গুণাবলী দিয়ে সসম্মানে, মাথা উঁচু করে বাঁচা প্রায় অসম্ভব। টাকা দরকার, লক্ষ লক্ষ, কোটি-কোটি টাকা।

অন্ধকার হচ্ছে ঘর। কমলকলি অপেক্ষা করে আছে জেনেও যেতে ইচ্ছে করছে না মিলিন্দর। কমলকলিকে কি সে বদলাতে পারবে? যদি না পারে? তাছাড়া কমলকলির জন্যে তার এতো চিন্তা কেন? সেই সকালে ভাত খেয়ে মিলিন্দ কলেজে বেরিয়েছিল। তারপর দু'তিন কাপ চা ছাড়া পেটে কিছু যায় নি। বেশ খিদে পেয়েছে। খিদের কথা মাকে এখন বললে খান চারেক রুটি, আলুর তরকারি এসে যাবে। খাবারের কথাটা ভেবেই তার খিদে মরে গেল। এখন খেতে বসলে কমলকলির বাড়িতে যেতেও দেরী হয়ে যাবে। পকেটের চল্লিশ টাকায় একবার হাত বুলিয়ে মিলিন্দ রাস্তায় এসে দাঁড়াল। ধুলো অথবা কুয়াশায় ঝাপসা হয়ে আছে রাস্তা। বাতাসে শীতের সিরসিরভাব। জেঁকে শীত পড়ার আর দেরী নেই। উদ্বেগ, শপথে কাঁপছে মিলিন্দর বুক। তার জন্যে তৈরী হয়ে কমলকলি নিশ্চয় বসে আছে। কমলকলির সাজে কোনো বাহুল্য নেই। কপালে টিপ, চোখে কাজল কখনও লাগায় না সে। তাঁতের ডুরে শাড়ি, ছিমছাম প্রসাধনে তার শ্যামবর্ণের গভীর থেকে সোনালী দীপ্তি বেরিয়ে আসে। মিলিন্দ মনে মনে বলল, কমলকলি, তুমি বাঁচাও আমাকে।

কমলকলির বাড়ির কাছে এসে আবার তার মন তেঁতো হয়ে গেল। বাড়ির সদর দরজায় দাঁড়িয়ে ভেতরে যাবে কিনা ভেবে পেল না। স্ট্রাইক ভাঙা যে বাড়ির গৃহকর্তার পেশা, মানুষের সংগ্রামকে যে বাড়ির মেয়ে ঘেন্না করে, সে বাড়িতে তার জায়গা কোথায়? জায়গা পেলেও সেখানে সে পা রাখবে কী করে? কিন্তু কমলকলিকে বাদ দিয়ে মিলিন্দ ভাবতে পারছে না কিছু। কমলকলির মধ্যে এমন এক আদর্শ, বিশ্বাস সে ঢুকিয়ে দিতে চায়, যা তাকে বদলে দেবে, মানুষ আর পৃথিবীকে ভালোবাসতে শেখাবে। নিজের স্বার্থেই সে গড়েপিটে নেবে কমলকলিকে। তার কুড়ি বছরের এই জীবনের আদিগন্ত জুড়ে এখন থৈথৈ করছে কমলকলি। তার জন্যে মিলিন্দ সর্বস্ব বাজী ধরতে পারে। আকাঙ্ক্ষা, বিপন্নতায় টলমল করছে সে। কমলকলির সামনে দাঁড়িয়ে মিলিন্দ কেমন আড়ষ্ট হয়ে গেল।

এতো দেরী কেন?

কমলকলির প্রশ্নে আবছা গলায় মিলিন্দ বলল, খুব দেরী হয়েছে?

কুড়ি মিনিট।

স্থির চোখে হাসির আভা ছড়িয়ে কমলকলি বলল।

কমলকলির ঘরের সামনে দালানের ওপর দাঁড়িয়ে কথা বলছে দু'জন। কোণের ঘর থেকে পুলকেশ, পেছনে কনক বেরিয়ে এল। মিলিন্দকে না চেনার ভান করে হনহন করে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল পুলকেশ। তার মুখ গম্ভীর। পুলকেশের ব্যবহারে অপমানিত বোধ করল মিলিন্দ। হাসিখুশি, উদার মাস্টারমশাই-এর কাছ থেকে এরকম অভদ্র আচরণ প্রত্যাশা করেনি সে। প্রাইভেট টুইশন

পড়ে যাবার জন্যেই কি এভাবে না দেখার ভান করে পালিয়ে গেল পুলকেশ? সিঁড়ি পর্যন্ত ইংরিজির মাস্টারকে এগিয়ে দিল কনক। তার ঝকঝকে মুখ, ঠোঁটে হাসি। কনকলতার গায়ের রঙ কমলকলির চেয়ে ফর্সা, নাক, চোখ তীক্ষ্ণ, কাটাকাটা। কমলকলির চেয়ে হয়তো সে বেশি সুন্দরী। তবু কমলকলির রূপের রহস্য, মায়া, কনকলতার নেই। কনক হাসতে তাকে মিলিন্দ প্রশ্ন করল, ইংরিজি কেমন এগোচ্ছে?

কনকের মুখে একঝলক রক্ত ছড়ালো। সে জবাব দিল, ভালো।

কোথায় যাচ্ছিস?

কনক প্রশ্ন করতে কমলকলি বলল, দক্ষিণেশ্বর।

দক্ষিণেশ্বর গঙ্গার ধারে কমলকলি, মিলিন্দ যখন পাশাপাশি দাঁড়াল, তখন সূর্য ডুবে গেলেও গুঁড়ো গুঁড়ো লাল আলো আকাশের গায়ে লেগে আছে। পঞ্চবটি, দুপাশের লম্বা, ঝাঁকড়া গাছগুলোয় ঘরে ফেরা পাখিরা দিনের শেষ ডাক ডেকে ডানা ঝাপটাচ্ছে। আকাশের চেয়ে গোধূলির আলো জলের স্রোতে বোধহয় বেশি সময় থাকে। গঙ্গার ঘোলা জলে সূর্যাস্তের আলো তাই এখনও মিশে আছে। একটার পর একটা ঢেউ লেগে ছোট বড়ো নৌকোগুলো কাঁপছে। ফ্যাকাসে আলোয় মাঝি, দাঁড়িদের স্পষ্ট দেখতে পেল মিলিন্দ। ফিকে আলোর সঙ্গে পাতলা ফিনফিনে কুয়াশার সর ছড়িয়ে আছে গঙ্গার বুকে। মন্দির থেকে ভেসে এলো কাঁসরের ঢঙঢঙ, শাঁখের গম্ভীর ধ্বনি।

গঙ্গার তীব্র স্রোতের দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে কমলকলি। জলের বুক থেকে উঠে আসা হালকা আলো এসে পড়েছে তার মুখে। পেছনে অন্ধকার। ঘাটের শেষ ধাপ থেকে কমলকলিকে দেখে একটা সিলুয়েট ছবি মনে হলো মিলিন্দর। দক্ষিণেশ্বরে আগে একবার মিলিন্দ এসেছে। আজ দ্বিতীয়বার। কিন্তু এ আসা একেবারে অন্যরকম। চারপাশের গাছপালা, মন্দির, নদীর জলে তিরতির করে কাঁপছে অচেনা রোমাঞ্চ। মন্দিরের বাইরে রাস্তার ওপর একটা পরিচ্ছন্ন রেস্টুরেন্ট আসার সময় মিলিন্দ দেখেছে। ফেরার সময় সেখানে কমলকলিকে খাওয়াবে মিলিন্দ। কী খাওয়াবে? দুটো চিকেন কাটলেট, দু'কাপ কফির কতো দাম, আন্দাজ করার চেষ্টা করল সে। আসার সময় ট্যাক্সি ভাড়া সাড়ে বারো টাকা মিলিন্দ দিয়েছে। ট্যাক্সিতে উঠতে কমলকলি আপত্তি করলেও বাসের ভিড় দেখে শেষপর্যন্ত রাজি হয়েছিল। ট্যাক্সি ভাড়াও দিতে চেয়েছিল সে। মিলিন্দ নেয়নি। ফেরার সময়েও যদি ট্যাক্সিতে যেতে হয়, তাহলে আবার বারো, তেরো টাকা লাগবে। চল্লিশ টাকার রসদে কুলোবে কিনা, ভেবে হদিশ পেল না। দলে দলে লোক আসছে গঙ্গার ঘাটে। স্নান করছে দু'চারজন। মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজতে কমলকলি বলল, আমি পুজো দেবো। তুমিও চলো।

পুজো টুজোয় আমার বিশ্বাস নেই।

আমার আছে।

তুমি দাও।

তুমি সঙ্গে যাবে।

যাবো, হেসে মিলিন্দ বলল।

একটা দোকান থেকে শালপাতার ঠোঙায় ফুল, বাতাসা কিনে মন্দিরের সিঁড়িতে চটিজোড়া ছেড়ে কমলকলি বলল, আমার জুতো পাহারা দাও।

তথাস্তু।

মিলিন্দকে চটির কাছে রেখে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল কমলকলি। মন্দিরের দরজায় ভিড় থাকলেও সিঁড়ি, চাতালে লোকজন বিশেষ নেই। ধীরে ধীরে অন্ধকার নামছে। কাঁসর, ঘণ্টা, শাঁখের আওয়াজ বাতাসে প্রতিধ্বনি তুলছে। গভীর চিন্তায় বুঁদ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মিলিন্দ। গঙ্গার হাওয়ায় কমলকলির তাঁতের শাড়ির মাড় দেওয়া উড়ন্ত আঁচল এতোক্ষণ বারবার ছুঁয়ে গেছে তার কপাল, মুখ, বুক। গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার সময়ে কমলকলির শরীরের মিষ্টি গন্ধও মিলিন্দ পেয়েছে। কিছু গভীর বিশ্বাসের কথা, ইতিহাস, জীবনের কয়েকটা অমোঘ সূত্র, নিয়ম ইচ্ছে থাকলেও কমলকলিকে বলতে পারেনি। আবছা অন্ধকারে কমলকলির চটিজোড়ার পাশে দাঁড়িয়ে মিলিন্দ ঠিক করল, রেস্টুরেন্টে বসে দরকারী কথাগুলো, সামাজিক বিন্যাস, অর্থনীতির নিয়ম, যাবতীয় সম্পর্কের বস্তুবাদী, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার প্রথম পাঠ আজ শোনাবে কমলকলিকে। কিন্তু শুধু এ কথাগুলো বলেই কি সে শান্তি পাবে ? আরো একটা গভীর, গোপন কথা তার বুকের মধ্যে উসখুস করছে, পাখা ঝাপটাচ্ছে, তার কী হবে ? সে কথা কোনো বই-এ লেখা নেই। মিলিন্দ না বললে তা চিরকাল অব্যক্ত থেকে যাবে। দশ মিনিটের মধ্যে ছোট্ট একটা টুকরি নিয়ে ফিরে এলো কমলকলি। টুকরি খুলে মিলিন্দকে বলল, হাত পাতো, প্রসাদ।

প্রসাদ খাই না।

কমলকলি হঠাৎ ডান হাতে একটা বাতাসা তুলে মিলিন্দর মুখে প্রায় জোর করে গুঁজে দিল। কমলকলির নরম, উষ্ণ, হাতের স্পর্শে কেঁপে উঠলো মিলিন্দ। তার কাঁপুনি হয়তো টের পেল কমলকলি। বলল, মায়ের কাছে এখানে যা প্রার্থনা করা যায়, তাই হয়।

কী প্রার্থনা করলে তুমি ?

মিলিন্দর প্রশ্নে মুচকি হেসে কমলকলি বলল, প্রার্থনা ফাঁস করে দিলে ফলে না।

কমলকলির গলার স্বর থমথমে, গম্ভীর হয়ে গেল। অন্ধকার চাতালে পাশাপাশি হাঁটছে দু'জন। বাড়ি ফেরার সময় হয়েছে। কমলকলি হঠাৎ বলল, কাল রাতে আমাকে চাবুক মেরেছে বাবা। পিঠের চামড়া কেটে রক্ত বেরিয়ে গেছে।

মিলিন্দর ডান হাতটা তুলে নিজের পিঠের ওপর চেপে ধরে কমলকলি প্রশ্ন করল, ফুলে আছে, টের পাচ্ছো ?

চাতালের এ পাশটা ফাঁকা। একজনও মানুষ নেই। কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে কমলকলির পিঠে রেখে অবশ হয়ে গেছে মিলিন্দর হাত। সে নিজেই যেন চাবুক খেয়ে রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত। তার পা দুটো গুরুভার, হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। কমলকলি বলল, আর সহ্য করতে পারছি না আমি। যে কোনোদিন বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো।

কমলকলি কোথায় যাবে, প্রশ্নটা মুখে এলেও মিলিন্দ চুপ। তার বলতে ইচ্ছে করল, তোমাকে কোথাও যেতে হবে না। আমার সঙ্গে তুমি চলো। আমি আছি।

কিন্তু একটা কথাও তার বলা হলো না। বিস্ময়, বিপন্নতা, অসহায় আর্তি হাওয়ার মতো তার চারপাশে ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগলো।

মন্দিরের অন্ধকার উঠোন পেরিয়ে খোলা মাঠ। দূরে দূরে ছড়ানো লাইটপোস্ট্। ঢ্যাঙা, ঝাঁকড়া গাছের মাথায় কুয়াশার জটা থেকে হালকা আলো ধোঁয়ার মতো উড়ছে। একটা পাতলা চাদর শরীরে জড়িয়ে নিয়েছে কমলকলি। মিলিন্দর গরম জামার বালাই নেই। পাজামা, পাঞ্জাবি ফুঁড়ে শীত ঢুকছে শরীরে। হিমেল পাথরের মতো কমলকলিও যেন ঠাণ্ডা ছড়াচ্ছে। অন্ধকার মাঠ পেরিয়ে বড়ো রাস্তা, বাসস্টপ্। কমলকলি বলল, আমার বাবা ভীষণ বদরাগী। প্রায়ই চাবুক মারে। একবার মারতে শুরু করলে সহজে থামে না।

কমলকলির কথাগুলো সত্যি, না বানানো, ধরতে না পারলেও বারবার মুচড়ে উঠছে মিলিন্দর বুক। কলেজে পড়া এতো বড়ো মেয়েকে যে কোনো বাবা চাবুক মারতে পারে, বিশ্বাস করতে মিলিন্দর কষ্ট হচ্ছে। তাছাড়া কমলকলির মতো চটপটে, ব্যক্তিত্বময়ী সপ্রতিভ একজন মেয়েকে তার বাবা কেন মারে? মিলিন্দর মাথার মধ্যে একটা অন্ধ পোকা ভনভন করে উড়তে থাকে।

আমার ওপরই বাবার বেশি রাগ।

এতোক্ষণে মিলিন্দ প্রশ্ন করল, কেন?

জানি না।

একটু ভেবে কমলকলি বলল, কোনো কারণ নেই। পান থেকে চুন খসলে, জল দিতে দশ সেকেণ্ড দেরী হলে বাবা পেটাতে শুরু করে।

মিলিন্দর বুক ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে হৃৎপিণ্ড।

আমাকে বাবা আবার খুব ভালোও বাসে, কমলকলি বলল, শুধু আমাকে নয়, আমার বন্ধুদের, যারা আমাদের বাড়ি আসে, তাদেরও। বাড়িতে কেউ এলে তাকে জলখাবার, চা দেওয়া হয়েছিল কিনা বাবা খুঁটিয়ে খবর নেয়। কোনো গোলমাল হলেই বাবা অগ্নিশর্মা। আমি বাড়ির বড়ো মেয়ে। তাই সব দায় আমার। আর পারছি না আমি।

ছিমছাম সাজানো সেই রেস্টুরেণ্টের পাশ দিয়ে যাবার সময় একবার তাকিয়ে চোখ ফেরালো মিলিন্দ। কমলকলিকে নিয়ে রেস্টুরেণ্টে বসে খাওয়ার কথা এখন ভাবতে পারছে না সে। উদাস, আনমনা কমলকলি হঠাৎ প্রশ্ন করল, চা খাবে?

হ্যাঁ, মিলিন্দ বলল।

আলোকিত রেস্টুরেণ্টে ঢুকে একটু স্বস্তি পেল মিলিন্দ। দুঃস্বপ্নের ঘোর লাগা মাথা যেন আবার কাজ শুরু করেছে। সুস্থ, স্বাভাবিক হচ্ছে।

রেস্টুরেণ্টের একটা কেবিনে বসে মিলিন্দ প্রশ্ন করল, কী খাবে?

চা।

কমলকলির কথা কানে না তুলে চিকেন কাটলেট, কফির অর্ডার দিল মিলিন্দ।

প্রসাদের টুকরি হাতে চুপ করে বসে আছে কমলকলি।

কী ভাবছো ?

মিলিন্দর প্রশ্নে কমলকলি বলল, আকাশপাতাল।

সবুজ পর্দা ঝুলছে কেবিনে। গোলাপি সানমাইকা লাগানো টেবিলের দু'পাশে দুটো চেয়ারে বসেছে দু'জন। মাথায় অনেক প্রশ্ন ভিড় করলেও, মিলিন্দ চুপ। কোন্ প্রশ্ন দিয়ে শুরু করবে সে ? নিজের মেয়েকে কোনো বাবা চাবুক মারে ? কমলকলি সহ্য করে কেন ? মার খেয়েও বাবার স্নেহ, ভালোবাসার গল্প শোনায় কমলকলি। কোন্‌টা সত্যি ? কমলকলির বাবাকে নৃশংস, দানব মনে হলো মিলিন্দর। লোকটা ধর্মঘট ভাঙে, ছেলেমেয়েদের চাবকায়। সেটাই সব নয়, যতীন দত্ত দরাজ, উদার, অতিথিবৎসল। লোকটা আসলে উন্মাদ, বিকারগ্রস্ত। সামাজিক জীবনে শ্রমিক ঠেঙানো যার পেশা, সে যে ভদ্রলোক নয়, সাংসারিক পরিবেশে তার পিতৃত্ব যে নিষ্ঠুর, অমানুষিক গুন্ডামির চেহারা নেবে, এমন এক সিদ্ধান্ত মিলিন্দর মাথায় এলো। কথাটা একটু নরম করে সে বলল, ধর্মঘটি শ্রমিক ঠেঙানোর অভ্যেসে বাড়িতে ছেলেমেয়েদেরও বোধহয় তোমার বাবা বেয়াদপ মজুর ভাবেন।

কমলকলি কথা বলল না। আরো দু'চার কথা, শ্রমিক আন্দোলনের বিরোধিতা যে একজন মানুষকে নষ্ট, নিচ, নিষ্ঠুর করে তুলতে পারে, কমলকলির উচিত আদর্শগতভাবে বাবার বিরোধিতা করা, বলতে গিয়েও চুপ করে গেল মিলিন্দ। ভারী বিষন্ন, করুণ দেখাচ্ছে কমলকলিকে। এ মুহূর্তে রুটিন তত্ত্বকথার বদলে কিছু সহৃদয়, প্রিয় শব্দ হয়তো শুনতে চায় সে।

রেস্টুরেন্টে দাম দিল মিলিন্দ। ট্যাক্সিতে ওঠার আগে কমলকলি কড়ার করে নিল যে ফেরার ভাড়া সে দেবে। মিলিন্দ চাপাচাপি করল না। ফেরার পুরো ভাড়া তার পকেটে ছিল না। ট্যাক্সিতে মিলিন্দর গা ঘেঁষে বসে কমলকলি বলল, তোমাকে খুব দরকার হবে একদিন। আসবে তো ?

কিছু না বুঝেই মিলিন্দ জবাব দিল, হ্যাঁ।

অন্ধকার ছুটন্ত ট্যাক্সির ভেতরে মিলিন্দর একটা হাত আলতো মুঠোয় ধরে থাকলো কমলকলি।

খবরটা দিয়ে কল্যাণ বলল, শুধু মেয়েটা নয়, গোটা ফ্যামিলিটাই বাজে। ওদের খপ্পর থেকে অতনুকে বাঁচাতে হাব।

অতনুর সঙ্গে একটু কথা বলা দরকার, কিংকর বলল।

লাভ নেই। ওই মেয়েটাকেই বিয়ে করবে অতনু।

কল্যাণের গলায় হতাশা। এক মুহূর্ত চুপ থেকে কল্যাণ বলল, আমি অনেক বুঝিয়েছি অতনুকে। অতনুর এক গোঁ। মেয়েটার কাছ থেকে সে নাকি নিখাদ

ভালোবাসা পেয়েছে।

অনুপস্থিত অতনুকে চাপা গলায় খারাপ একটা গালাগাল দিল কিংকর। তারপর বলল, এখনই অতনুকে একবার ধরা দরকার।

অতনুর বাড়িতে যাবার জন্যে মিলিন্দ, কিংকর, কল্যাণ মাণিকতলা স্ট্রিটের সোজা রাস্তা ধরেছে। বাড়িতেই অতনুকে পাকড়াতে চাইছে তারা।

কিছুদিন ধরে অতনু যে ঘন ঘন প্রেমে পড়ছে, বন্ধুরা এ খবর জানতো। জেনেও অতনুর প্রেম নিয়ে মাথা ঘামায়নি কেউ। প্রেম করা যে অতনুর অভ্যেসে দাঁড়িয়েছে, এবং তার প্রেমে কোনো গুরুত্ব, গভীরতা নেই, বন্ধুদের নিজেই খোলাখুলি সেকথা শুনিয়ে দিয়েছে অতনু। স্বয়ং প্রেমিক যখন কথায়, আচরণে প্রেমসম্পর্ক হালকা করে দেয়, তখন বন্ধুরা গুরুত্ব দেবে কেন? অতনুর প্রেম করাতেও তাই গুরুত্ব দেয় নি কেউ কফিহাউসে, মাসদুই আগে এক সন্ধ্যেতে অতনু বলল, আরাধনাকে ছেড়ে এখন মল্লিকার সঙ্গে প্রেম করছি।

ঠিক এক হপ্তা পরে এক দুপুরে অতনু আবার বলল, মল্লিকার সঙ্গে পটলো না। মেয়েটার ভীষণ টাকার খাঁই। মল্লিকার বান্ধবী গীতশ্রীর সঙ্গে এখন মেশামেশি করছি।

হঠাৎ ডুব মেরেছে অতনু। গত এক মাস তার টিকি প্রায় দেখা যাচ্ছে না। মিলিন্দর কলেজে, রূপান্তর-এর ঘরে, এমন কি, কফিহাউসেও বিশেষ আসছে না সে। কী করে, কোথায় যায়, বন্ধুরা জানে না। কোনো দুপুরে, বা সন্ধ্যেতে ঝড়ের মতো কফিহাউসে এসে গরম কফি ডিশে ঢেলে হুসহুস করে খেয়ে উঠে পড়ে। বন্ধুদের কেউ কিছু জানতে চাইলে মিটমিট করে অতনু হাসে। তার দুচোখের তারায় তখন ঝিকমিক করে উজ্জ্বল বোকামি। দিন সাত আগে সন্ধ্যের মুখে কফি হাউসে এসেছিল অতনু। দোতলার জানলার ধারে টেবিলে মিলিন্দ, কিংকর, কল্যাণের সঙ্গে বসেছিল মলঙ্গা লেনের দীপু। মণীন্দ্র কলেজের ছাত্র সে। বিদ্যাসাগর কলেজের সুজিত, সিটি কলেজের সুহৃদ ছিল টেবিলে। দীপু, সুজিতের চেহারায় বেশ মিল আছে। দু'জনেই লম্বায় ছফুট দু'ইঞ্চি, ওজনও প্রায় সমান। দীপুর ওজন একশো দশ কেজি, সুজিতের একশো বারো। দু'জনেই দশাসই, পঞ্চাশ বাহান্ন ইঞ্চি বুকের ছাতি, হাতের বাইসেপ্স্‌ও দুজনের আঠারো ইঞ্চির কম নয়। চেহারায় মিল যেমন, গরমিলও আছে। দীপু কুচকুচে কালো, নাকের তলায় লম্বা, পাকানো গোঁফ, দু'চোখ ভাটার মতো সবসময়ে ঘুরছে। সুজিতের গায়ের রঙ টকটকে ফর্সা, নিখুঁত কামানো মুখ, কুঁতকুঁতে স্থির চোখ। পাজামা, পাঞ্জাবি পরা সুজিতকে প্রথম নজরে জাপানী পালোয়ান মনে হয়। মারকুটে বলে দীপু, সুজিতের দুর্নাম আছে। আলাদা কলেজে পড়লেও দীপু, সুজিত, সুহৃদ, তিনজনই মিলিন্দর খুব বন্ধু। মিলিন্দর চোখের ইশারায় যে-কোনো কাজে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে যায় তারা। এ তিনজন ছাড়া আরো কয়েকজন বন্ধু ছিল মিলিন্দর টেবিলে। টেবিল ঘিরে বসেছিল কফি হাউসের সবচেয়ে বড়ো আসর। একটা চেয়ার টেনে দীপু, মিলিন্দর মাঝখানে বসে অতনু বলল, এতোদিনে পাকাপাকি একটা প্রেমে পড়লাম।

অতনুর কথায় কেউ কান না দিলেও তাকে খোঁচাতে সুহৃদ প্রশ্ন করল, কোথায়, কার প্রেমে পড়লি ?

কফিতে একটা ছোট চুমুক মেরে, কিংসাইজ্ গোল্ডফ্লেক্ ধরিয়ে অতনু বলল, একটা মেয়ের। ট্রামে।

সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে এক সেকেণ্ড ভেবে অতনু বলল, বলায় ভুল হলো, এক মেয়ে আমার প্রেমে পড়ল। চলন্ত ট্রামের মধ্যে ঘটনাটা ঘটলো।

সন্ধ্যে নামতে জ্বলে উঠলো কফি হাউসের সব আলো। অতনুর দিকে তাকিয়ে গোঁফ মুচড়ে দীপু শব্দ করল, হুম্।

কলঘর থেকে মুখে, চোখে জল দিয়ে এলো কিংকর। দলবাজি, রাজনৈতিক জোচ্চুরি নিয়ে মিলিন্দ, কল্যাণ, সুজিত, সুহৃদ তেড়ে আলোচনা করছিল। অতনুর নতুন প্রেমের খবর কানে গেলেও পাত্তা দিল না তারা! অতনুর প্রেম, কাফ্‌লাভ্ বাছুরের খেলা, রেস্টুরেণ্ট, সিনেমা, ট্যাক্সিতেই শেষ হয়ে যায়। তবু দীপু প্রশ্ন করল, মেয়েটার নাম কী ? থাকে কোথায় ?

নাম তপতী, থাকে সোনাগাছিতে।

অতনুর প্রেমিকার ঠিকানা শুনে চমকে গেল সবাই। অতনু মিটিমিটি হাসছে। মিলিন্দ, কিংকর, কল্যাণ, সুজিতের রাজনৈতিক তর্ক থেমে গেল। সোনাগাছি যে ভদ্রপাড়া নয়, পতিতাপল্লী, সকলে জানে। টেবিল ঘিরে বসে থাকা আটজন যুবক . তাকিয়ে থাকলো অতনুর দিকে।

সবুজ কাচ ঢাকা টেবিলের ওপর ছড়ানো নিজের দুটো লম্বা, লোমশ হাত দীপু দেখছে। খাড়া হয়ে গেছে তার হাতের লোম।

অতনু বলল, আমি শরৎবাবুকে 'ফলো' করছি। শরৎ-রচনা-সমগ্র পড়ে লেখকের শিক্ষা, পতিতারাও যে প্রেমিকা হতে পারে, নিজের জীবন দিয়ে যাচাই করে দেখছি।

দীপুর ভাটার মতো অস্থির চোখ আটকে গেছে কপালে। সুজিতের কুঁতকুঁতে দু'চোখের স্থির মনি ঘুরপাক খাচ্ছে।

অতনু বলল, সোনাগাছিতে থাকলেও বেশ্যা নয় তপতী। যে ক'টা গৃহস্থ ভদ্রপরিবার পাড়ায় আছে, তাদের মধ্যে তপতীদের বাড়িও ধরা হয়। তপতীর বাবা রীতিমতো ভদ্রলোক। তাঁর তিনটে টানা রিকশা আছে। তিন রিকশাচালকের কাছ থেকে তিনি রোজ ত্রিশ টাকা পান। মাসে ন'শো, হাজার টাকা ইনকাম। কম কী ?

ভাবী শ্বশুরের সমৃদ্ধি, সাচ্ছন্দ্যের কাহিনী শোনাতে গিয়ে অতুনু ভুলে গেছে যে, মাসে নশো, হাজার টাকা তার হাতখরচ। ট্যাক্সি, চা, কফি সিগারেটে উড়ে যায় সে টাকা। তপতীর বাবার পারিবারিক, অর্থনৈতিক পরিচয় টেবিলের কারো মনে বিশেষ দাগ কাটলো না। অতনু, দীপুর টুকরো কথা লেনদেনে কান ছিল না মিলিন্দর। সে খুঁটিয়ে দেখছিল অতনুকে। শরৎচন্দ্রের নাম, তাঁর আদর্শ অতনু 'ফলো' করছে শুনে তার সম্পর্কে মিলিন্দর মনে বাড়তি আগ্রহ তৈরী হয়েছে। অপরূপ না হলেও দেখতে খারাপ নয় অতনু। ভালো খায়, ভালো পরে। ছিপছিপে, নিটোল শরীর, মাজা রঙ, দুচোখের মণিতে ঔজ্জ্বল্য, আর বোকামি। একুশের তারুণ্য টলমল করছে

সর্বাঙ্গ জুড়ে। একটা টকটকে লাল রুমাল পকেট থেকে বার কার অতনু মুখ মুছতে, রুমালটা চিনতে পারলো মিলিন্দ। রুমালের ইতিহাস আর কেউ না জানলেও মিলিন্দ জানে। জলন্ধরের সন্ন্যাসীর দেওয়া এ রুমালের কাহিনী সম্ভবত কল্যাণেরও অজানা নয়। পাঁজির বিজ্ঞাপন দেখে জলন্ধরে চিঠি লিখে চার, পাঁচ মাস আগে দু'ডজন লাল রুমাল অতনু আনিয়েছে। প্রতি রুমালের যা দাম পড়েছে, তাতে একটা সিঙ্গল বিছানার চাদর কেনা যায়। একটা লাল রুমাল অতনু দিতে চেয়েছিল মিলিন্দকে। সে নেয়নি। রুমালের গুণ বর্ণনা করে অতনু বলেছিল, কোনো মেয়ের সামনে এই লাল রুমালে মুখ মুছলে, সে নির্ঘাত ঘায়েল হবে। পছন্দসই মেয়েকে বাগাতে এ রুমাল অব্যর্থ। বশীকরণ রুমাল।

কিছুদিন ধরে ট্রামে, বাসে লেডিস্ সিটের সামনে দাঁড়িয়ে লাল রুমালে অতনুকে মুখ মুছতে দেখলেও রহস্যটা মিলিন্দ জানতো না। ক্যাটকেটে রঙ রুমাল রোজ ব্যবহার করতে দেখে অতনুর বাড়িতে বসেই মিলিন্দ একদিন প্রশ্ন করেছিল, তোর আর রুমাল নেই?

এক সেকেণ্ড মিলিন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে আলমারি খুলে দু'ডজন লাল রুমাল বার করে পুরো ইতিহাস বলেছিল অতনু। নিস্তব্ধ দুপুর। তিন পাশে লম্বা, টানা বারান্দা ঘেরা অতনুর বিরাট ঘর। মেঝেতে সাদা, কালো ঝকঝকে পাথর। মিলিন্দ ছাড়া অতনুর ঘরে তখন কেউ ছিল না। অতনু বলল, একুশ বছর বয়স হলো, বুড়ো হতে আর দেরি নেই। এখনও একজন মনের মতো প্রেমিকা পেলাম না।

অতনুর কথা শুনে চুপ করে ছিল মিলিন্দ। নির্জন, বিরাট ঘরের বাতাসে একাকীত্ব, বিষাদ চাপ বেঁধে আছে। সব থেকেও অতনুর যেন কিছু নেই। দোতলার সিঁড়ির মাঝ বরাবর আবছা অন্ধকারে অতনুর অন্ধ, পাগল, মা দু'হাঁটুতে মাথা গুঁজে বসে ছিল। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় অতনুর মাকে আর একটু হলে মাড়িয়ে ফেলতো মিলিন্দ। রাতেও অতনুর মা ঘরে যেতে চায় না। জোর করে ঘরে পাঠালে আবার সিঁড়িতে ফিরে যায়। দিন, রাতের তফাৎ মহিলাটি কীভাবে বোঝে, মিলিন্দ ঠাহর পায় না। বাড়ির তিনতলায় থাকে অতনুর বড়দা আর মেজদা। স্ত্রী, তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে বড়দার ভরপুর সংসার। মেজদা এখনও বিয়ে করে নি। বাড়িতে একমাত্র মেজদার সঙ্গেই সামান্য যোগাযোগ রাখে অতনু। একটা লাল রুমাল মিলিন্দর কোলে ছুঁড়ে দিয়ে অতনু বলেছিল. এটা রাখ্, কাজে লাগবে।

কথাটা বলে মুচকি হেসে চোখ টিপেছিল অতনু। অতনুর ইঙ্গিতে বিদ্যুৎ চমকের মতো কমলকলির মুখ মিলিন্দর মনে পড়ল। রুমালটা সরিয়ে রেখেছিল সে। বন্ধুদের অনেকে যে তুকতাক, কুসংস্কারে বিশ্বাস করে, মিলিন্দ জানে। তাদের যুক্তিবাদী করতে মাঝে মাঝে তর্ক জুড়ে দেয় মিলিন্দ। তর্কে হেরে মিলিন্দর মতামত তারা সাময়িক মেনে নিয়েও আবার ঝেড়ে ফেলে। মিলিন্দ রেগে যায়। কিন্তু বন্ধুদের ছেড়ে চলে আসতে পারে না। বাস, ট্রামে মেয়েদের আসনের সামনে দাঁড়িয়ে শুধু লাল রুমালে মুখ মুছে হাত গুটিয়ে নেয় না অতনু। মুখ মোছার পর ট্রাউজার্সের হিপ পকেট থেকে গোছা গোছা পাঁচ, দশ টাকার চকচকে

নতুন নোট বার করে গুনে, গেঁথে আবার পকেটে ঢুকিয়ে রাখে। গাড়ির সকলে, সব বয়সী মহিলা মুগ্ধ, অবাক চোখে টাকার বাণ্ডিলের দিকে তাকিয়ে থাকে। অল্পবয়সী, বিস্মিত কোনো তরুণীর মুখের ওপর অতনু তখন উজ্জ্বল, বোকা চোখের নজর রাখে। এভাবেই প্রেমিকা জোটে তার।

অতনুর প্রেমিকা ধরার কৌশল অনেক বন্ধুর জানা থাকলেও সোনাগাছির তপতীর কথা শুনে সন্ধ্যের আড্ডায় ছানা কেটে গেল। কথায়, হাসিতে অস্বস্তি, অসঙ্গতি চাপা থাকলো না। কফি খেয়ে অতনু তাড়াতাড়ি কফিহাউস ছেড়ে বেরিয়ে যাবার পর সুজিত বলল. বড়োরকম ফাঁসবে।

অতনুর জন্যে দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ ছড়িয়ে ছিল সকলের মুখে। কথা বাড়ালো না কেউ। তারপর সাতদিন পাত্তা নেই অতনুর।

রূপান্তর-এর ঘরে নতুন নাটকের মহড়া শুরু থেকে অতনু আসছে না। আজও আসেনি। নাটকের ব্যাপারে গাফিলতি কিংকর সহ্য করতে পারে না। মহড়া বন্ধ রেখে মিলিন্দ, কল্যাণকে নিয়ে শেষ বিকেলে অতনুর খোঁজে বেরিয়েছিল কিংকর। অতনুর জন্যে দুশ্চিন্তা মিলিন্দ, কল্যাণেরও কম নয়। সোনাগাছিতে অতনুর প্রেমের ঘটনায় বিশেষ করে ভয় পেয়েছে কল্যাণ। শুকিয়ে গিয়েছিল তার মুখ।

মানিকতলা স্ট্রিট ধরে আজাদ হিন্দ্ বাগের পাশ দিয়ে অতনুর বাড়িতে এলো তিনজন। সদর দরজায় মিলিন্দ, কিংকর দাঁড়াল। কল্যাণ গেল দোতলায় অতনুর খোঁজে। অতনু নেই। তার ঘরে তালা ঝুলছে। কল্যাণের পায়ের শব্দ পেয়ে সিঁড়ির অন্ধকার কোণ থেকে অতনুর অন্ধ, পাগল মা দু'তিনবার প্রশ্ন করল. তনু এলি, তনু এলি ?

কোনো জবাব না দিয়ে কল্যাণ রাস্তায় নেমে এলো।

কী করা যায় ?

কিংকর প্রশ্ন করতে কল্যাণ বলল, তপতীর বাড়ির ঠিকানাটা একবার অতনু বলেছিল আমাকে। সেখানে খোঁজ করা যায়।

ধূসর ছায়া নেমেছে পৃথিবীতে। ছায়ার সঙ্গে ধারলো হচ্ছে শীত। সাদা ফুটকি দেওয়া কালো রঙের টুইডের কোট পরেছে কিংকর। কল্যাণের শরীরে ফুল হাতা সোয়েটার। মিলিন্দর পাজামা, পাঞ্জাবির ওপর রয়েছে সুতির হালকা জহর কোট। অল্প শীত লাগছে তার।

কল্যাণ বলল, তপতীর বাড়িতে যাবার পথও অতনু বলে দিয়েছিল আমাকে।

মনে আছে তোর ?

কিংকর প্রশ্ন করতে কল্যাণ বলল, হ্যাঁ।

আবার হাঁটা শুরু করল তিনজন। সোনাগাছির নাম শুনলেও জায়গাটা কখনও দেখেনি মিলিন্দ। নামের সঙ্গে পরিচয়ের জন্যে জায়গা সম্পর্কে অগাধ কৌতূহল আছে তার। চাপা উত্তেজনা বোধ করছে সে। মুখে কিছু না বললেও মাথার কোষে কোষে ছড়িয়ে পড়ছে গরম রক্তস্রোত। তখনই মনে পড়ল, আজ নবনীতার জন্মদিনে নেমন্তন্ন আছে তার। সন্ধ্যের পর শ্যামপুকুরে নবনীতাদের বাড়িতে

তার যাবার কথা। পরশু, গতকাল, কলেজে জন্মদিনের কথাটা বলে, আজ সকালেও ফোনে তাকে মনে করিয়ে দিয়েছে নবনীতা। সুতরাং যেতেই হবে। নবনীতাকে কথাও দিয়েছে সে। অতনুর খোঁজ করে তারপর যাবে সে। সেন্ট্রাল এ্যাভিনু ধরে হাঁটার সময় কিংকর প্রশ্ন করল, কী ভাবছিস ?

মিলিন্দ বলল, শরৎবাবুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অতনু যদি তপতীকে বিয়ে করে ক্ষতি কি ?

মিলিন্দর কথা শুনে চমকে উঠল কল্যাণ। কিংকর প্রায় দাঁত খিঁচিয়ে বলল, ওসব গল্পে চলে।

এক সেকেন্ড চুপ করে থেকে কিংকর ফের বলল, শরৎ চাটুজ্জের উপদেশ মেনে নিলে বিয়ে করার কী দরকার! খুশিমতো এ পাড়ায় এসে পয়সা দিয়ে চুটিয়ে প্রেম করা যায়। সে রকম সতী পতিতা হলে মিনি মাগনা প্রেম বিলোবে।

আরো কিছু বাঁকা, আধা অশ্লীল কথা কিংকর বললেও নিজের যুক্তিতে অটল মিলিন্দ বলল, মেয়েটা যে খারাপ, প্রমাণ পাইনি আমরা। তাছাড়া একজন পা ফসকে, একবার খারাপ কিছু করলে, সারাজীবনের মতো সে খারাপ হয়ে যাবে, সৎ ভালো হতে পারবে না, এমন কোনও কথা আছে নাকি ? মানুষ ভুল করে, ভুল শুধরে আবার সঠিক পথে হেঁটে যায়। সুযোগ পেলে একজন বদ লোক, বিশেষ করে একজন মেয়ে ভালো হয়ে যেতে পারে।

আমি বিশ্বাস করি না, কিংকর বলল, পিয়ারি বাই ফাই আজকাল আর দেখা যায় না। কোনোদিন ছিল কিনা সন্দেহ আছে।

কিন্তু মেয়েটা যে বেশ্যা, তুই জানলি কি করে ?

মিলিন্দর প্রশ্ন শুনে কল্যাণ বলল, সে সবকিছু খোঁজ করতেই তো আমরা যাচ্ছি।

কেউ কথা বলছে না। মিলিন্দ ভাবল, তপতীকে একবার দেখে তার সম্পর্কে কতোটা জানা যাবে ? মুখ দেখে, দু'পাঁচ মিনিট কথা বলে একজন মানুষকে খুব অল্পই বোঝা যায়। মানুষ সম্পর্কে নির্ভুল ধারণা করতে এই জানা, বোঝা বিশেষ কাজে লাগে না। বরং ভুল ধারণা তৈরি হয়। তাছাড়া তপতী যদি খারাপ মেয়ে হয়, তার চরিত্রে যদি কখনও কালি লেগে থাকে, তাহলে সারাজীবনের মতো কেন বাতিল হয়ে যাবে সে ? খারাপ হবার অনেক রাস্তা আছে। ভালো হবার রাস্তা কি একটাও খোলা নেই ? সে রকম হলে ম্যানুষের মতো অমানবিক অসামাজিক জীব, পৃথিবীতে দ্বিতীয় নেই।

অতনুর ওপর হঠাৎ শ্রদ্ধা বেড়ে গেল মিলিন্দর। অতনু মহৎ, দুঃসাহসী, বিরাট ঝুঁকি নিয়েছে সে। সাহায্যের জন্য তার পাশে দাঁড়াবার প্রবল তাগিদ অনুভব করল মিলিন্দ। সেণ্ট্রাল এ্যাভিনুর দুপাশে আলো জ্বলেছে। বিডন স্ট্রিটের মুখে ল্যাম্পপোস্টের মাথায় জমাট কুয়াশা। আরো খানিক এগিয়ে বাঁ দিকের রাস্তায় একটা বাড়ির দেওয়ালে ইংরেজীতে লেখা দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রিট, দেখিয়ে কল্যাণ বলল, এখান দিয়ে ঢুকতে হবে।

লম্বা রাস্তায় কয়েক কদম গেলে একটা তেমাথা। আলোয় ঝলমল করছে দ্ুপাশের পান, মিষ্টির দোকান। বেলুন, রাংতায় কিছু দোকান সাজানো। এলাকা জুড়ে মেলার আবহাওয়া। পানদোকানের উল্টোদিকে রাস্তার ওপর ফুচকা, ঘুগনি নিয়ে বসেছে ফেরিওয়ালারা। তাদের পাশে বেল, রজনীগন্ধা নিয়ে তিন, চারজন। ভিড়, জটলা, কথার শব্দে মিলিন্দর মনে হলো, এখানে সবে সকাল শুরু হয়েছে। পানের দোকান পেরোতেই দু'পাশের বাড়ির দরজায়, কোনও দরজায় দু'চারজন, কোথাও এক ঝাঁক মেয়ে আবছা আলোয় দাঁড়িয়ে আছে। কেউ কেউ বেশ সুন্দরী। তাদের দাঁড়াবার ঋজু ভঙ্গিতে সাবলীল ব্যস্ততা, যেন এখনই অফিস, কাছারি, কলেজ, আদালতে যাওয়ার জন্যে বাসস্টপে ছুটতে হবে তাদের। গুড়গুড় করছে মিলিন্দর বুক। মিলিন্দ, কল্যাণ পাশাপাশি। অল্প পেছনে কিংকর। তিনজনেই বুঝছে হাঁটার গতি বেড়ে গেছে। তাদের দেখে দু'একজন মেয়ে নিচু গলায় কথা বলছে। মাঝবয়সী তাগড়া চেহারা এক ভদ্রলোক, একজন মেয়ের সঙ্গে কথা বলছিল। সে হঠাৎ মিলিন্দকে বলল, তোমার বাবাকে বলে দেবো।

শুনে খিলখিল করে হেসে উঠল অনেকগুলো মেয়েলি গলা। রাগে, অপমানে ঝাঁঝা মাথা, মিলিন্দর ইচ্ছে হলো লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে। অনেক কষ্টে সামলে নিল নিজেকে। রাগ, ঘৃণার সঙ্গে বিপন্নতা ছড়িয়ে পড়ছে তার মনে। সমাজ, সংসারে মেয়েদের অবস্থান, ভূমিকা নিয়ে মধুর, সুন্দর কথা, অসংখ্য ব্যাখ্যা, কীর্তন, প্রশস্তি সব যেন অলীক, মিথ্যে। মেয়েদের আসল চেহারা, সামাজিক পরিচয়, সোনাগাছির পতিতা-পল্লীতে এসে দেখতে পেল মিলিন্দ। মেয়েদের সম্পর্কে তার আদর্শবাদী, নীতিবাগীশ ধারণা অদৃশ্য এক আখ পেশাই কলে মড়মড় শব্দে ভেঙে যাচ্ছে। মাড়াই কলের শব্দ শুনলো সে। তার প্রশ্ন জাগলো, মা, বোনদের সঙ্গে একই সমাজে এতো দেহোপজীবিনী থাকে কী করে? এদের জন্ম, পারিবারিক পরিচয় কী? কোথা থেকে এই বেশ্যাপাড়ায় জড়ো হয়েছে এরা?

দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রিট ধরে হাঁটতে হাঁটতে এক নিষ্ঠুর সত্যের মুখোমুখি হলো সে। পৃথিবীর যে-কোনো পণ্যের চেয়ে মেয়েরা সস্তা। পকেটে পয়সা থাকলে শয্যাসঙ্গিনীর অভাব নেই। মিলিন্দ যে সমাজে থাকে, সেই ভদ্র, মার্জিত পরিবেশে মেয়েদের গায়ে হাত দেওয়া দূরের কথা, তাদের দিকে তাকানোও অপরাধ, অন্যায়। সেই সমাজের গায়েই নারীমাংসের এক বাফার জোন, মুক্তাঞ্চল। খোলা বাজারে ফলাও কারবার চলছে। যা সহজে পাওয়া যায়, তাকে আগলে রাখার জন্যে কিছু লোকের ঘুম নেই। তাত্ত্বিক মহিমার দেওয়াল তুলে মেয়েদের জন্যে আলাদা একটা খাঁচা তারা তৈরি করে দিয়েছে।

বিপন্নতা, বিভ্রম, কৌতূহলে রাস্তার দু'পাশে দাঁড়ানো মেয়েদের চোরা নজরে দেখছে মিলিন্দ। দেখার ইচ্ছের সঙ্গে তার মনে জাগছে সংকোচ, লজ্জা। অজানা অপরাধবোধে তিন জন, কেউ কারো দিকে চোখ তুলতে পারছে না। মিলিন্দর মনে হলো, তার জন্যেই এতো মেয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। তার ক্ষিধে, দাবি মেটাতেই বসেছে এই মেয়েমানুষের হাট। পতিতাবৃত্তি চালু করার জন্যে সে দায়ী। আবছা

আলোয় দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েগুলো নিঃশব্দে আসামীর কাঠগড়ায় তুলে দিয়েছে তাকে। মেয়ে দেখার আগ্রহ চুপসে গেল তার।

বড়ো রাস্তা ছেড়ে প্রথমে ডান দিকে তারপর বাঁয়ে ঘুরে একটা সরু গলির ভেতরে তপতীর বাবা পতিত বিশ্বাসের সাত বাই তিনের ডি বাড়িটা পাওয়া গেল। পুরোনো দোতলা বাড়ির পলেস্তারা খসে ইট বেরিয়ে পড়েছে। বাড়িটার সামনে ল্যাম্পপোস্টে বাতি নেই। জায়গাটা অন্ধকার। গলির মাথা থেকে সামান্য আলো চুঁইয়ে পড়ছে এদিকে। বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকালো তিনজন। আগে কে অতনুকে ডাকবে, ঠিক করতে পারছে না। রাস্তার দিকে দোতলার ঘরের একপাল্লা খোলা অন্ধকার। হাঁ করা সদর দরজার মুখও অন্ধকারে ডুবে আছে। কোথাও আলো নেই। এই জমাট অন্ধকারে ভুতুড়ে, জীর্ণ বাড়িটায় অচেনা কেউ ঢুকতে সাহস পাবে না। ফেত্তা দেওয়া ধুতি লুঙ্গির মতো পরে, গায়ে চাদর জড়িয়ে গলির মাথায় চোরের মতো ঘুরঘুর করছে তিন, চার জন লোক। আনকোরা অচেনা তিন তরুণকে দেখছে তারা। অতনুর নাম ধরে ডাকতে চিমড়ে শরীর একজন লোক এসে প্রশ্ন করল, আপনারা কি পতিত বিশ্বেসের বাড়ি খুঁজছেন ?

হ্যাঁ, মিলিন্দ বলল।

সোজা দোতলায় চলে যান।

খাটো পাজামা পরা একজন লোক এবার এগিয়ে এসে বলল, মনে হয়, বাড়িতে কেউ নেই। পরশু কি তরশু পতিতের মেজো মেয়ের বিয়ে। বরানগর, না কাশীপুরে বিয়ে বাড়ি ভাড়া নিয়ে আজ সকালেই চলে গেছে তারা।

লুঙি পরা লোকটা প্রশ্ন করল, মেজো কোনটা ? তোতা ?

হ্যাঁ, সেই মুটকিটা।

বড়োবাজারের এক ভুজাওয়ালার ছেলের সঙ্গে গতবছর তোতা ভেগে ছিল না ?

ভুজাওলা নয়, লোহাওলার ছেলে। তোতার পেট করে দিয়ে পালিয়েছিল সে। লিলুয়ার লোঙ্গরখানায় ছ'মাস কাটিয়ে এই তো কিছুদিন আগে বাড়ি ফিরেছে তোতা।

ফিরেই একটা নতুন মুরগি ধরে ফেলেছে।

কোন বাপ-মার মেয়ে দেখতে হবে তো !

দু'জন অচেনা লোকের কথাবার্তা অবাক হয়ে শুনছিল মিলিন্দ। কিংকর বোবা। মুখ শুকিয়ে গেছে কল্যাণের।

দোতলার আধখোলা অন্ধকার জানলা থেকে ছড়ছড় করে একগাদা জল কিংকরের মাথায় পড়তে লাফিয়ে সরে গেল সে। তবুও তার মাথা, কোট ভিজে একশা। সদর দরজার মুখে দাঁড়িয়ে থাকার জন্যে শীতের সন্ধ্যেতে জলে ভেজা থেকে রেহাই পেয়েছে মিলিন্দ। ঠাণ্ডায় কিংকরকে কাঁপতে দেখে অচেনা লোক দু'জন খ্যাকখ্যাক করে হাসছে। তাদের হাসি, জল পড়ার শব্দ মিশে গেল। চোখ তুলে, আবছা আলোয় গরাদহীন জানলার পাশ থেকে লালচে, মাটির একটা কলসি সরে যেতে

দেখল মিলিন্দ। কিংকর যতো রেগেছে, তার চেয়ে বেশি অপমানে দাঁতে দাঁত টিপে কয়েক শেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থাকল।

হেনস্তার একশেষ হয়ে তিনজন আবার এসে দাঁড়ালো সেণ্ট্রাল এ্যাভিনুতে। তিনজনেই চুপ, কথা হারিয়ে গেছে তাদের। বিডন স্ট্রিটে এসে কল্যাণ বলল, অতনু বোধহয় ওখানে ছিল না।

ছিল, গম্ভীর গলায় জোরের সঙ্গে কিংকর বলল।

জন্মদিনের সন্ধ্যেতে বাড়ির দরজায় মিলিন্দকে দেখে সংযত, গম্ভীর নবনীতা বিহ্বল হয়ে গেল। বলল, তুমি আসবে, আমি ভাবতে পারি নি।

কল্পনাশক্তি একটু বাড়াও, মুচকি হেসে বলল মিলিন্দ।

সুযোগ পাচ্ছি কোথায় ?

যার বাড়ার, সুযোগ ছাড়াই বাড়ে।

কিছু বলতে যাচ্ছিল নবনীতা। তার আগেই নবনীতার সেজোবৌদি এসে গেল। মিলিন্দর দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে সেজোবৌদি বলল, এখনই আপনার বাড়িতে গাড়ি পাঠাবার কথা হচ্ছিল।

মিলিন্দ কথা বলল না। সেজোবৌদির বয়স নবনীতার চেয়ে দু'এক বছরের বেশি নয়। সমবয়সীও বলা যায়। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় নবনীতার ঘরে যাবার সময়ে তার বয়স সম্পর্কে সেজোবৌদি এমন সব তথ্য দিতে শুরু করল, যাতে এই জন্মদিনে নবনীতার বয়স কতো সে হিসেব গুলিয়ে ফেললো মিলিন্দ। অবশ্য বয়স নিয়ে মাথা ঘামায় না সে। মাথা ঘামাবার বিষয় মনেও করেনি কখনো। আজও করল না। আগে দু'বার এ বাড়িতে এসে প্রথমবার একতলার ড্রইংরুমে মিলিন্দ বসেছে। দোতলায় নবনীতার শোবার ঘরে আজ প্রথম ঢুকলো। গত বছর ছাত্র-সংসদের নির্বাচনের সময় এ বাড়িতে দ্বিতীয় দফা এসেছিল সে। বাড়িতে না ঢুকে সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নবনীতার সঙ্গে কথা বলেছিল। ড্রইংরুমে বসার জন্যে নবনীতা বিস্তর ঝুলোঝুলি করলেও কাজের কথাগুলো সদরে দাঁড়িয়েই সেরে নিয়েছিল মিলিন্দ। কাজের কথা মানে, চন্দনের জন্য ক্লাসের অন্তত দশটা মেয়ের ভোট জোগাড়ের দায়িত্ব নিতে হবে নবনীতাকে। চন্দন, নচিকেতা দাঁড়িয়েছিল মিলিন্দর পেছনে। নবনীতার বাড়িতে ঢোকার জন্যে নচিকেতা ছুঁকছুঁক করলেও চন্দন বলেছিল, এখনও অনেক জায়গায় যেতে হবে আমাদের।

এক বছর পরে দোতলায় পরিপাটি সাজানো নবনীতার ঘরে ঢুকে, তারা যে যথেষ্ট বড়োলোক, এক নজরে বুঝে গেল মিলিন্দ। পরিপাটি থাকার খরচ কম নয়।

অবশ্য প্রথমবার নবনীতাদের ড্রইংরুমে বসেও ঘরের সাইজ, ঝকঝকে পালিশ মেহগনি কাঠের সাবেকী আসবাব, দেওয়ালে পেতলের চেন বাঁধা অয়েল পেণ্টিং,

ঝাড়লণ্ঠন, ঘরের বাতাসে লজেন্স আর গ্রিজের মিশেল গন্ধে, তারা যে বিপুল ধনী, টের পেতে মিলিন্দর অসুবিধে হয়নি।

দোতলায় নবনীতার ঘরে কয়েকজন কিশোরী বেদম গল্প, হাসাহাসি করছিল। মিলিন্দ ঢুকতে চুপ করে গেল তারা! একপলক মিলিন্দকে দেখে দুড়দাড় দৌড় মারলো। তাদের মুখ, চাহনি দেখে মিলিন্দর মনে হলো, যতো জোরেই তারা দৌড় লাগাক, বেশিদূর যাবে না। গেলেও ঘরের কাছাকাছি আবার ফিরে আসবে।

নবনীতার ঘরের মভ্ রঙ প্ল্যাস্টিক ডিসটেম্পার দেওয়ালে বেলফুলের মালা জড়ানো, চন্দনের নক্সা আঁকা দুটো ছবি, পাশাপাশি ঝুলছে। নবনীতা বলল, আমার বাবা, মা।

নবনীতার ছেলেবেলায় তার বাবা, মা মারা গেছে, মিলিন্দ জানে। নবনীতার ঘরটা খুঁটিয়ে দেখছে মিলিন্দ। বেশ বড়োসড়ো ঘর। দক্ষিণে রাস্তার দিকে দুটো ঢাউস জানলা। লাল, নীল, সবুজ কাচ লাগানো শার্সি। পুবেও একটা জানলা আছে। ফোমের গদি, সিঙ্গল খাটের বিছানায় দামী বেড্কভার পাতা। পুব দিকের দেওয়ালে নবনীতার পড়ার টেবিল। গদি আঁটা বসার ঘূর্ণি চেয়ারটা দেখে হিংসে হলো মিলিন্দর। পড়ার টেবিলের পাশে কাচের আলমারিতে নবনীতার পড়ার বই, কিছু সৌখিন পুতুল। কাচের আলমারির মুখোমুখি পশ্চিমের দেওয়ালে স্টিলের দামী আলমারিতে নিশ্চয় নবনীতার জামা, কাপড়, গয়না থাকে। স্টিল আলমারির পাশে ডিমের মতো চেহারা একটা ড্রেসিং টেবিল, গদি মোড়া টুল। ড্রেসিং-টেবিলের ওপরে জ্বলছে একজোড়া টিউব লাইট্। ড্রেসিং-টেবিলের আয়নায় লেগে আলোর তেজ বেড়ে গেছে। বিছানার দুপাশে শান্তিনিকেতনী নক্সা আঁকা দু'জোড়া মোড়া। এতো জিনিস থাকলেও ঘরটা ছিমছাম, অঢেল জায়গা খালি রয়েছে। ফুল আর ধূপের সুবাসে ভারী হয়ে আছে ঘরের বাতাস। নবনীতার ঘরে ঢুকতেই সোনা-গাছির সেই অন্ধকার বাড়ি, দোতলা থেকে মাথার ওপর এক কলসি ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেবার ঘটনা, আবছা রাস্তায় রঙ করা, সাজানো মুখের সারি, মিলিন্দর মনে পড়ল। একটু অন্যমনস্ক হয়ে সে একটা সোফায় বসতে যেতে সেজবৌদি বলল, ওখানে নয়, বিছানায় বসুন।

বিছানার বদলে নবনীতার গদী আঁটা ঘূর্নি চেয়ারে মিলিন্দ বসলো। বিছানার পাশাপাশি বসে নবনীতা, সেজবৌদি দেখছে মিলিন্দকে।

খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে আপনাকে।

ক্লান্তি লাগলেও সেজবৌদির কথায় হাসলো মিলিন্দ।

আপনি আসেন না কেন আমাদের বাড়ি?

সেজবৌদি প্রশ্ন করতে মিলিন্দ বলল, সময় পাই না।

কী এমন রাজকাজ?

সমবয়সী বৌদির ঠাট্টার উত্তরে মিলিন্দ হেসে বলল, আড্ডা।

বৌদিও হাসল। তারপর নবনীতাকে প্রশ্ন করল, কী খাওয়াবে বন্ধুকে?

বন্ধু যা খাবে, নবনীতা বলল।

স্রেফ্ এক কাপ চা, মিলিন্দ বলল।

এখনি আনবো ?

নবনীতার প্রশ্ন শুনে মিলিন্দ বলল, আনলে ভালো হয়।

নবনীতা ঘরের বাইরে যেতেই, তাকে যে অনেকে ঘিরে ধরেছে, বুঝতে পারলো মিলিন্দ। কেউ একজন প্রশ্ন করল, এ কি সেই ?

নবনীতা কী জবাব দিল, শুনতে পেল না মিলিন্দ। ঢলঢলে লাবণ্য, টিকোলো নাক, পাতলা ঠোঁট, খোঁপায় বেলকুঁড়ির মালা, দুচোখে কৌতুক, হাসি নিয়ে তেইশ, চব্বিশ বছরের সেজবৌদি তাকিয়ে আছে মিলিন্দর দিকে। অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বসলো মিলিন্দ।

কোথা থেকে আসছেন ?

সেজবৌদির প্রশ্নের কী জবাব, মিলিন্দ ভেবে পেল না। আমতা আমতা করে বলল, কাছাকাছি একটা জায়গায় গিয়েছিলাম।

কথা বদলে মিলিন্দর বাড়ি, বাবা, মা, ভাই বোনদের খবর নিল বৌদি। প্রশ্ন করল, লেখাপড়া শেষ হলে কী করবেন ?

ভাবি নি, মিলিন্দ বলল।

দরজার পর্দা অল্প ফাঁক করে কেউ দেখলো মিলিন্দকে। নবনীতার জন্মদিনে একেবারে খালি হাতে এসে বিব্রত বোধ করছে সে। একগোছা গোলাপ অন্তত আনা উচিত ছিল। সেজবৌদি সামনে বসে থাকায় মিলিন্দর অশান্তি আরো বেশি হচ্ছে। সেজবৌদির শরীর থেকে হালকা সুগন্ধ এসে মিলিন্দর নাকে লাগছে। বৌদির রূপ, সুগন্ধের প্রভাবে কথা বলতে পারছে না মিলিন্দ। বৌদি বলল, আমার ননদটি কিন্তু খুব ভালো মেয়ে। অল্প বয়সে বেচারী বাবা মাকে হারিয়েছে। তাই একটু চাপা স্বভাব। পাঁচ দাদার একমাত্র বোন, বাড়ির একমাত্র মেয়ে আপনার বন্ধুটি সংসারের সকলের খুব আদরের। তবে আদরের চোটে মাথা খারাপ হয় নি ওর। নীতা নিজেও খুব বড়োলোক। আমার শ্বশুরমশাই মারা যাবার সময় মেয়ের বিয়ের সব ব্যবস্থা করে রেখে গেছেন। সত্তর হাজার টাকার ফিক্সড্ ডিপোজিট্, পঞ্চাশ ভরি সোনার গয়না নীতার নামে ব্যাঙ্কে রাখা আছে। লেক রোডে একটা দোতলা বাড়িও আছে ওর নামে। বাড়ির একতলায় ভাড়াটে আছে, দোতলা খালি। বিয়ের পর নীতার নতুন সংসার পাতার জন্যেই খালি রাখা আছে ফ্ল্যাটটা।

এক সেকেণ্ড চুপ থেকে সেজবৌদি বলল, এতো কথা বাইরের কেউ জানে না। নীতার স্বার্থেই এসব খবর আমরা পাঁচকান করতে চাই না। আপনাকে বলা যায়।

মিলিন্দর মুখের দিকে আলগা চোখে তাকিয়ে আছে সেজবৌদি। নবনীতার এতো খবর সেজবৌদি কেন শোনাচ্ছে, ভেবে পেল না মিলিন্দ। টাকাকড়ি, সোনাদানা, বাড়িঘর, ফ্ল্যাটের গল্প শুনতে আগ্রহ বোধ করে না সে। শুনে বিরক্ত হয়। রোজ এক টাকা পকেট খরচ বিকেল ফুরোবার আগে শেষ হয়ে গেলে মিলিন্দ অসহায় বোধ করে, কষ্ট পায়, লক্ষ লক্ষ টাকার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু, ওই পর্যন্ত। সারারাত

ঘুমিয়ে সকালে জেগে ওঠার পর ভোরের আকাশ, ফুরফুরে বাতাস, সব অভাব ভুলিয়ে দেয় তাকে। পৃথিবী, মানুষ, ঘটনাস্রোত এমন উত্তেজক, আকর্ষণীয়, যে টাকা এবং টাকাওলা লোকদের সম্পর্কে কোনো উৎসাহ বোধ করে না সে। বরং ঘৃণা বোধ করে। বাড়তি টাকা যে জোচ্চুরি, যারা বানায় তারা জোচ্চোর, এমন এক বদ্ধমূল ধারণায় সামাজিক, আর্থিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয় তার মন। টাকাপয়সা, সম্পত্তি নিয়ে বন্ধুরা বেশি আলোচনা করলেও মিলিন্দ ক্ষেপে ওঠে। তাদের জোর ধমক লাগিয়ে প্রশ্ন করে, বলতো কে বলেছিল, ওয়েল্‌থ্‌ ইজ্‌ থেফ্‌ট্‌?

প্রশ্নের জবাব জানা না থাকায় টাকার আলোচনা থেমে যায়।

কিন্তু সুন্দরী সেজবৌদিকে এ প্রশ্ন করা সম্ভব নয়। তাড়াতাড়ি এখান থেকে কেটে পড়ার ফিকির খুঁজতে থাকে সে।

নীতা বিয়ে পাশ করলেই তার বিয়ে লাগিয়ে দেবো, বৌদি বলল, আরো লেখা-পড়ার ইচ্ছে থাকলে বিয়ের পর করবে।

সেজবৌদির কথা নিছক তথ্য হিসাবেই শুনে যাচ্ছে মিলিন্দ। নীরস তথ্যে আগ্রহ পাচ্ছে না। যে নীতাকে নিয়ে এতো আলোচনা, চা আনতে গিয়ে সে একদম বেপাত্তা। এক কাপ চা বানাতে পনেরো মিনিট লাগার কথা নয়। রান্নাঘরে স্টোভ জ্বালার দেশলাই ফুরিয়ে গেছে বোধহয়।

মিলিন্দর হাতঘড়িতে রাত আটটা। জানলার বাইরে ট্রামের ঢংঢং ঘণ্টাধ্বনি। একটা লম্বা স্টিলের ট্রেতে কাচের দুটো বড়ো প্লেট। একটায় বিশাল ফিশফ্রাই, কামানের গোলার মতো মাংসর চপ, দুটো সিঙাড়া, অন্য প্লেটে দুটো রাজভোগ, একজোড়া আইসক্রিম সন্দেশ সাজিয়ে ঘরে ঢুকলো নবনীতা। তার পেছনে বছর চল্লিশ বয়স, গিন্নিবান্নি চেহারার এক মহিলা। তাকে দেখিয়ে নবনীতা বলল, আমার বড়োবৌদি।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে মিলিন্দ বলল, বসুন।

প্রণাম করা উচিত জেনেও তার রুচিতে বাধলো। কাউকে সে চট করে প্রণাম করতে পারে না। বড়োবৌদি এক নজরে মিলিন্দর বুকের তলা পর্যন্ত দেখে নিয়ে হাসিমুখে বলল, আমার যে ভাই অনেক কাজ! তুমি কিন্তু রাতে খেয়ে যাবে। খেতে বসে গল্প হবে।

বড়োবৌদির দুহাতে আট গাছা করে মোট ষোলটা সোনার চুড়ি। বেশ মোটা। দেখে বোঝা যায় চুড়িগুলোর ওজনও কম নয়। সোনার সঙ্গে লোহা, পলা, শাঁখা সবই আছে। কপালে চওড়া সিঁদুর, দুপায়ে টুকটুকে লাল আলতা। মাথার ঘোমটা ঠিকঠাক আছে কিনা, ভদ্রমহিলা বারবার হাত দিয়ে দেখে নিচ্ছে। মিলিন্দকে বড়ো-বৌদি বলল, তুমি খেতে শুরু করো। চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

বড়োজাকে সেজবৌদি বলল, দিদি আপনি বসুন। আমি চা নিয়ে আসছি।

বড়ো বৌদি বসলো না। দুই জা একসঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

খাবারের পরিমাণ দেখে আঁতকে উঠেছে মিলিন্দ। সে বলল, এ্যাতো কে খাবে?

আবছা হেসে নবনীতা বলল, যা পারো খাও।

এমনিতে সাদামাটা সাজ পোশাক করলেও আজ একটু বেশী সেজেছে নবনীতা। সাধারণ পোশাকে তাকে সুন্দর দেখায়। আজ আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। জরির কারুকাজ করা হালকা সবুজ বেনারসী শাড়ি, কপালে কুঙ্কুমের ছোট্ট টিপ, দুচোখে ঘন সরু কাজল, রূপ ফেটে পড়ছে নবনীতার। তাকে দেখে হঠাৎ সোনাগাছির সুসজ্জিত মেয়েদের মুখ, অন্ধকার, জীর্ণ একটা দোতলা বাড়ি মিলিন্দর চোখে ভেসে উঠলো। নবনীতার নতুন শাড়ি থেকে খসখস শব্দ হচ্ছে। তার দিকে আর তাকাতে সাহস পেল না মিলিন্দ। তার মনে হলো সন্ধ্যের পর সময় আর এগোয় নি, এক জায়গায় স্থির দাঁড়িয়ে আছে। হাতে আধখানা ফিশফ্রাই, কিছু মুখে, মিলিন্দ চিবিয়ে খাচ্ছে, চিবিয়ে চিবিয়ে চোয়াল, দাঁত, মুখ ব্যথায় টনটন করছে, গলা দিয়ে চিবোনো খাবার নামছে না। মিলিন্দর মনে হলো, এখনই বমি হবে তার।

নবনীতা প্রশ্ন করল, কী হয়েছে তোমার ?

আধখানা ফিশফ্রাই প্লেটে রেখে মিলিন্দ বলল, কিছু নয়। খেতে ইচ্ছে করছে না।

নবনীতা কিছু ভাবছে। হঠাৎ সে প্রশ্ন করল, কমলকলি কে ?

আমার এক বান্ধবী, মিলিন্দ বলল।

জিভের ডগায় আরো অনেক প্রশ্ন নিয়ে চুপ করে গেল নবনীতা। তার মুখে কমলকলির নাম শুনে মিলিন্দর মনে পড়লো, সাতদিন কমলকলির সঙ্গে দেখা হয়নি।

কমলকলির সঙ্গে একবার দেখা করার জন্যে অস্থির হলো সে। সোনাগাছির মেয়েদের সঙ্গে চেহারায়, পোশাকে কমলকলি, নবনীতার মিল থাকলেও কোথায় যেন তারা একটু আলাদা। সেই স্বাতন্ত্র্যটুকু জানতেই কমলকলির সঙ্গে একবার দেখা করতে ব্যাকুল হলো মিলিন্দ। হাতে চায়ের পেয়ালা, পাশে বছর তিনের এক নাদুস-নুদুস শিশু, ছেলে নিয়ে ঘরে ঢুকলো সেজবৌদি। এ ঘরে আসার আগে সেজবৌদি চুলে চিরুনি, মুখে পাউডার বুলিয়েছে। সেজবৌদি বলল, সব যে পড়ে রইল!

পারছি না, কাতর গলায় জানালো মিলিন্দ।

কেন ?

গা গুলোচ্ছে।

বাইরে কী খেয়েছেন।

কিছু নয়।

তবু ?

নবীনতা, মিলিন্দর দিকে এক লহমা অবাক চোখে তাকিয়ে সেজবৌদি চুপ করে গেল।

তাড়াতাড়ি চা শেষ করে মিলিন্দ বলল, আমি উঠবো।

শরীর খারাপ ?

প্রশ্নটা করে সেজবৌদি বলল, শরীর খারাপ লাগলে আমাদের গাড়ি পৌঁছে দেবে আপনাকে।

হেসে মিলিন্দ বলল, দরকার নেই। সেরকম কিছু নয়।

কথা না বাড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো মিলিন্দ। এক মিনিটে ট্রাম রাস্তায় পৌঁছে গেল সে। বাইরে বেশ ঠাণ্ডা। রাস্তার মোড়ে ধোঁয়াটে কুয়াশা। সাড়ে আটটা বেজে গেছে। এ সময়ে কমলকলির বাড়িতে যাওয়া অশোভন মনে হলেও, গেলে কেমন হয়, মিলিন্দ ভাবলো। যাওয়ার তাগিদ থাকলেও দ্বিধা হলো তার। কিন্তু এখনই বাড়ি ফিরতে সে নারাজ। আর কোথায় যাওয়া যায়? সোনাগাছি?

সেই রহস্যময় দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রিট, চারপাশের গলিঘুঁজি, রঙকরা মুখ, চোখে সুর্মা, কাজল একঝাঁক সুসজ্জিত মেয়ে প্রবলভাবে টানছে মিলিন্দকে। অসহ্য, অদম্য তাপ শরীরের মধ্যে অনুভব করল সে। এতো সস্তায়, সহজে হাতের কাছে একদঙ্গল মেয়েকে পেয়ে তাদের একজনকে, অথবা সকলকে চেখে পরখ করতে চায় সে। শহরের মধ্যে এমন এক মোহিনী কল্পতরুর খোঁজ পেয়ে তার শরীরে, মনে রোমাঞ্চ জাগে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, কাজটা কি ঠিক হবে?

কাঁটার মতো অসংখ্য প্রশ্ন, সংশয়, সংকটে, তল, তীরবিহীন মিলিন্দ দিশাহারা বোধ করল। সোনাগাছির দেহোপজীবিনীদের সঙ্গে নানা মেয়ের, এমনকি, মা, পিসি, মুন্নির মুখের মিল পেয়ে আতঙ্কে চলন্ত ট্রামে লাফিয়ে উঠলো সে। আজ আর কোথাও, কমলকলির বাড়িও যাবে না। এখনই বাড়ি ফিরে নিজের বিছানায় শুয়ে নতুন কেনা একটা বই পড়বে। বইটি হলো ফ্রেডরিক্ এঙ্গেলস-এর, ওরিজিন্ অব দ্য ফ্যামিলি, প্রাইভেট্ প্রপার্টি এ্যান্ড্ স্টেট্।

সকাল আটটা বাজে নি। অতনুদের বাড়ির গলির মুখে তার সঙ্গে মিলিন্দ, কিংকর, কল্যাণের দেখা হয়ে গেল। মাঘের শিশিরভেজা কনকনে ঠাণ্ডা এই সকালে অতনুর স্নান হয়ে গেছে। পরিপাটি আঁচড়ানো চুল, দাঁড়ি কামানো ঝকঝকে মুখ, হাতে চামড়ার সুটকেস্, শরীরে সাদা, হলুদ উলে বোনা নতুন, দামী কার্ডিগান, কোথাও যাচ্ছে অতনু। ঘনিষ্ঠ তিন বন্ধুর মুখোমুখি হয়েও সামান্য উত্তেজনা দেখালো না সে। গোড়াতেই বলল, কাল নিউমার্কেট থেকে এই কার্ডিগানটা দেড়শো টাকায় কিনলাম। তাইওয়ানে তৈরি। কেমন হয়েছে রে?

কেউ কিছু বলার আগে কিংকর প্রশ্ন করল, সাতসকালে সেজেগুজে চললি কোথায়?

বিয়ে করতে।

অবলীলায় জবাব দিয়ে অতনু বলল, তোরা আসায় ভালো হয়েছে। পরশু বরযাত্রী যেতে হবে তোদের তিনজনকে। কাল বাদে পরশু।

কিংকর,কল্যাণে একবার চোখাচোখি হলো। মিলিন্দ চুপ। গত সন্ধ্যের অভিজ্ঞতা, সেই রহস্যময় এলাকা, দিন শেষ হলে যেখানে সকাল শুরু, একটা অন্ধকার সরু গলিতে সাত বাই তিনের ডি'র ঝরঝরে দোতলা বাড়ি, অচেনা কিছু লোকের

কথাবার্তা, তপতী, মুটকি তোতার কাহিনী, সব মনে পড়ছে মিলিন্দর। গলি ছেড়ে রাস্তায় এসে একটা ট্যাক্সি ধরে বন্ধুদের অতনু বলল, ওঠ্। আগে যাবো শ্বশুর-বাড়ি। সেখান থেকে বরানগরে বিয়ে বাড়িতে। গতকাল থেকে ভাড়া নিয়েছি বাড়িটা। চেনা থাকলে কাল যেতে সুবিধে হবে তোদের।

ট্যাক্সি ছুটে চললো সেণ্ট্রাল এ্যাভিনু ধরে। শীতের সকালের ফাঁকা রাস্তা। দু' চারজন মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। কিংকরের মুখ গম্ভীর, কল্যাণ ফ্যাকাসে। খুঁটিয়ে অতনুকে দেখে তার মুখে, চোখে উদ্বেগ, গ্লানি খুঁজে পেল না মিলিন্দ। বরং খোসমেজাজে গড়গড় করে কথা বলছে অতনু। অতনু বলল, পাঁকেও পদ্ম ফোটে। তপতী তাই। মাঝখানে একটা ভুল সে করেছিল। কোর্টকাছারি, লিলুয়ার উদ্ধার আশ্রমে বিস্তর হ্যাপা সইতে হয়েছে তাকে। আগুনে পুড়ে এখন সে নিখাদ সোনা। আলাপ হলে তোরাও বুঝতে পারবি।

অতনুর কথা শুনে তপতীর একটা ছবি কল্পনায় তৈরি করছে মিলিন্দ। ছবিটা এরকম, উনিশ কুড়ির শ্যামলা রঙ, সামান্য মোটা, মুখে সারল্য, বিষাদ, স্বপ্ন জড়ানো দুচোখ, হাসিখুশি এক মেয়ে। জীবনের নানা ঘাটে নাকানি চোবানি খেয়েও সংসার বাঁধার আকাঙ্ক্ষা তার মরে নি। অতনুকে পেয়ে মলিন অতীত ঝেড়ে ফেলে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে সে। তপতীর ছবিটা মাথায় স্পষ্ট, মূর্ত হয়ে উঠতে কমলকলি, নবনীতার মুখও মনে জাগলো মিলিন্দর। তপতীকে দেখার কৌতূহল মুহূর্তে থিতিয়ে গেল। নিষিদ্ধ পাড়া টপকে গাড়ি তখন সাত বাই তিনের ডি বাড়ির কিছু দূরে মূল রাস্তায় দাঁড়িয়েছে।

গত সন্ধ্যেতে পতিত বিশ্বাসের বাড়ি থেকে তাড়া খেয়ে অপমানিত তিন বন্ধু সকাল আটটার মধ্যে অতনুকে তার বাড়িতে গিয়ে ধরার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। পরি-কল্পনা অনুযায়ী ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে মিলিন্দ বিবেকানন্দ রোড, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের মোড়ে পৌঁছানোর আগে কল্যাণ এসে গিয়েছিল সেখানে। পাঁচ, সাত মিনিট পরে এলো কিংকর। অখুশি কিংকর, কল্যাণ যে অতনুর এই ছন্নছাড়া, খামখেয়ালি বিয়েটা ভেস্তে দিতে চায়, মিলিন্দ বুঝে গেছে। দুই বন্ধুর ইচ্ছেতে সায় দেওয়ার আগে তপতী, তার পরিবারকে মিলিন্দ একবার দেখতে চায়। মুখে বন্ধুদের বিরোধিতা না করলেও গোপন ইচ্ছেটা মনে লালন করছে মিলিন্দ। মেয়েটা একটু মোটাসোটা, অল্প নির্বোধ হলেও নিশ্চয়ই অসাধারণ সুন্দরী, অথবা এমন কিছু গুণপনা তার আছে, যা দেখে অতনু অভিভূত। মিলিন্দও একবার দেখে, বাজিয়ে নিতে চায় অতনুর ভাবী জীবনসঙ্গিনীকে। মা, দু' দাদা, আত্মীয়স্বজন, বিস্তর সম্পত্তি থাকলেও সুখে, দুঃখে অতনুর পাশে দাঁড়াবার কেউ নেই। যে কোনো অনিষ্ট, অমঙ্গল অনায়াসে তার হতে পারে। সেরকম হলে মিলিন্দও কষ্ট পাবে। কিন্তু এ বিয়ের জন্যেই যে অতনুর ভরাডুবি হবে, একথা চট করে মেনে নিতে পারছে না মিলিন্দ।

পুরোনো, ভুতুড়ে বাড়ির একতলার অন্ধকার প্যাসেজ দিয়ে অতনুর সঙ্গে মিলিন্দ, কিংকর, কল্যাণ দোতলায় ওঠার একটা খাড়া সিঁড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো।

স্যাঁতসেঁতে, ভ্যাপসা গন্ধে ভেতরের বাতাস ভারী। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে একচিলতে ছোট দালান, তারপর পাশাপাশি দুটো ঘর। তিন বন্ধুকে নিয়ে বাঁপাশের ঘরে ঢুকলো অতনু। বাড়ির অনেকটা দূরে ট্যাক্সি থামলেও তাদের আসার খবর যে জানাজানি হয়ে গেছে, বুঝতে বেগ পেল না মিলিন্দ। মুখে কাঁচাপাকা খোঁচা খোঁচা দাড়ি, ভাঙা চোয়াল, কপালের চামড়ায় গভীর রেখার হিজিবিজি, ক্ষুদে ক্ষুদে চোখে সন্দিগ্ধ নজর, গায়ে ছাই রঙ তুষের চাদর জড়ানো, মাঝবয়সী একজন লোককে দেখিয়ে অতনু বলল, ইনি পতিতপাবন বিশ্বাস, তপতীর বাবা।

লোকটার কপালের রেখাগুলো কাঁপতে লাগলো। কোনো কথা বলল না পতিত বিশ্বাস। তিন সঙ্গীর নাম জানিয়ে অতনু বলল, আমার বন্ধু।

গদী, তোষকের ওপর কিটকিটে ময়লা চাদর পাতা মান্ধাতার আমলের খাটের দিকে আঙুল তুলে পতিত বলল, বসুন।

খাটে পাতা বিছানার দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে আছে কিংকর। বিছানার ওপর মানুষের তাজা, টাটকা ছাপ দেখে সে বুঝেছে, এখানে যারা ঘুমোচ্ছিল, এখনি উঠে গেছে। খাটের বাজুতে একটা শায়া ঝুলছে।

ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দালানের দিকে মুখ তুলে ভাঙা গলায় পতিত হাঁকলো, শুনছো, জামাই আর তার বন্ধুরা এসেছে।

কল্যাণকে নিয়ে মিলিন্দ বিছানায় বসতে ছ্যাঁৎ করে উঠলো তার শরীর। মনে হলো বিছানাটা ভিজে, বরফের মতো ঠাণ্ডা। কিংকর বিছানায় বসবে না। ঘরের কোণে রাখা টিনের একটা চেয়ার ধরে সে টানাটানি করছে। খাটের পেছনে অর্ধেক কাঠ, অর্ধেক কাচে ঢাকা আলমারি। সবগুলো কাচই ভাঙা। ধুলো জমা ভাঙা কাচের আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে কয়েকটা কাপ ডিশ্। হতশ্রী, দুঃস্থ এরকম সংসার আগে দেখলেও এ ঘরে ঢুকে মিলিন্দর মাথা ঝিমঝিম করছে। তপতীর মাকে ডেকে সাড়া না পেয়ে তার খোঁজে ঘরের বাইরে গেছে পতিত।

অতনুকে কল্যাণ প্রশ্ন করল, তোর দাদারা জানে?

বিয়ে করবো আমি, দাদাদের জেনে কি লাভ?

অতনুর জবাবে কল্যাণ বলল, তবু জানানো উচিত।

বাইরে পায়ের শব্দ শুনে চুপ করে গেল দু'জন। লালপাড় শাড়ি পরা জাঁদরেল চেহারা, নাকে নাকছাবি, বছর পঞ্চাশের এক মহিলা ঘরে ঢুকতে অতনু বলল, তপতীর মা।

ঘরের মাঝখানে দু'পা জুড়ে সোজা হয়ে মহিলার দাঁড়াবার ভঙ্গীতে মনে হলো, হবু জামাই-এর তিন বন্ধুর প্রণাম পাওয়ার অপেক্ষা করছে সে। মিলিন্দ, কল্যাণ, কিংকর নিজের জায়গা ছেড়ে নড়লো না। প্রথমে মিলিন্দ, তারপর কল্যাণ হাত তুলে তপতীর মাকে নমস্কার করলেও টিনের চেয়ারে কাঠের পুতুলের মতো বসে আছে কিংকর। হাত তুলে নমস্কার করার ইচ্ছেও তার নেই।

তোমরা বুঝি অতনুর বন্ধু, প্রশ্ন করল তপতীর মা। মহিলার গলার স্বর বেশ মোটা। এ সংসারে গৃহকর্ত্রীর দাপটই যে বেশী বুঝতে অসুবিধে হলো না

মিলিন্দর। অতনু বলল, আমার স্কুলের বন্ধু ওরা।

কাল সন্ধ্যেতে কি তোমরাই ডাকতে এসেছিলে অতনুকে?

তপতীর মার প্রশ্নে কিংকর, কল্যাণে চোখাচোখি হলো।

মিলিন্দ বলল, হ্যাঁ।

তপতীর মা বলল, তোমাদের সঙ্গে দু'জন দালালকে দেখে আমিই এক কলসি জল ঢেলে দিয়েছিলুম। ভাবলুম বোধহয় খদ্দের।

কিংকর, কল্যাণ হতভম্ব। অতনু হাসছে। অতনুর গা ঘেঁষে খাটের ওপর আসনপিঁড়ি হয়ে বসেছে তপতীর মা। হঠাৎ স্বর বদলে কাঁদো কাঁদো, ভিজে গলায় তপতীর মা ডুকরে উঠলো, সত্যি বলছি জামাই, আমার তোতার কোনো দোষ নেই। অলপ্পেয়ে ওই দালাল দুটো মেয়েটাকে ফুসলে একটা মেড়ো ছোকরার কাছে পাঁচশো টাকায় বেচে দিল। ওই মিনসে দুটোকে দেখলেই তাই আমার মাথা গরম হয়ে ওঠে। জামাই-এর বন্ধুদের অনাদর করার মানুষ আমি নই। আমার তোতাও তাই। বিয়ের পর বুঝবে কতো ভালো বৌ পেয়েছো তুমি। ক্লাস শিক্‌স্‌ পাশ দিয়ে লেখাপড়া না করলেও সেলাইফোঁড়াই, রান্নাবান্নায় আমার মেয়ের জুড়ি নেই। খুব মিশুকে স্বভাবচরিত্তির।

কথা শেষ না করে একটু থমকে গেল মহিলা। নাকি কান্নার বদলে স্বাভাবিক গলায় বলল, অল্পবয়সে সকলেই একটু ভুলচুক করে। তারপর সামলে নেয়।

শাড়ির আঁচলে চোখের জল মুছে তপতীর মা প্রশ্ন করল, তোমরা কি মত জামাই?

অতনু বলল, তা তো বটেই।

খুশিতে মহিলা হাসতে মিলিন্দ দেখলো, তার তলার পাটির সামনের দুটো দাঁত সোনা বাঁধানো।

তোমরা চা খাবে তো?

প্রশ্ন করে জবাব শোনার জন্যে না দাঁড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল তপতীর মা। অতনু বলল, তোতাকে ডেকে আনছি।

তার পেছনে পতিতও ঘরের বাইরে চলে গেল। বেলা বাড়লেও সূর্য আকাশের কোথায় বোঝা যাচ্ছে না। বিবর্ণ দেওয়াল, রঙচটা ধূসর আসবাবে ঘরের পরিবেশ অনুজ্জ্বল। তপতীর মার নকল কান্না আর মেয়ের গুণপনার ব্যাখ্যা শুনে কিংকর, কল্যাণ ফ্যালফ্যাল করে মিলিন্দর দিকে তাকিয়ে আছে। যে প্রত্যাশা, আবেগ নিয়ে এখানে মিলিন্দ এসেছিল, তা নিভু নিভু। বেশ দমে গেছে সে। তবু তপতীকে দেখার উৎকণ্ঠ প্রতীক্ষা তার। মা, বাবাকে দেখে মেয়ে সম্পর্কে আগাম একটা ধারণা করলে ভুল হবে। তপতী হয়তো এই সংসারের আর পাঁচজনের চেয়ে আলাদা, অতনুর কথায় পাঁকে ফোটা পদ্মফুল। তবে একথাও ঠিক যে একবার, পাঁচ সাত মিনিটের জন্যে দেখে, দু'চারটে কথা বলে একজন মানুষের কতোটাই বা জানা যায়? মানুষ চেনা পৃথিবীর কঠিনতম কাজ। সারাজীবন চেষ্টা করেও অনেকসময় এ চেনা শেষ হয় না। তবু চেষ্টা করতে হয়। পাঁচ, সাত, দশ মিনিটের মধ্যে তপতী কেমন

মেয়ে বোঝার চেষ্টা করবে মিলিন্দ। তপতীকে তার পছন্দ হলে অতনুর বিয়ে সমর্থন করবে সে। কেন করবে না? মানুষের মহিমায় তার অসীম বিশ্বাস। কিন্তু যদি উল্টোটা, অপছন্দ হয়?

দরজা, জানলার পাশ থেকে উঁকি দিয়ে দু'তিনজন ছেলে, মেয়ে, যারা সরে যাচ্ছে, তারা তপতীর ভাই, বোন। ওরা ঘরে ঢুকছে না কেন? নিশ্চয় মার কড়া নিষেধ আছে। কিন্তু পরিবারের যারা ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হতে চলেছে, তাদের কাছ থেকে বাড়ির ছেলেমেয়েদের দূরে সরিয়ে রাখার দরকার কি?

মিলিন্দর চিন্তার মধ্যেই দু'হাতে দু'কাপ চা নিয়ে অতনু, পেছনে একটি মেয়ে তার হাতেও চায়ের পেয়ালা ঘরে ঢুকলো। অতনুর পেছনে যে তোতা, তপতী বুঝতে দেরী হলো না মিলিন্দর। আকাশ থেকে শানবাঁধানো শক্ত মেঝেতে কেউ আছাড় মারলো তাকে। গোলগাল শরীর, আলুথালু পোশাক, চুল, ঘুমজড়ানো চোখ, থমথমে মুখ, খুব বেশী হলে পাঁচফুট লম্বা, মেয়েটির ওজন পঁচাত্তর কেজির কম নয়। চায়ের কাপটা কিংকরকে ধরিয়ে কালিঘাটের পটের মতো ডান হাতের তর্জনীর ডগায় চিবুক ছুঁয়ে ঘরের মাঝখানে দাঁড়ালো তপতী। ডেও পিঁপড়ের মতো তার দাঁড়ানোর ভঙ্গি।

অতনু বলল, আমার বৌ তোতা।

অতনুর কথাতেও কালিঘাটের পট নড়লো না, লাজুক স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে থাকলো। নিস্তব্ধ কিংকর। নাটক পরিচালকের তীক্ষ্ণ নজরে সে দেখছে তপতীকে। অতনুর পছন্দের অধঃপতন দেখে সে মর্মাহত। দুধ ছাড়া চা খায় মিলিন্দ। ছানা ছানা সরের টুকরো ভাসা ঘোলা রঙ চায়ের দিকে তাকিয়ে আছে সে। চায়ের কাপে চুমুক দিতে গিয়ে পারলো না। তপতীকে দেখার ইচ্ছে নিঃশেষ হয়ে গেছে তার। মিনিট দুই দাঁড়িয়ে, একটা কথা না বলে, সামান্য না হেসে তপতী চলে গেল। কয়েক মিনিটে ঘরের বাতাস জমাট বেঁধে গেছে। তপতী চলে যেতে নড়ে চড়ে বসে চায়ের কাপ নামিয়ে রাখলো কিংকর

খাবি না?

অতনু প্রশ্ন করতে কিংকর বলল, চা ছেড়ে দিয়েছি।

পাঁচনের মতো এক চুমুকে ঢকঢক করে চা খেয়ে নিল মিলিন্দ।

ঘন্টাখানেক পরে, বরানগরে হলুদ রঙের এক তিনতলা বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থামিয়ে অতনু বলল, নেমে পড়। এখানেই বিয়ে।

বি. টি রোড থেকে অল্প ভেতরে একটা চওড়া রাস্তার পাশে নতুন দোতলা বাড়ি। রাস্তার দু'পাশেও অনেক নতুন বাড়ি। কিছু বাড়ি তৈরি হচ্ছে। ভদ্র, অভিজাত একটা পল্লী গড়ে উঠছে, দেখে বোঝা যায়। কয়েকটা বাড়ির সামনে গ্যারাজে গাড়ি রয়েছে। রাস্তায় মানুষ কম। ভিড়, জটলা নেই।

ট্যাক্সিতে আসার সময় পাশে বসা মিলিন্দকে অতনু প্রশ্ন করেছিল, তপতীকে কেমন লাগলো।

কী জবাব দেবে ভেবে না পেয়ে মিলিন্দ বলেছিল, তোর ভালো লেগেছে, এটাই যথেষ্ট।

অতনু কী বুঝলো কে জানে! আর প্রশ্ন করে নি মিলিন্দকে। ট্যাক্সির সামনে ড্রাইভারের পাশে বসে স্থির চোখে উইন্ডস্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে ছিল কিংকর। কল্যাণ রাস্তা দেখছিল। মিলিন্দর বুকে ডুকরে উঠছিল কান্না, অতনু, তুই ডুববি। এখনও সময় আছে, পালা।

কল্যাণের কানের কাছে মুখ নিয়ে তপতীর গুণপনা চাপা গলায় অতনু শোনাচ্ছিল। অতনু বলছিল, ঘুম থেকে ওঠার জন্যে একটু ফোলা ফোলা দেখালেও সাজলে তপতীকে দারুণ সুন্দরী লাগে। তপতীর রান্না, বিশেষ করে আলু-পোস্ত সে যা রাঁধে, গ্র্যান্ড হোটেলের রাঁধুনী হার মেনে যাবে।

গ্র্যান্ড হোটেলেও যে আলুপোস্ত পাওয়া যায়, মিলিন্দ জানে না। কোনো কথা বলল না সে।

কল্যাণ বলল, দাদাদের জানানো উচিত ছিল তোর।

একটু থমকে গিয়ে অতনু বলেছিল, আমার কোনো কাজে, দরকারে, অদরকারে দাদারা আসে না। তাদের জানাতে যাবো কেন? তাছাড়া বৌকে খাওয়াবার দায়িত্ব আমার, দাদাদের নয়।

সামনের সিটে নিস্পন্দ কিংকরের মুখ দেখতে না পেলেও তার ঘাড়, পিঠ, মাথা দেখে সে কী ভাবছে, অনুমান করতে মিলিন্দর অসুবিধে হয় নি। কিংকরের তত্ত্ব হলো, মানুষের রূপ, যা দেখা যায়, তা শুধু চোখের নেশা নয়। মানুষের চরিত্র মনের সঙ্গে রূপ সৌন্দর্যের নিবিড় সম্পর্ক আছে। চোখ হলো হৃদয়ের প্রদীপ, জলন্ত প্রদীপ, চারপাশ আলোকিত, উজ্জ্বল করে। অন্ধ মানুষের সামনে পৃথিবী নেই, প্রকৃতি, মানুষ নেই। পৃথিবী, প্রকৃতি, মানুষকে চোখে না দেখলে মানুষের মনে মায়া, মমতা তৈরি হবে কোথা থেকে। শূন্যতা থেকে কিছু তৈরি হয় না। আগে দেখা, তারপর উপলব্ধি। দর্শন ছাড়া জ্ঞান নেই। শরীরী রূপ কিংকরের চোখে অসম্ভব দামী। রূপকে হেলাফেলা করার সে ঘোর বিরোধী।

তার মতে বাহ্যিক সৌন্দর্য কিছু নয় বলে যারা চেঁচায়, নিজেদের ধোঁকা দেয় তারা। অসুন্দরের সপক্ষে নির্বোধ তত্ত্বের তেঁতো বড়ি বানিয়ে বাহবা কুড়োতে চায়।

এ নিয়ে কিংকরের সঙ্গে মিলিন্দর অনেক ফাটাফাটি, তর্ক, আলোচনা হয়েছে। মিলিন্দ এতোকাল সহৃদয়, ধীমান হবার তত্ত্বে জোর দিলেও আজ তার মনে হচ্ছে, কিংকরের কথাই বোধহয় ঠিক। সুন্দর যদি ছলনাময়ী হয়, তবু সুন্দর বলেই তাকে মেনে নেওয়া যায়। অসুন্দরের হাতে প্রতারিত হবার চেয়ে ছলনাময়ী সুন্দরকে জড়িয়ে ধরা অনেক ভালো।

হলুদরঙ, নতুন তিনতলা বিয়েবাড়ির লোহার গেট খুলে চার বন্ধু ভেতরে ঢুকলো। এ বাড়িতেই পরশু বিয়ে হবে অতনুর।

কমলকলিদের বাড়ির সদর দরজা বন্ধ দেখে হকচকিয়ে গেল মিলিন্দ। বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ঘাড় তুলে নজর করল, কমলকলির ঘরের জানলা দুটোও খোলা নেই। তখনই তার খেয়াল হলো, শুধু কমলকলির ঘর নয়, বাড়ির একতলা, দোতলার সব ঘরের রাস্তার দিকের জানলা বন্ধ। শব্দহীন, নিশ্চুপ বাড়িটাকে ভুতুড়ে মনে হলো তার। রোজ বিকেলে এসময়, বাড়ির যাবতীয় দরজা, জানলা হাট করে খোলা থাকে। কথায়, কোলাহলে গমগম করে বাড়ি। আজ সবকিছু আলাদা, অন্যরকম। কেউ কি বাড়ি নেই? কমলকলির বাবা সপরিবারে কোথাও হঠাৎ বেড়াতে চলে গেছে? এ রকম হবার কথা নয়। অবাক হলো মিলিন্দ।

ফিরে যাবে ভেবেও সদর দরজার লোহার কড়াটা জোরে বাজালো সে। নিস্তব্ধ বাড়ির ভেতরে, বাইরে লোহা, কাঠের ঠোকাঠুকির খটখট শব্দ ছড়িয়ে পড়ল। বাড়ির সামনের রাস্তাটা এমনিতে ফাঁকা, লোকচলাচল কম, হৈ-হল্লা নেই বললেই চলে। কড়া নাড়ার ধাতব শব্দ বাতাসে মিশে যেতে চারপাশ আরো নীরব হয়ে গেল। বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মিলিন্দ টের পেল, বাড়ির ভেতর এতোক্ষণ যে চাপা গুঞ্জন, কথাবার্তা চলছিল, কড়া নাড়ার পর থেমে গেছে। বাড়িতে মানুষ আছে, সন্দেহ নেই। আরো একবার কড়া নাড়ার কথা ভেবেও সাহস পেল না মিলিন্দ। বন্ধ দরজা কেউ খুললো না। দুশ্চিন্তা চাপ বেঁধে আছে মাথাতে।

বরানগরে অতনুর বিয়ে বাড়ি দেখে মিলিন্দ কলেজে গিয়েছিল। সামনে ছাত্রসংসদের নির্বাচন। গত দু'বছর ওপর ওপর নির্বাচনের কাজ করলেও এবছর চন্দনের অনুরোধে গা ঘামিয়ে মিলিন্দ খাটছে। তাকে ছাত্র আন্দোলন, পার্টিতে ঢোকাতে গত এক, দেড় বছর খুব চেষ্টা করছে চন্দন। মুখে না বললেও সে যে পার্টি-মেম্বার, আভাসে, ইঙ্গিতে মিলিন্দ বুঝেছে।

মাঝে মাঝে পার্টির কাগজ, প্রচার-পুস্তিকা তাকে পড়তে দেয় চন্দন। বলে, সাম্যবাদী আন্দোলনের বড়ো দুঃসময়, বাম, ডান সব একাকার হয়ে গেছে। অথচ ইতিহাস থেমে নেই। দায়িত্ব বুঝে নিতে হবে আমাদের। তোরও দায়িত্ব আছে। চন্দনের সঙ্গে কখনও খুব গুরুত্ব দিয়ে মিলিন্দ আলোচনা করে, কখনও তার কথা শুনে হাসে। কিন্তু চন্দনের বিশ্বাসের দৃঢ়তা, নিষ্ঠা, গলদঘর্ম খাটুনি দেখে মনের মধ্যে আচনা এক দংশনও প্রায়ই মিলিন্দ অনুভব করে। রাজনীতি আকর্ষণ করে না তাকে। বামপন্থায় বিশ্বাস করলেও চালু বামপন্থা, বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর তার ছিটেফোঁটা বিশ্বাস নেই। সে প্রায়ই ভাবে যে, লেনিন, বা মাও জে দং-এর পার্টির মতো কোনো রাজনৈতিক দল এদেশে থাকলে। কোমর বেঁধে নেমে পড়তো। বামপন্থী এবং কংগ্রেসী রাজনীতি সম্পর্কে তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও কিছু আছে। তার এক পিসেমশাই শাসক বাম দলের বিধানসভা সদস্য। দূরে

সম্পর্কের এক মেসো রাজ্যের নামকরা কংগ্রেসী নেতা। পিসেমশাই এর বাম রাজনীতিতে আংশিক সমর্থন থাকলেও গোমড়ামুখো লোকটার হামবড়া ভাব, চ্যাটাং চ্যাটাং কথা মিলিন্দ সহ্য করতে পারে না। পাশাপাশি মেসোমশাই-এর কংগ্রেসী রাজনীতি ষোলআনা অপছন্দ করলেও মানুষটা সম্পর্কে দুর্বলতা আছে মিলিন্দর এমন হাসিখুশি, উদার মানুষ খুব বেশি মিলিন্দ দেখে নি। নির্ভুল রাজনীতি নিয়ে একজন মানুষ কীভাবে এমন নিরেট, নীরস, বিরক্তিকর হয়, এবং ভুল রাজনীতি সত্ত্বেও আর একজন এতো দীপ্তিমান, আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে, মিলিন্দ ভেবে পায় না মাঝে মাঝে মিলিন্দর মনে হয়, এদেশে যার যে রাজনীতি করা উচিত, সে তার উল্টোটা করছে। রাজনৈতিক মানুষগুলোর জায়গা, অবস্থান, রুচি এবং আচরণের আমূল পরিবর্তন দরকার। তবেই এদেশে কিছু হতে পারে। মিলিন্দর ধারণা, উদার স্নেহপ্রবল মেসোমশাই-এর বাম রাজনীতি এবং রামগরুড়ের ছানা পিসেমশাই-এর কংগ্রেস করা উচিত ছিল। ভারতবর্ষের সাম্যবাদী আন্দোলনের হাল মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধীর হাতে থাকলে চীনদেশের আগে বিপ্লব হয়ে যেতো এখানে।

সাইনবোর্ড ঝোলানো কোনো বাম দলে চন্দন নেই। সে আলাদা জাতের বাম। কিন্তু তার পার্টি সম্পর্কেও মিলিন্দর আগ্রহ কম। তাদের দলেও এতো ভাগাভাগি, ঝগড়া, কোঁদল, কুৎসা যে, বাইরে থেকে জেনেই মিলিন্দ আতঙ্ক বোধ করে। শুধু চন্দনের মুখের দিকে তাকিয়ে ছাত্রসংসদ নির্বাচনে কাজে নেমেছে সে।

বরানগর থেকে কলেজ ছুঁয়ে বাড়িতে খেয়েই মিলিন্দর কফিহাউস যাবার কথা। কিংকর, কল্যাণের সঙ্গে সেরকমই ঠিক করা আছে। ভয়ানক এক বিপদে পড়েছে অতনু। কীভাবে তাকে বাঁচানো যায়, এ নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করবে। বাড়ি থেকে কফিহাউসে যাবার আগে কমলকলিকে একবার দেখার জন্যেই তার বাড়িতে এসেছে মিলিন্দ। পাঁচদিন দেখা হয় নি কমলকলির সঙ্গে।

বন্ধ দরজার সামনে দু'তিন মিনিট দাঁড়িয়ে কী করা যায়, মিলিন্দ যখন ভাবছে, তখনই বাড়ির ভেতর থেকে আবার ভেসে এলো আবছা গুঞ্জন। বেপরোয়াভাবে পরপর তিনবার কড়া নাড়লো মিলিন্দ। দূর থেকে এগিয়ে আসছে হালকা পায়ের শব্দ। দরজার একটা পাল্লা খুলে সন্ত্রস্ত, ভীতু মুখ বাড়িয়ে কমলকলির ছোট ভাই মিঠুন বলল, তাড়াতাড়ি ভেতরে আসুন।

মিলিন্দ ভেতরে ঢুকতে দুম করে দরজা আটকে খিল তুলে দিল মিঠুন।

কী হয়েছে ?

চাপা গলায় মিলিন্দ প্রশ্ন করতে মিঠুন বলল, ওপরে যান, দিদি বলবে।

মিলিন্দ আর কিছু বলার আগেই সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে দোতলায় উঠে গেল মিঠুন। শুধু সামনে নয়, বাড়ির অন্য দরজা, জানলাও বন্ধ। বাড়িতে আলো জ্বলে নি। সিঁড়ির ধাপগুলো এতো অন্ধকার, যে প্রথমে কিছু দেখতে পেলো না মিলিন্দ। বাইরের আলো থেকে অন্ধকার বাড়িতে ঢুকে কানা হয়ে গেছে সে। ষোল বছরের মিঠুনের কথা, চালচলনও রহস্যময়। দোতলায় কেউ যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে। সেই আর্ত কান্না শুনে ভয়ে শিউরে উঠলো মিলিন্দ। কেউ অসুস্থ ? প্রশ্নটা মনে জাগতে

অন্য এক সম্ভাবনার হিমেল আতঙ্ক তার রক্তে ছড়িয়ে গেল। কমলকলিকে তার বাবা চাবুক মারছে নাকি? নাহ্। তা হতে পারে না। এখনই দিদির সঙ্গে দেখা করার কথা তাকে বলেছে মিঠুন। কমলকলিকে যতীন চাবকালে এ কথা মিঠুন বলতো না। চোখের সামনে অন্ধকার পাতলা হতে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠলো মিলিন্দ। দোতলার দালানে ফিসফিস কথা, পা টিপে হেঁটে গেল কেউ। ডুকরে ওঠা সেই কান্না আবার মিলিন্দর কানে এলো। দোতলাও অন্ধকার। একটা আলো নেই। বিস্ময় তার গলায় এসে ঠেকেছে। আবছা অন্ধকারে তখনই সে দেখল কমলকলিকে। উদ্বেগ, কষ্ট, বিষণ্ণতায় চকচক করছে কমলকলির দু'চোখে মণি। নিচু গলায় সে বলল, এসো।

দালান ধরে কয়েক পা এগোবার সময় মিলিন্দ দেখল, কমলকলির মা, ভাইবোনেরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে, ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে আছে। বাঁ দিকে, কনকলতার ঘরের বন্ধ দরজা খুলে গেল। ঘরের ভেতর থেকে একজন প্রায় উলঙ্গ লোকের শরীর চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে বেরিয়ে এলো কমলকলির বাবা আর মেজদা। নগ্ন মানুষটা যে বেহুঁশ, বুঝতে মিলিন্দর অসুবিধে হলো না। বেহুঁশ শরীর নিয়ে সামনের একটা ঘরে ঢুকলো দু'জন।

ফিসফিস করে কমলকলি বলল, পুলকেশ, তোমাদের কলেজের ইংরিজির মাস্টার।

নামটা শুনে কেঁপে উঠলো মিলিন্দ। বাঁ দিকের দরজা খোলা ঘর থেকে ভেসে আসছে কনকলতার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার আওয়াজ। দরজা, জানলা বন্ধ, অন্ধকার বাড়ি, জাঙ্গিয়া পরা বেহুঁশ পুলকেশ, কনকলতার কান্না, কিছুই মেলাতে পারছে না মিলিন্দ। চিন্তা, যুক্তি তালগোল পাকিয়ে ঝিমঝিম করছে তার মাথা। কমলকলি ঘরের মধ্যে ডেকে নিয়েছে মিলিন্দকে। সামনাসামনি দুটো চেয়ারে দুজন বসার পর কমলকলি বলল, পুলকেশটা অসভ্য, ছোটলোক!

মিলিন্দ তাকিয়ে আছে দেখে গলা আরো খাটো করে কমলকলি বলল, কনকের দারুণ ক্ষতি, সর্বনাশ করে দিয়েছে পুলকেশ।

অন্ধকার ঘরে ধূসর, আবছা দেখাচ্ছে কমলকলিকে। মিলিন্দর মনে হচ্ছে অন্ধকারে মিলিয়ে গিয়ে আবার চোখের সামনে ভেসে উঠছে কমলকলির শরীর। জানলাবন্ধ ঘরে গুমোট গরম। ঘেমে জবজবে হয়ে গেছে মিলিন্দ।

কমলকলি বলল, কনকের সর্বনাশ করে আমেরিকায় পালাবার মতলব করেছিল পুলকেশ।

হাঁ করে মিলিন্দ শুনছে।

কমলকলি বলল, গতকাল সকালে খবরটা জানাজানি হবার পর তোমাদের কলেজে গিয়ে পুলকেশকে ডেকে বাবা বলেছিল, কাল আমেরিকায় যেতে হলে আজই কনককে বিয়ে করে তাকে সঙ্গে নিয়ে যাও। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে রেজিস্ট্রি বিয়ে, পাসপোর্ট, ভিসা, কনকের টিকিট, আর যা যা দরকার, সব নিজের খরচে আমি করে দেবো।

বাবার কথায় পুলকেশ শুধু যে রাজি হলো। না, তাই নয়, কনকের প্রেগ্‌নান্সির দায়িত্ব অস্বীকার করে সে বলল, আপনার বাড়িতে আরো অনেক ছেলে যায়, তাদের

কেউ

দম নেবার জন্য কমলকলি এক সেকেণ্ড থামতে মিলিন্দর মনে হলো, তার হৃদযন্ত্র এখনই বন্ধ হয়ে যাবে।

কমলকলি বলল, তবু আজ দুপুর বারোটা পর্যন্ত পুলকেশকে সময় দিয়েছিল বাবা। বারোটার মধ্যে পুলকেশ যোগাযোগ না করায় তাকে বাড়ি থেকে বাবা, মেজদা তুলে নিয়ে এসেছে। তারপর দু'ঘণ্টা, দুটো, আড়াইটে পর্যন্ত বাবা, মা, এমন কি ঠাকুমাও অনেক বুঝিয়েছে তাকে। পুলকেশ বুঝল না। তার সেই এক ওজর, কনকের প্রেগনান্সিতে আমার কোনো হাত নেই!

একটা লম্বা শ্বাস ফেলে কমলকলি বলল, এরকম লোককে হুইপ্‌। কর ছাড়া বাবার উপায় কী?

অন্ধকারে মিশে থাকা কমলকলির দিকে ফাঁকা মাথায় তাকিয়ে মিলিন্দ চুপচাপ বসে আছে। কয়েক সেকেণ্ড নীরবতার পর কমলকলি বলল, কনক খুব বোকা। কাউকে কিছু বলে নি। দিন কয়েক আগে মা হঠাৎ বুঝতে পেরে জেরা করে জানতে পারলো।

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে মিলিন্দ প্রশ্ন করল, কনক কী বলেছে?

খুব ভয় পেয়ে গেছে কনক। শুধু বলছে, তোমরা ওকে মেরো না, ওর কোনো দোষ নেই।

কমলকলির কথা শুনে কনকের জন্যে মমতাবোধ করল মিলিন্দ। বেচারী! কিন্তু তখনই তার মনে হলো, পুলকেশকে কি নির্দোষ বলার চেষ্টা করছে কনক? ঘটনা খুব সরল মনে হলো না মিলিন্দর। তাছাড়া পুলকেশ সম্পর্কে শ্রদ্ধা আছে তার। তার ধারণা পুলকেশ মিথ্যে বলার, নিজের কাজের ভালোমন্দের দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলার মানুষ নয়। শুধু কলেজে নয়, কলেজের বাইরেও নানা কাজে পুলকেশকে দেখেছে মিলিন্দ। পুলকেশ গভীর, রসিক, উদার মানুষ। রূপান্তর সাংস্কৃতিক সংস্থার অন্যতম সহসভাপতিও পুলকেশ। এমন একটা জঘন্য কাজ সে করতে পারে না। অসম্ভব! কনকের ক্ষতির জন্যে তাহলে কে দায়ী? এ খবর কনকই একমাত্র বলতে পারে। তাহলে সে বলছে না কেন? মাকে নিশ্চয় কনক বলেছে। তা না হলে পুলকেশকে কীভাবে সনাক্ত করল যতীন?

তবু কমলকলিকে মিলিন্দ প্রশ্ন করল, পুলকেশের নাম কি কনক বলেছে?

কনক কিছু বলছে না, শুধু কাঁদছে।

কথাটা বলে এক সেকেণ্ড চুপ থেকে কমলকলি প্রশ্ন করল, এ কথা জিজ্ঞেস করছো কেন?

এমনি।

এ মুহূর্তে কোথাও গুঞ্জন, কথা নেই। নিরুচ্চার জটিল কিছু প্রশ্ন মিলিন্দর মাথায় ভিড় করছে। দালানের আলো জেবলে দিয়ে কেউ বলল, জানলা খুলে ঘরের আলো জেবলে দাও।

চেয়ার থেকে উঠে কমলকলি সুইচ টিপতে জোরালো আলোয় আবার মিলিন্দর

চোখ ধেঁধে গেল। দু'জনের কারো মুখে কথা নেই। দু'তিন মিনিট পরে মিলিন্দ বলল, আমি উঠবো।

চা খাবে না?

মিলিন্দ বলল, আজ নয়।

কমলকলির বাড়ি থেকে খোলা রাস্তায় এসে বুক ভরে কয়েকটা লম্বা শ্বাস নিল মিলিন্দ। বুকের মধ্যে একটা ভারী পাথর ঠাণ্ডা বাতাসে গলে যাচ্ছে। মাথা ভার হয়ে থাকলেও এখনই কফি হাউসে যেতে হবে তাকে। দারুণ বিপদে আছে অতনু। তাকে বাঁচাতে বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে আজই একটা ব্যবস্থা করা দরকার। নষ্ট করার সময় নেই।

শ্যামবাজারের দিকে হু হু করে ছুটে চলেছে দুটো এ্যাম্বাসাডার গাড়ি। দিন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ঘন হয়েছে শীতের অন্ধকার।

ছাই রঙের ঠাণ্ডা কুয়াশা সাবানের ফেনার মতো রাস্তার মোড়ে মোড়ে ল্যাম্প-পোস্টের গা জড়িয়ে ঝুলছে। সামনের গাড়ি চালাচ্ছে সুজিত। গাড়িতে আছে মিলিন্দ, কিংকর, নচিকেতা, মৃণাল। পেছনের গাড়িতে আছে কল্যাণ, দীপু, তরুণ, গঙ্গাধর। গাড়ির স্টিয়ারিং সুহৃদের হাতে। বরানগরের টবিন রোডে গঙ্গাধর থাকে। সুহৃদের বন্ধু সে। তার সঙ্গে কফি হাউসেই মিলিন্দর পরিচয়, বন্ধুত্ব। নিজের পাড়ায় বলবান, মারকুটে বলে গঙ্গাধরের খ্যাতি আছে। গতকাল সন্ধ্যেতে কমলকলির বাড়ি থেকে কফি হাউসে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে বসেছিল মিলিন্দ। তার জন্যে অপেক্ষা করছিল বন্ধুরা। টবিন রোড থেকে গঙ্গাধরকে নিয়ে এসেছিল সুহৃদ।

শ্যামবাজার পাঁচ মাথায় গিজগিজ মানুষ, গাড়ি, লম্বা যানজট। কিংকর বলল, যে-কোনো ভাবে বাঁচাতে হবে অতনুকে।

তোলতাই করে আনবো, সুজিত বলল, দরকার হলে গায়ের জোরে।

গাড়ির সামনের সিটে সুজিতের পাশে কিংকর, পেছনে মিলিন্দ, মৃণাল, নচিকেতা পাশাপাশি বসেছে। কিংকর, সুজিতের কথা শোনার জন্যে সামনের সিটের দিকে ঝুঁকে পড়েছে মৃণাল। ইচ্ছে না থাকলেও নারীঘটিত একথা হাল্কা থ্রিলার দেখার লোভ সামলাতে না পেরে নচিকেতা গাড়িতে উঠেছে। ভবিষ্যতে লেখক হবার বাসনায় এখন থেকেই অভিজ্ঞতার পুঁজি বাড়াচ্ছে সে। তার ধারণা যতো বেশী মেয়ের সঙ্গে সে মেলামেশা করবে, ততো তার অভিজ্ঞতা বাড়বে। মেয়েরাই অভিজ্ঞতার সবচেয়ে উর্বর ভূমি। তাই মেয়ে এবং মহিলাঘটিত সব বিষয়ে তার কৌতূহলের সীমা নেই।

কিংকর বলল, অতনুকে একবার বাড়ির বাইরে আনতে পারলে।

আনতেই হবে, সুজিত বলল।

মিলিন্দ যখন সে দায়িত্ব নিয়েছে, কথা শেষ না করে মিলিন্দর একটা হাত ধরল

মৃণাল। সিটে ঠেস্ দিয়ে চুপচাপ বসে আছে মিলিন্দ। গতকাল সন্ধ্যেতে কফিহাউসে তৈরি পরিকল্পনাটা মনের মধ্যে সে সাজিয়ে নিচ্ছে। বিয়েবাড়ির অল্প দূরে তিন রাস্তার মোড়ে দুটো গাড়ি রেখে অপেক্ষা করবে বন্ধুরা। মিলিন্দ একা যাবে অতনুর কাছে। সামান্য গল্পগুজব করে সিগারেট কেনার কথা বলে অতনুকে নিয়ে তিন-রাস্তার মুখে আসবে সে। তারপর যা করার বন্ধুরা করবে। মূল কাজ অতনুকে বাইরে আনা। মিলিন্দর মনে হলো খুব একটা বেগ পেতে হবে না। যদি অতনু বাইরে না আসে, অথবা পতিত বিশ্বাস, তার বৌ, বাড়ির লোকজন যদি কোনো অজুহাতে অতনুকে বাড়ি থেকে বেরোতে না দেয়, তাহলেই ঝামেলা। দলবল নিয়ে বিয়েবাড়ি চড়াও করে অতনুকে ছিনিয়ে আনতে হবে। মিলিন্দর মনে হচ্ছে, দরকার হবে না। সরল বিশ্বাসে তার সঙ্গে সিগারেটের দোকানে আসবে অতনু।

সুজিত, সুহৃদ দুজনেই পাকা ড্রাইভার। প্রায়ই গাড়ি নিয়ে কলেজে আসে তারা। শ্যামবাজার পাঁচমাথার ভিড়, জট সাবধানে পেরিয়ে বাগবাজারের মুখে এসে গাড়ির গিয়ার আবার টপে তুলে দিল সুজিত। পেছনের গাড়িতে সুহৃদও নিশ্চয় তাই করেছে। দুপুর থেকে ছক অনুযায়ী নিখুঁত কাজ হচ্ছে। দুটো গাড়ি নিয়ে বিকেলের শুরুতে কফিহাউস থেকে সবাই গিয়েছিল অতনুর দুই দাদার কাছে। অতনুর মেজদা বাড়িতে ছিল না। আবছা অন্ধকার সিঁড়ির মাথায় পাথরের মতো দাঁড়িয়ে অতনুর খবর শুনেছিল তার দাদা। একটা কথা বলে নি। সিঁড়ির মাঝখানের বাঁকে পুঁটলি পাকিয়ে বসে অতনুর অন্ধ, পাগল মা কাঁপা গলায় প্রশ্ন করল, কে? তনু এলি?

কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে মিলিন্দকে অতনুর দাদা বলেছিল, আমার কিছু বলার নেই।

বড়দার পেছনে কখন যেন বড়োবৌদি এসে দাঁড়িয়েছিল। বড়োবৌদি বলল, বন্ধুকে বাঁচাও তোমরা। বেচারী বড়ো একা, সংসার নিয়ে আমরা জেরবার, দেখতে পারি না তাকে।

বড়োবৌদির কথায় ঝরে পড়ল অনুতাপ, অসহায়তা।

হেমন্ত বসু সেতু পেরিয়ে বিটি রোড ধরে এগিয়ে চলেছে দুটো গাড়ি। চাপা উত্তেজনা ছড়াচ্ছে মিলিন্দর শরীরে। নচিকেতা প্রশ্ন করল, আমাদের ডাকাত ভেবে বরানগরের পাবলিক পিটিয়ে মারবে নাতো?

এরকম আশঙ্কা, উদ্বেগ মাথায় থাকলেও মিলিন্দ বলল, সে জন্যেই লোকাল্ ছেলে গঙ্গাধরকে সঙ্গে নিয়েছি।

নচিকেতা আর প্রশ্ন করল না। মাথার মধ্যে ঝিমুনি, ক্লান্তি এতো ঘন যে মিলিন্দর মনে হচ্ছে, এখনই ঘুমিয়ে পড়বে সে। কাল থেকে এরকম এক দুঃসাহসিক অভিযানের পরিকল্পনায় মেতে বন্ধুদের জড়ো করে আজ বেরিয়ে পড়লেও তার মন পড়ে আছে কমলকলির বাড়িতে। কমলকলির বাড়ির ঘটনা কাউকে, এমন কি কিংকরকেও বলার সুযোগ পায় নি মিলিন্দ। অথচ এই ঘটনা কাল থেকে ভূতের মতো তার ঘাড়ে চেপে আছে। তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে তাকে। গত রাতে দুঃস্বপ্নে তিন,

চারবার ঘুম ভেঙে গেছে তার। পুলকেশের বদলে চাবুকে ফালাফালা নিজের উলঙ্গ দেহ দেখে ঘুম ভাঙার পর বহুক্ষণ ধড়ফড় করেছে বুক। অন্ধকার ঘরে বিছানায় বসে সে ভেবেছে পুলকেশ কোথায়? কনকলতার কী হবে?

রাস্তা এখন কিছুটা ফাঁকা, নির্জন। দু'পাশের দোকানে আলো, মানুষ, কেনাকাটা, দরাদরি সওদা, কথাবার্তার আওয়াজ। কাল থেকে কমলকলিকে খুব নিষ্ঠুর, মমতাহীন মনে হচ্ছে মিলিন্দর। চাবুক খেয়েও যে মেয়ে চাবুক মারা সমর্থন করে, তাকে কী বোঝাবে মিলিন্দ। কমলকলিকে ঘিরে যে মনোরম, রঙীন নক্সা সে ধীরে ধীরে মনের মধ্যে বানিয়ে তুলছিল, তা আবছা হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। তার মনে হচ্ছে, কমলকলি অন্য মেরুর মানুষ। নড়ানো যাবে না তাকে। তবু তার মুখ, গলার শব্দ, হাসি, চকচকে দুচোখের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে থাকে মিলিন্দর মন। কেন এই মেয়েটাকে ভুলতে পারছে না সে? অসহায় অস্থিরতায়, তার মনে হয়, বুকের মধ্যে কেউ কাঁদছে। কে কাঁদে? কান্নার শব্দে মানুষটাকে চিনতে অসুবিধে হয় না তার।

ব্যক্তিগত বিষাদ, হতাশা ঝেড়ে অতনুকে ভাবতে চেষ্টা করল মিলিন্দ। কাল অতনুর বিয়ে। কাল রাত দশটার পর, কুৎসিত, মোটা, কালো তোতা, না তপতী নামের মেয়েটা বৌ হয়ে যাবে অতনুর। তারপর সারাজীবন অতনু দগ্ধে মরবে। কিন্তু এ বিয়ে আদপে কি হবে? নিশ্চয়ই হবে না। কথাটা মনে হতে মিলিন্দর বিষাদ আরো গাঢ় হলো। অতনুকে তুলে আনা ঠিক হবে কিনা, ভেবে সন্দেহ জাগলো। যে কাজ তারা করতে চলেছে, আখেরে তার ফল, তোতা, অতনুর বিয়ের চেয়ে খারাপ হতে পারে। অতনু ভবিষ্যতে একদিন নিশ্চয় বিয়ে করবে। তার বৌ হয়ে তখন যে আসবে, তাকে নিয়েই যে দুজনের সুখি সংসার হবে, একথাই বা কে বলতে পারে! সেই চরম অসুখি দিনগুলোতে তোতাকে বিয়ে করলে জীবন কত মধুর, সুখের হতো ভেবে বন্ধুদের হয়তো দুষবে, অভিশাপ দেবে অতনু। জীবনের ভালো-মন্দের নির্ভুল অঙ্ক কষার নিয়মটা যে কী, কীভাবে, কবে শিখতে পারবে, মিলিন্দ জানে না। শুধু বুঝতে পারে, তর্ক বিতর্ক করে অনেকবার সত্যকে মিথ্যা, এবং মিথ্যাকে সত্য প্রমাণের যুদ্ধ জিতেও সত্য, বা মিথ্যার গায়ে সে একটা আঁচড়ও কাটতে পারে নি। কুরূপা একটি মেয়ের আশাভঙ্গের হাহুতাশ স্পষ্ট শুনতে পেল মিলিন্দ।

ঘুমিয়ে পড়লি নাকি?

কিংকরের গলা শুনে মিলিন্দ সোজা হয়ে বসলো। সিঁথি পেরিয়ে বাঁ দিকে ঘুরে কাশীপুরের রাস্তায় কিছুটা এগিয়ে ডান হাতে বরানগরের সোজা রাস্তা। এ অভিযানের গাইড, কমান্ডার, কিংকর।

বরানগরের সেই তেমাথায় নির্দিষ্ট সিগারেটের দোকানের সামনে, পেছনে, পাঁচ সাত ফুটের তফাত রেখে একটা কালো, একটা ক্রিমরঙ এ্যাম্বাসাডার দাঁড়ালো। পেছনের ক্রিমরঙ এ্যাম্বাসাডার থেকে প্রথমে নামলো মজবুত, গাঁট্টাগোট্টা শরীর, কালো রঙ, কোঁকড়া চুল গঙ্গাধর। দেখেই বোঝা যায়, তার শক্তি, সাহস আছে। গঙ্গাধর নামতে দুটো গাড়ি থেকে দু'জন করে নেমে রাস্তার তিন পাশে ছড়িয়ে গেল। কালো এ্যাম্বাসাডার থেকে সব শেষে নামলো মিলিন্দ, কিংকর। মিলিন্দকে কিংকর

বলল, আজ তোর পাণ্ডিত্যের পরীক্ষা। অতনু টের পেয়ে গেলে কিন্তু আসবে না। যতো তাড়াতাড়ি পারিস, ওকে নিয়ে চলে আয়।

ডান দিকের রাস্তার শেষে ত্রিপলে ছাত ঢাকা সেই তিনতলা হলুদ বাড়িটা আবছা দেখতে পেল মিলিন্দ। মাত্র একটা ল্যাম্পপোস্টের টিমটিমে আলোয় রাস্তাটা ঘোলাটে দেখাচ্ছে। বোধহয় আজই বাঁধা হয়েছে ছাতের ম্যারাপ। লোহার গেট খুলে উঠোন পেরিয়ে গুটিগুটি বাড়ির সদর দরজার সামনে এসে দাঁড়াল মিলিন্দ। শক্ত, নীরেস কাঠের তৈরী দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। দরজার ঠিক মাথায় জালে ঘেরা অল্প পাওয়ারের একটা বাল্ব জ্বলছে।

মিলিন্দ দরজার কড়া নাড়তে পতিত বিশ্বাস দরজা খুলে কুঁতকুঁতে চোখে এক পলক দেখে প্রশ্ন করল, কী ব্যাপার ?

বুক ধড়াস ধড়াস করলেও সহজ গলায় মিলিন্দ বলল, অতনুর সঙ্গে দেখা করতে এলাম।

কেন ?

আমাদের তিন, চার জন বন্ধু কাল বরযাত্রী আসতে চাইছে।

কথাটার মাঝখানে ছেদ টেনে পতিতের মুখ দেখে মিলিন্দ বুঝলো, তার গুল লোকটা গিলেছে।

পতিত বলল, তোতার মার সঙ্গে কথা বলতে হবে।

ঠিক আছে।

পতিতকে আর কথার সুযোগ না দিয়ে চৌকাঠ টপকে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লো মিলিন্দ। একটু এগিয়ে বাঁ দিকে সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে যেতে পারলে সে পোঁছে যাবে অতনুর ঘরে। অতনুর ঘর মিলিন্দর চেনা। গতকাল সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সে ঘরে অতনুর সঙ্গে কিংকর, কল্যাণ, মিলিন্দ আড্ডা দিয়েছে। তপতী, ছেলেমেয়ে, দু'চারজন আত্মীয় নিয়ে বাড়ির তিনতলা দখল করেছে পতিতের বৌ। দোতলায় অতনুর পাশের ঘরে আছে পতিত আর তার এক বন্ধু। এই বন্ধুই নাকি বিয়ের পুরোহিত।

সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত ওপরে উঠলো মিলিন্দ। সিঁড়ির শেষ ধাপে একটা, আর দালানে একটা পা রেখে ট্যারা চোখ একটা লোক গল্প করছে তপতীর সঙ্গে। কালি-ঘাটের পটের মতো কাল যে নির্বাক দাঁড়িয়েছিল, আজ ট্যারা লোকটার কথায় সেই তপতী হেসে গড়িয়ে পড়ছে। এক নজরে তপতীকে চিনেও কথা বলল না মিলিন্দ। তাকে দেখে দোতলার দরজার মুখ থেকে সরে গেল তপতী। ট্যারা লোকটাকে পাশ কাটিয়ে অতনুর ঘরের দিকে এগিয়ে গেল মিলিন্দ। একটা কিছু আঁচ করে মিলিন্দর সঙ্গে দোতলায় উঠে এসেছে পতিত। অতনুর ঘরেও মিলিন্দর সঙ্গে ঢুকলো লোকটা।

আমার মতলব লোকটা কি ধরে ফেলেছে, মিলিন্দ ভাবলো।

অতনুকে পতিত বলল, তোমার আরো কয়েকজন বন্ধু বরযাত্রী আসতে চায়।

খুশিতে ঝলসে উঠলো অতনুর মুখ। মিলিন্দকে সে প্রশ্ন করল, কে কে আসতে চাইছে ?

দীপু, সুজিত, তরুণ, সুহৃদ।

আরো কিছু নাম মুখে এলেও থেমে গেল মিলিন্দ। আনন্দে আটখানা অতনু বলল, যারা আসতে চায় নিয়ে আসবি।

অতনুর কথা শুনে একটা মোক্ষম চাল ঝাড়লো মিলিন্দ। বলল, তা কি হয়? মেসোমশাই হলেন মেয়ের বাবা, কন্যাকর্তা, তাঁর অনুমতি ছাড়া।

বিনয়ে, শ্রদ্ধায় চুপ মেরে গেল মিলিন্দ। তার গলার স্বর, বিনম্র ভঙ্গি, মেসোমশাই শব্দে কাজ হলো। পতিতের কুঁতকুঁতে চোখের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি সরে গেল। বলল, পাঁচ, সাতজন বরযাত্রী আসতেই পারে। আসা উচিতও। তোতার মাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি।

পতিত যাবার আগেই ট্যারা লোকটাকে নিয়ে দরজার সামনে তপতী এসে দাঁড়াতে হাসিমুখে অতনু বলল, আমাদের জন্যে একটু চা।

তারপর ট্যারা লোকটাকে দেখিয়ে অতনু বলল, আমার মাসশ্বশুর?

মাসশ্বশুর শুনে কেলেঙ্কারি হচ্ছে জেনেও তার পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে গেল মিলিন্দ। দু'পা পিছিয়ে গেল লোকটা।

ঘাড় তুলে তপতীকে মিলিন্দ বলল, আমাকে কিন্তু দুধ ছাড়া চা দেবে।

হ্যাঁ, বাবুর লাল চা, অতনু বলল।

বাবু শব্দটা শুনে ঠোঁট টিপে হাসলো তপতী।

তপতীর সঙ্গে ট্যারা লোকটা চলে যেতে পতিতকে অতনু বলল, তোতার মাকে বরযাত্রীদের কথা বলার দরকার নেই। উনি আবার ব্যস্ত হয়ে পড়বেন।

ঠিক বলেছো।

পতিতের সায় দেওয়ার ভঙ্গিতে মিলিন্দর মনে হলো, তাকে আর অবিশ্বাস করছে না লোকটা। বাড়ির মধ্যে মিলিন্দ ঢুকে পড়ায় যে শব্দহীন উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল, কেটে যাচ্ছে। লোকদেখানো আরো দু' একটা আত্মীয়তার কথা বলে পতিতকে একেবারে জল করে দিল মিলিন্দ। সামান্য উসখুস করে পতিত বলল, তোমরা গল্প করো, আমি একটু দেখে শুনে আসি।

পতিত চলে যেতে মুচকি হেসে অতনু বলল, শ্বশুরমশাই-এর আফিম খাওয়ার সময় হয়েছে।

পতিত আফিম খায় শুনে অবাক হলো না মিলিন্দ। ক্যাম্পখাটে অতনুর বিছানায় পাশাপাশি বসলো দুজন। পাজামা গেঞ্জির ওপর একটা দামী কাশ্মীরী চাদর গায়ে জড়িয়েছে অতনু। দেওয়ালে কাঠের ব্র্যাকেটে ঝুলছে তার শার্ট, ট্রাউজার্স, নতুন কার্ডিগান। ব্র্যাকেটের নিচে মেঝেতে রয়েছে চামড়ার সুটকেস।

অতনু বলল, তোকে দেখে খুব ভালো লাগছে।

তারপর প্রশ্ন করল, বিয়ের ঘটনাটা শুনে বন্ধুরা কে, কী বলল?

সে সব শুনে লাভ নেই, মিলিন্দ বলল, আসলে আমার কিছু বলার আছে তোকে। গতকাল কিংকর, কল্যাণের সামনে যে কথাগুলো বলতে পারি নি, সেগুলো বলতেই আজ এসেছি।

দু'চোখে কৌতূহল, প্রশ্ন নিয়ে অতনু তাকাতে মিলিন্দ বলল, বন্ধুরা যে যাই বলুক, তোর মহত্ত্বে আমি মুগ্ধ। এ বিয়েতে আমার একশো ভাগ সমর্থন আছে। বন্ধুদের মধ্যে তুই সে নজির তৈরি করলি, আর কেউ পারতো না। আমার প্রীতি শুভেচ্ছা সবসময়ে তোর সঙ্গে থাকবে।

ছলছল দু'চোখে মিলিন্দর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে অতনু বলল, আমি জানতাম, বন্ধুরা কেউ না বুঝলেও তুই ঠিক বুঝতে পারবি আমাকে। অন্তত ভুল বুঝবিনা।

এক মুহূর্ত থেমে অতনু বলল, আরো একটা কথা মনে হচ্ছিল, তুই আজ আসবি।

আবছা হেসে মিলিন্দ বলল, আমিও টের পেয়েছিলাম, আমার সঙ্গে আড্ডা দেবার জন্যে অপেক্ষা করছিস তুই।

চা আসার আগেই পকেটের সিগারেটের প্যাকেট প্রায় খালি করে এনেছে মিলিন্দ।

বাজারের সবচেয়ে সস্তা, এবং সবচেয়ে কড়া সিগারেট খায় সে। অতনু একদম উল্টো। সবচেয়ে দামী, নরম ব্র্যান্ডের সিগারেট ছাড়া তার চলে না।

সহজ হবার চেষ্টা করেও জমাট চাপে মিলিন্দর শরীরের স্নায়ু শিরা ধনুকের ছিলার মতো টানটান হয়ে আছে। একটা আনাড়ি ঘা লাগলেই কটাং করে ছিলা ছিঁড়ে যাবে।

তপতীর বদলে সেই ট্যারা মাসশ্বশুর দু'কাপ চা নিয়ে ঠক করে ঘরের মেঝেতে রেখে চলে গেল। লোকটার মুখ দেখে মিলিন্দর মনে হলো, তার প্রণামের অভিনয়, চোখের ত্রুটি থাকলেও মাসশ্বশুর ধরে ফেলেছে। কাপদুটো হাতে তুলে অতনু বলল, দ্যাখো কাণ্ড, দু'কাপেই দুধ।

চা-এ চুমুক দিয়ে অতনু প্রশ্ন করল, কমলকলির খবর কী?

চব্বিশ ঘণ্টা আগের ভয়ংকর কিছু টুকরো দৃশ্য মনে পড়তে চমকে গেল মিলিন্দ। তারপর বলল, কমলকলি ভালো। কিন্তু তার বোন কনকলতার খুব বিপদ।

কী হয়েছে?

মিলিন্দর মুখে সংক্ষেপে ঘটনা শুনে অতনু বলল, কী বাজে ব্যাপার।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে অতনু প্রশ্ন করল, তোর কি মনে হয় পুলকেশই দায়ী?

বুঝতে পারছি না।

কনকলতার কী হবে?

জানি না।

তোতার সঙ্গে প্রেম না হলে, কনকলতাকে বিয়ে করতাম আমি।

অতনুর কথা শুনে ধক করে উঠলো মিলিন্দর বুক। কী বলছে অতনু? ঘরের বাইরে ফিসফিস কথা, পায়ের শব্দ, কারা যেন নজর রাখছে। এই শত্রুশিবির থেকে পালাবার বাসনা প্রবল হলো মিলিন্দর। বাইরে ঘন অন্ধকার। দুই অচেনা মহিলা দরজার বাইরে থেকে উঁকি দিয়ে অতনু, মিলিন্দকে দেখে গেল। সিগারেটের

খালি প্যাকেট ঘরের কোনে ছ্বঁড়ে দিয়ে মিলিন্দ বলল, সিগারেট না খেয়ে হাঁপিয়ে উঠছি।

সিগারেটের অভাব নেই।

কথাটা বলে দেওয়ালের ব্র্যাকেটে ঝোলানো পাঞ্জাবির পকেট থেকে দামী সিগারেটের নতুন প্যাকেট্ বার করে অতন্ব যোগ করল, কুড়ি প্যাকেট মজ্বত আছে।

অতন্বর দ্বটো সিগারেট ইতিমধ্যে মিলিন্দ খেয়েছে। নতুন প্যাকেট্ দেখে ব্যাজার ম্বখে সে বলল, চলবে না। নিজের ব্র্যান্ড চাই।

আনিয়ে দিচ্ছি, অতন্ব বলল।

কে যাবে ?

শ্বশ্বর আছে, মাসশ্বশ্বর আছে। তোতার এক মামাও এসে গেছে। দরকার হলে শাশ্বড়িকে পাঠাবো।

জবাব শ্বনে জিভ কেটে মিলিন্দ বলল, ছি ছি, ওরা বয়স্ক, গ্বর্বজন, আমি যাচ্ছি।

মিলিন্দ এ ভাষায় কথা বলে না। তাই অবাক চোখে এক লহমা তাকে দেখে অতন্ব বলল, চল, আমিও যাচ্ছি। একনাগাড়ে বাড়িতে বসে হাঁপিয়ে উঠেছি। হাত, পা'র খিল ভাঙতে একট্ব হাঁটা দরকার।

মাছ টোপ গিলছে। বঁড়শিটা গলায় আরো শক্ত করে গাঁথার জন্যে মিলিন্দ বলল, তোর যাওয়ার কী দরকার ? আমি যাবো, আর আসবো।

মিলিন্দ যা ভেবেছিল, তাই হলো। সে নিষেধ করতে অতন্ব বলল, সেজন্যেই যাচ্ছি। এখন বাইরে বেশি সময় আমিও থাকবো না। থাকলে এরা ভয় পাবে।

মিলিন্দ কথা বাড়ালো না। অতন্ব যা টলমলে মনের ছেলে, আবার বারণ করলে হয়তো বেরোবে না। এমনিতে দেরি হয়ে গেছে। বাইরে সিগারেট দোকানের চারপাশে দ্বটো গাড়ি নিয়ে বন্ধ্বরা অপেক্ষা করছে। মিলিন্দর দেরি দেখে, অধৈর্যে অস্থির বন্ধ্বরা হয়তো সদলে এখানে চড়াও হবে। সে হট্টগোল সামাল দেওয়া যাবে না। পতিত বিশ্বাসের পক্ষ নিয়ে হয়তো অতন্বও বেঁকে বসবে। অতন্বর সম্পর্কে আগাম কিছ্ব বলা খ্ব্ব ম্বশকিল।

চল, বেরোই।

ক্যাম্প্খাট ছেড়ে উঠে অতন্ব কথাটা বলতে মিলিন্দ বলল, একটা জামা পড়ে নে।

দরকার নেই, চাদর আছে।

উত্তেজনায় কইমাছের মতো খাবি খাচ্ছে মিলিন্দর হৃৎপিণ্ড। রক্তের গভীরে ঘ্বরছে সাবমেরিনের প্রপেলার। পাঞ্জাবির পকেটে হাত প্বরে চমকে উঠলো মিলিন্দ। নতুন সিগারেটের প্যাকেট রয়েছে। হাতটা চট করে বার করে নিল পকেট থেকে। ঘর ছেড়ে দালানে এসে গ্রিলের বাইরে ঘন অন্ধকারে ল্যাম্পপোস্টের আলো দেখল মিলিন্দ। ফাঁকা দালানে পতিত, সেই ট্যারা লোকটা বা বাড়ির কেউ নেই। মিলিন্দর মনে হলো, এ খেলায় জিতে যাবে সে। এ জয়ের পরে হয়তো আরো একটা বড়ো খেলা, বড়ো জয়ের নক্সা করতে হবে তাকে।

দালানের দ্ব'পাশে ম্বখোম্বখি পাঁচ, ছ'টা ঘর। সব ঘরেই আলো, লোকজন

আছে। কিন্তু ঘরগুলো সিঁড়ির বাঁ দিকে। অতনু, আর যে ঘরে পতিত আছে, সে দুটো ঘর সিঁড়ির ডানদিকে। ফলে একতলায় নামার সময় কেউ দেখলো না তাদের। একতলার উঠোনে ভিয়েন বসেছে। কাঠের বারকোসে ছানা মাখছে একজন। উঠোনের ডান দিকে ছাদনাতলায় বিয়ের উপকরণ, কলাগাছ, ডাব, মঙ্গলঘট, আরো নানা জিনিস জড়ো করা রয়েছে।

অতনু বলল, বিয়ের খরচ পনেরো হাজার টাকা শ্বশুরকে দিয়েছি আমি।

অবাক হলেও কথা বলল না মিলিন্দ। একতলায় ছাদনাতলার পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে ঘোমটা ঢাকা এক মহিলা সিঁড়ির দিকে চলে গেল। গুড়গুড় করছে মিলিন্দর বুক। গলা শুকিয়ে কাঠ। রাস্তার তেমাথায় না পোঁছোনো পর্যন্ত সাবলীল হবে না তার হৃদযন্ত্র, শ্বাসপ্রশ্বাস। এখন পতিত বা ট্যারা লোকটা অতনুকে আটকে দিয়ে বলতে পারে, কাল যার বিয়ে, আজ তার বার হবার দরকার নেই, এ অশাস্ত্রীয় কাজ।

তাদের রায় মেনে নেবে অতনু। গেট খুলে অন্ধকার রাস্তায় কিছুটা এগিয়েই ভূত দেখার মতো চমকে উঠলো মিলিন্দ। একটা থলি হাতে দোকান থেকে ফিরছে পতিত। মিলিন্দর সঙ্গে রাস্তায় অতনুকে দেখে রোগা, কালো লোকটার দু'চোখ স্থির, নিস্পন্দ হয়ে গেল। পতিত বা অতনুকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে মিলিন্দ বলল, আমার বন্ধু সারাদিন ঘরে বসে হাঁপিয়ে উঠেছে। ওকে নিয়ে তাই একটু হাওয়া খাচ্ছি। দূরে কোথাও যাবো না মেসোমশাই, এখানেই আছি।

কিছু বলতে গিয়ে অতনুর মুখ দেখে চুপ করে গেল পতিত। মিলিন্দর কথায় সায় দিয়ে অতনু বলল, হ্যাঁ, এখানেই আছি।

অতনুর কথার পরেও পতিতের হাঁটার তাড়াহুড়ো দেখে মিলিন্দ বুঝলো, বাড়িতে থলি রেখে এখনই ফিরে আসবে লোকটা। তারপর গুড়ের কলসীতে লেপ্টে থাকা মাছির মতো তাদের সঙ্গ ছাড়বে না। আরো একটা কথা মিলিন্দর মনে হলো। দোকানে যাওয়া, আসার সময়ে রাস্তার মুখে দুটো গাড়ি, কমবয়সী অচেনা কিছু মুখ নজর করে থাকলে, একা ফিরতে না পতিত। বাড়ির সকলকে জড়ো করে নিয়ে আসবে। পতিতের বৌ একাই একশো। সে এমন হুলস্থুল জুড়বে যে, হয়তো মার খেয়ে বাড়ি ফিরবে সবাই। হাওয়া খারাপ বুঝলে গাড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে পুরো ঘটনা পাবলিককে জানিয়ে একটা জ্বালাময়ী বক্তৃতা ঝেড়ে দেবে মিলিন্দ। দীপু, সুজিত, সুহৃদের সঙ্গে কিংকর, কল্যাণের চেনা মুখ পতিত দেখে থাকলে।

আর ভাবতে পারছে না মিলিন্দ। তার হাঁটার গতি বেড়ে গেল। মিলিন্দর সঙ্গে পা মিলিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অতনু বলল, তুই এমন হনহন করে হাঁটছিস, মনে হচ্ছে, অফিস টাইম উতরে গেল।

অতনুর রসিকতার জবাব না দিলেও মিলিন্দর হাঁটা মন্থর হলো না। তেমাথার আলো, সিগারেটের দোকান, কিছু মানুষ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বন্ধুরাও নিশ্চয় ওৎ পেতে অপেক্ষা করছে। আধ ঘণ্টা হয়ে গেল, তাদের ছেড়ে মিলিন্দ বিয়েবাড়িতে অতনুর কাছে গেছে। এই অচেনা পাড়ায় দল বেঁধে আধঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে সাহসী লোকও ভয় পাবে। তবে একটা ভরসা, এ পাড়ার ছেলে গঙ্গাধর সঙ্গে আছে।

আচমকা কোনো বিপদ হবে না। সিগারেট দোকানের প্রায় সামনে এসে পেছনে তাকিয়ে অল্প আলোয় বিয়েবাড়ির গেটে পতিত আর সেই ট্যারা লোকটাকে দেখল মিলিন্দ। তারা দাঁড়িয়ে, না গেট খুলে হাঁটতে শুরু করেছে, বুঝতে পারলো না সে।

পাজামার পকেট থেকে মানিব্যাগ বার করে সিগারেটের দোকানে অতনু বলল, চারমিনার এক প্যাকেট।

কোনোদিকে না তাকিয়ে রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনায় অতনুর পাশে দাঁত টিপে দাঁড়িয়ে আছে মিলিন্দ। অতনু একটা পাঁচটাকার নোট দোকানদারকে দিয়ে সিগারেটের প্যাকেট নেবার আগেই তার হাত একটা শক্ত মুঠোয় জমা পড়লো। চমকে ঘাড় ঘুরিয়ে একপাশে সুজিত আর একপাশে দীপুকে দেখলো অতনু। লোহার মত শক্ত মুঠোয় দীপু ধরেছে অতনুর হাত। দীপুর নাকের তলায় কালো মোটা শুঁয়োপোকার মতো গোঁফের সব রোম খাড়া হয়ে উঠেছে, ঝকঝক করছে দুচোখের মণি! সুজিতের হাতে একটা ঝকঝকে খোলা ছুরি। ছুরির ডগা অতনুর কোমরে ঠেকিয়ে সুজিত বলল, কোনো কথা নয়, গাড়িতে গিয়ে ওঠ্।

দোকান থেকে সিগারেটের প্যাকেট, বাকি টাকা নিয়ে এক নিদারুণ ঝামেলার আশঙ্কায় মিলিন্দ ঘামছে। গোলমাল পাকিয়ে অতনু এখন লোকজন জড়ো করলে পালাবার পথ নেই। গঙ্গাধর কতোটা বাঁচাতে পারবে, কে জানে! পাবলিকের ঝাড়, দুনিয়ার বার। কিন্তু কী আশ্চর্য, কিছুই হলো না! টুঁ শব্দ না করে সুজিতের কালো এ্যাম্বাসাডারে ঢুকে পেছনের সিটে অতনু বসতে তার দু'পাশে দীপু, কিংকর সেঁটে গেল। মিলিন্দ বসলো সামনে, সুজিতের পাশে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সকলকে তুলে একসঙ্গে ছেড়ে দিল দুটো গাড়ি। বিনা ঝামেলায়, চুপচাপ, এভাবে কাজ হাসিল হবে, মিলিন্দ কেন, কেউই ভাবে নি। দুটো গাড়ি পরপর হুসহুস করে বেরিয়ে যাবার মুহূর্তে পতিত আর ট্যারা লোকটার এক জোড়া হতভম্ব মুখ রাস্তার তেমাথায় পলকের জন্যে দেখল মিলিন্দ।

ফাঁকা রাস্তায় ঝড়ের গতিতে দুটো গাড়ি আধঘণ্টায় কলেজ ষ্ট্রিটে সুজিতের বাড়ির সামনে পৌঁছে গেল। রাত আটটাও বাজে নি। রাস্তায় মানুষের ছড়াছড়ি। গাড়িতে বসেই ঠিক হয়েছে পরশু পর্যন্ত সুজিতের বাড়িতে অতনু থাকবে। তারপর অতনুর দু' দাদা যা বলবে, তাই হবে। গাড়িতে সারা পথ, কী হচ্ছে, টের পেয়েও একটা কথা বলে নি অতনু। মিলিন্দও চুপচাপ বসেছিল। নাহ্, ঠিক চুপ নয়, বিবেকের কামড়, বিষাদে একটার পর একটা সিগারেট টেনে গেছে। জয়ের আনন্দের চেয়েও কতোটা ঠিক কাজ করল, ভেবেছে। অতনুর দিকে লজ্জায় ফিরে তাকাতে পারে নি। তাকে কী ভাবছে অতনু? বেইমান, বিশ্বাসঘাতক? শব্দ দুটো মিলিন্দর মাথায় বারবার আলপিনের খোঁচা দিয়েছে।

অতনুকে নিয়ে সুজিত সদলে দোতলায় নিজের ঘরে এলো। সবার পেছনে মিলিন্দ। অতনুর চোখের আড়ালে থাকতে চাইছে সে। জমাট উত্তেজনা এখনও কাটে নি। সবাই চুপ। বুকচাপা পরিবেশ হালকা করার জন্যে অতনুকে সুজিত প্রশ্ন করল, কেমন লাগছে?

উজ্জ্বল, বোকা চোখে সুজিতের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে অতনু বলল, খুব বেঁচে গেছি।

অতনুর কথায় শব্দহীন বাজ পড়লো ঘরে। মিলিন্দ হতবাক। অতনু বলল, নতুন কার্ডিগানটার কী হবে?

কিংকর বিড়বিড় করল, শালা, শুয়ার।

ইন্দ্রাণীর বাড়ির সামনে মিলিন্দ যখন এসে দাঁড়ালো, অন্ধকারে ডুবে গেছে চারপাশ। হাত ঘড়িতে মিলিন্দ দেখল ছ'টা পঁচিশ। পাঁচ মিনিট আগেই ইন্দ্রাণীর বাড়িতে পেঁছে গেছে সে। বাড়ির গেটে মৃণালের দাঁড়াবার কথা। সে নেই। বন্ধ গেটের ভেতরে একটা সাদা এ্যাম্বাসাডার গাড়িতে ড্রাইভারের জ্বলন্ত বিড়ির আগুন জোনাকির আলোর মতো জ্বলছে, নিভছে। বাড়ির ভেতরে আলো জ্বললেও বাইরে অন্ধকার। বিরাট বাড়ি নিঃশব্দ। মানুষের গলা, হাঁটাচলার আওয়াজ নেই। কিংকরের আসার কথা ছিল। সেও এসে পেঁীছোয় নি। গেটের সামনে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে রাস্তার উল্টো ফুটে সিগারেটের দোকানের দিকে এগিয়ে গেল মিলিন্দ। তার পাঞ্জাবির পকেটে কমলকলির চিঠি। সাড়ে ছটার মধ্যে ইন্দ্রাণীর বাড়িতে আসার কথা চিঠিতে লিখেছে কমলকলি।

গতকাল বিকেলে পাঁচটা নাগাদ রূপান্তরের ঘরে ভিড়, আড্ডা যখন জমে উঠেছে, মিলিন্দকে রাস্তায় ডেকে খামে মোড়া একটা চিঠি দিয়ে মিঠু বলেছিল, দিদির চিঠি।

হালকা লেফাফাটা হাতে নিয়ে অবাক মিলিন্দর বুক কৌতূহলে ধুকপুক করছিল। মিঠু চলে যেতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে মিলিন্দ ভেবেছিল, কমলকলি হঠাৎ চিঠি লিখলো কেন? কী লিখেছে চিঠিতে?

নিরিবিলিতে একা দাঁড়িয়ে তখনই চিঠিটা পড়ে ফেলার জন্যে রাস্তা ধরে মানিকতলার দিকে সামান্য এগিয়ে গগনের চায়ের দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালো সে। এটা ঠিক দোকান নয়, টিনের চালা ঝুপড়ি। ভেতরে বসার ব্যবস্থা নেই। রূপান্তরের ঘরে এখান থেকে রোজ বিকেলে দশ, বিশ কাপ চা যায়। দুধ ছাড়া এক কাপ চা দিতে বলে গাড়িবারান্দাওলা লাল বাড়ির নিচে দাঁড়িয়ে চিঠিটা খুললো সে। চাপা উত্তেজনা তার মাথা, বুক ছুঁয়ে, গুড়গুড় শব্দ তুলে পা পর্যন্ত নেমে আবার মাথায় ফিরে আসছে। সাদা কাগজে কালো কালির বাঁকা হরফে লেখা কমলকলির কয়েক লাইনের ছোট চিঠি এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেললো সে। কমলকলি লিখেছে. কাল সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টার মধ্যে কিংকরদাকে নিয়ে ইন্দ্রানীর বাড়িতে চলে এসো। মৃণালও আসবে। জরুরী দরকার। আসা চাই।

দু'তিনবার পড়েও হেঁয়ালি মার্কা চিঠির মাথামুণ্ডু বুঝতে পারেনি মিলিন্দ। লোকজন জুটিয়ে একটা হৈচৈ করার ফন্দী এটেছে কমলকলি। সেটা কি? চা-এ

মনে মনে কিছুক্ষণ ভেবে মিলিন্দ ঠিক করল, বাড়ি ফিরে মৃণালকে একটা ফোন করবে। মৃণালের সঙ্গে কথা বলে ফোনে ধরবে কিংকরকে।

কিংকর এখন খুব ব্যস্ত। রূপান্তরের ঘরে হপ্তায় দু'তিন দিনের বেশি আসতে পারে না। আজ আসার কথা। গত কয়েক মাসে রূপান্তর সাংস্কৃতিক সংস্থার জনপ্রিয়তা বেড়েছে। সারা বাংলা একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় রূপান্তর প্রথম হবার পর এটা শুরু হয়েছিল।

প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ পরিচালক, শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সম্মান পেয়েছিল কিংকর। সংবাদপত্রে, লোকমুখে কিংকর এতো প্রচার পেল যে, রূপান্তর-এর সদস্য হবার জন্যে ভিড় লেগে গেল। সেই সঙ্গে নাটক করার বায়না আসতে লাগলো মফস্বল আর শহরতলি থেকে। কাঁচরাপাড়া, ডানকুনি, মেদিনীপুরে গত দু'মাসে তিনটে চ্যারিটি শো করেছে রূপান্তর গোষ্ঠী। যাতায়াতের খরচ আর এক টাকা পারিশ্রমিক ছাড়া রূপান্তর কিছু নেয়নি। মাসখানেক আগে এক বিখ্যাত চিত্রপরিচালক তার নতুন ছবির নায়ক মনোনীত করেছে কিংকরকে। খবরটা সংবাদপত্রে বেরোতে আরও চার, পাঁচ জন চিত্রপরিচালক নায়কের অফার কিংকরকে দিয়েছিল। কিন্তু চুক্তি অনুযায়ী প্রথম ছবি শেষ না করে নতুন কাজ নিতে পারবে না সে। এ চুক্তিতে অখুশি নয় কিংকর। ছবির চেয়ে নাটক করায় তার বেশি আগ্রহ। তাছাড়া অভিনয়, মঞ্চকলা প্রশিক্ষণের জন্যে পূর্ব জার্মানী থেকে তিন বছরের একটা স্কলারশিপ পেয়েছে সে। আগামী বছর তাকে দেশের বাইরে চলে যেতে হবে। ফলে নতুন কোনো কাজের চুক্তি সে এখন করতে চায় না। খ্যাতিমান পরিচালকের একটা ছবি করেই জার্মানি পাড়ি দেবে। কানাঘুষোয় মিলিন্দ জেনেছে, যে, এই পরিচালকের যোগাযোগেই স্কলারশিপটা পেয়েছে কিংকর। যোগ্য লোকই পেয়েছে, মিলিন্দর সন্দেহ নেই। এ মুহূর্তে প্রথম ছবি শেষ করার জন্যে তন্ময় হয়ে কাজ করছে কিংকর। কাজের ধকলে এমন ক্লান্ত থাকে যে রূপান্তর-এর নতুন নাটকের মহড়ায় শনি, রবিবার ছাড়া সময় দিতে পারে না। মিলিন্দ বুঝতে পেরেছে, আরো সফল, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে কিংকর। খুব বেশিদিন রূপান্তর-এ ধরে রাখা যাবে না তাকে। অতনুর বিয়ে ভেঙে যাবার সাত, দশ দিন পরে তাকে নিয়ে একদিন কমলকলির বাড়িতে গিয়েছিল মিলিন্দ। কনকলতাকে বিয়ে করার জন্যে এক পায়ে খাড়া ছিল অতনু। কিন্তু নানা কথা, গল্পের পরেও কনকলতার বিষয়ে কমলকলির সামনে মিলিন্দ মুখ খুলতে পারেনি। জড়তা, সঙ্কোচ আচ্ছন্ন করে ছিল তাকে। তারপর এক মাসের মধ্যে ফুটফুটে সুন্দরী ষোল বছরের একটি মেয়ের সঙ্গে অতনুর বিয়ে হলো। বিয়ে দিল তার বড়োবৌদি। নতুন বৌ নিয়ে একুশ বছরের অতনু এমন মশগুল, ব্যস্ত, যে গত দু'মাসে মাত্র তিনদিন রূপান্তর-এ এসেছে সে। সবচেয়ে বিস্ময় ঘটনা, বিপুল ব্যবসায়ী ধনী পরিবারের ছেলে কল্যান এখন চন্দনের দলে গভীরভাবে জড়িয়ে গেছে। দলের সভা, সমিতি, মিছিল ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না তাকে। রূপান্তর-এর ঘরেও তার হাজিরা অনিয়মিত। ফলে রূপান্তর-এর মূল দায়িত্ব চেপেছে মিলিন্দর ওপর। গতকাল বিকেলে কমলকলির চিঠি নিয়ে আলোচনা

করার মতো হাতের কাছে কাউকে পেল না মিলিন্দ। ইন্দ্রানীর বাড়িতে কিংকরকে নিয়ে যেতে হলে, তাকে ধরা দরকার। ফোন করা ছাড়া উপায় নেই।

ইন্দ্রানীর বাড়ির উল্টোদিকের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে মিলিন্দ। সামনের রাস্তায় হঠাৎ হুড়মুড় করে একটা মিছিল এসে গেল। মিছিলে স্লোগান নেলসন ম্যান্ডেলার মুক্তি চাই। পশ্চিমবাংলার নেলসন ম্যান্ডেলা, আজিজুল হকের মুক্তি চাই। নদীয়া, তারাতলা, মগরা, কুচবিহারে পুলিশী হত্যার তদন্ত চাই।

মিছিলের সামনে চন্দন, কল্যাণ, কয়েকজন পরিচিত অধ্যাপকের মধ্যে মৌলানা আজাদ কলেজের অধ্যাপক শৈবাল মিত্রকেও দেখতে পেল মিলিন্দ। চন্দনের বাঁ পাশে নবনীতাকে দেখে সবচেয়ে বেশি অবাক হলো মিলিন্দ। মিছিলে নবনীতাকে দেখা কল্পনা করতে পারেনি। লজ্জায়, সঙ্কোচে লুকিয়ে পড়ার জন্যে একটা আড়াল খুঁজছে সে। এই মিছিলে আসার জন্যে সাতদিন আগে তাকে বলেছিল চন্দন। তারপর আরও দু'তিনবার বলেছে। সিধুকানু ডহরে মিছিলের পর সমাবেশে মিলিন্দকে বক্তৃতা দেওয়ার অনুরোধ করেছিল চন্দন। মিলিন্দ কথা দিয়েছিল মিছিলে যাবে, বক্তৃতা করবে। চন্দন বলেছিল, তোরা এলে ভরসা পাই। এ রাজ্যে এমন এক রাজনৈতিক দুঃসময়, তান্ডব চলেছে, যে আমরা সভা, মিছিল করলে শাসক পার্টি, তথাকথিত বাম গণতন্ত্রীরা ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী দিয়ে আমাদের পেটাচ্ছে। লাঠি সোটা, ডান্ডা, ভোজালির সঙ্গে পুলিশের চোখের সামনে রিভলভর, পিস্তল ব্যবহার করছে। আমরা মার খাচ্ছি। কিন্তু খুব বেশিদিন এ গাজোয়ারি, গুন্ডামি চলবে না।

সিগারেট দোকানের ঝাঁপের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়ানো মিলিন্দকে না দেখে মিছিল নিয়ে চন্দন, কল্যাণ চলে গেল। কথা না রাখার জন্যে এক গোপন গ্লানি অপরাধবোধে কুঁকড়ে গেল মিলিন্দ। এখনও কেন কমলকলি নামে এক আলেয়ার পেছনে নেশাতুরের মতো সে ছুটে বেড়াচ্ছে, জানে না। অথচ অনেক চেষ্টাতেও সরে আসতে পারছে না।

দু'মাস আগের সেই লোমহর্ষক সন্ধ্যের পর থেকে কমলকলিকে দেখে আড়ষ্ট হয়ে যায় মিলিন্দ। গত দু'মাসে সে তিন, চার বার কমলকলির বাড়িতে গেছে। প্রথম গিয়েছিল অতনুকে নিয়ে। কলঙ্ক, দুর্ভোগ থেকে কনকলতাকে স্বাভাবিক সুস্থ জীবনে অতনু ফিরিয়ে আনবে, এ কথাটা চেষ্টা করেও কমলকলিকে বলতে পারে নি। না বলার কারণ, ভয় নয়, সঙ্কোচ। নিজের বোন সম্পর্কে কমলকলি যখন নীরব, চুপ, তখন গায়ে পড়ে সে প্রসঙ্গ তুলতে মিলিন্দর রুচিতে বেঁধেছিল। অতনুও মুখ খোলেনি। রাস্তায়, রুপান্তর-এর ঘরেও যে ক'বার দেখা হয়েছে, কনকলতার নাম মুখে আনেনি কমলকলি। নানা কথা, আড্ডা, হাসি গল্পে ঝিকমিক করেছে তার দু'চোখের কালো তারা। সেই সন্ধ্যে, ছোট বোন, কনকলতা, পুলকেশ, সব যেন কমলকলির স্মৃতি থেকে শীতের পাতার মতো ঝরে গেছে। ঝরা পাতা নিজের জায়গায় আর কখনও ফিরবে না। পুলকেশও কলেজে আসে

না অনেকদিন। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে গুজব, কঠিন অসুখের চিকিৎসা করাতে আমেরিকায় গেছে সে। কমলকলির বাড়িতেও অদ্ভুত অবস্থা।

কমলকলির বাবা, মা, ভাইবোনদের নজরে পড়লেও কনকলতাকে একদিনও দেখেনি মিলিন্দ। মেয়েটা যেন কর্পূরের মতো উবে গেছে। পুলকেশের সঙ্গে কনকলতাও কি আমেরিকায় চলে গেল? প্রশ্নটা মনে খোঁচালেও কমলকলিকে করার সাহস পায় নি সে। প্রশ্ন করার ইচ্ছে মরে গিয়েছিল তার। কিন্তু কমলকলির মুখ, কৌতুক, বিষাদে ভরা দুটো গভীর, ঝকঝকে চোখ, ঝর্ণার শব্দের মতো হাসি, মিলিন্দ ভুলতে পারে না। তার কাছে ছুটে যাবার প্রবল তাগিদে প্রায়ই ছটফট করতে থাকে। মিলিন্দ বুঝতে পারে, তার বাস্তবে, কল্পনায়, রক্তে, অস্তিত্বে, জলের সঙ্গে নুনের মতো কমলকলি মিশে গেছে। এই নুনজলের নামই বোধহয় অশ্রু, জীবন, মহাসমুদ্র।

গগনের দোকানে চায়ের পয়সা দিয়ে কাল সন্ধ্যের পর, রূপান্তর-এর ঘরে মিলিন্দ আবার ফেরার পাঁচ মিনিট আগেই সেখানে এসে গিয়েছিল কিংকর। বারাসতে ছবির আউটডোর কাজ শেষ করে সোজা রূপান্তর-এ চলে এসেছে সে। তাকে দেখে একটু স্বস্তি পেয়েছিল মিলিন্দ। আধঘণ্টা পরে ঘরে তালা লাগিয়ে বিবেকানন্দ রোডের একটা চা দোকানে এসে বসেছিল দু'জন। দু'কাপ চা টেবিলে আসার পর, পকেট থেকে কমলকলির চিঠিটা বার করে কিংকরকে দিল মিলিন্দ। চিঠি পড়ে কিংকরের তামাটে কপালে সুতোর মতো সরু কয়েকটা রেখা জাগলো। মিলিন্দর চোখে চোখ রেখে কিংকর প্রশ্ন করল, কী হতে পারে?

বুঝতে পারছি না, মিলিন্দ বলেছিল।

কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ থেকে কিংকর বলল, কাল সাড়ে ছ'টার মধ্যে পৌঁছে যাবো আমি।

মিছিল চলে যাবার পর দোকানের পাশ থেকে রাস্তায় এসে দাঁড়ালো মিলিন্দ। আবছা স্লোগান ভেসে আসছে দূর থেকে। চন্দনের সঙ্গে কল্যাণ, নবনীতা জুটলো কীভাবে, ভেবে পাচ্ছে না মিলিন্দ। কিন্তু দু'জনের মুখ চোখে এতো তৃপ্তি, মহিমা সে দেখেছে, যে তার বুকে তুফান বইছে। সিগারেটে শেষ টান মেরে জ্বলন্ত টুকরোটা হাইড্রেন্টে ছুঁড়ে দিয়ে চোখ তুলে সে দেখতে পেল মৃণালকে। শালপাতার বড়ো একটা প্যাকেট হাতে বাজারের দিক থেকে গলিতে ঢুকলো মৃণাল। মিলিন্দকে দেখে মৃণাল প্রশ্ন করল, কিংকর কোথায়?

খবর তো দিয়েছি, মিলিন্দ বলল।

মৃণালের হাতের সুতো জড়ানো শালপাতার মোড়ক থেকে ফুলের মিষ্টি গন্ধ আসছে। মিলিন্দ ভাবলো, এতো ফুল কেন?

ইন্দ্রানীর বাড়ির গেটে এসে মৃণাল বলল, ভেতরে আয়।

কিংকরের জন্যে আমি দাঁড়াই।

ঠিক আছে।

কথাটা বলে ফুলের ঠোঙা হাতে তড়িঘড়ি বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল মৃণাল।

কমলকলির জরুরী তলব, ফুলের ঠোঙা, মাথায় হাজার প্রশ্ন, কোনোটার নাগাল পেল না মিলিন্দ। একটা ট্যাক্সি সামনে এসে দাঁড়াতে ভেতর থেকে নেমে এলো কিংকর। বলল, স্টুডিওতে আটকে গিয়ে দেরি হলো। তারপর রাস্তায় মিছিল।

এক সেকেন্ড মিলিন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে কিংকর বলল, মিছিলের সামনে কল্যাণ, নবনীতাকে দেখলাম। এসব করে কী যে হবে!

মিলিন্দ কথা বলল না।

মৃণাল কোথায়?

কিংকর প্রশ্ন করতে মিলিন্দ বলল, বাড়ির ভেতরে।

ব্যাপারটা কী?

জানি না।

এক অশুভ অনুভূতি মিলিন্দর মনে ছড়িয়ে পড়ছে। সকাল থেকেই আজ দিনটা খারাপ। সকালে লেখাপড়া নিয়ে বাবার সঙ্গে খিটিমিটি ঝগড়া হয়েছে তার। সারাদিন বাউন্ডুলের মতো ঘুরে মাঝরাত পার করে ঘরের আলো জেবলে সে কী পড়ে, বাবা জানে না। কিন্তু পরীক্ষার পড়া নয়, বাবা বুঝতে পারে। তিনমাস পরে বি-এ ফাইনাল পরীক্ষা তার। এখনই শুরু না করলে আর কবে করবে সে? মিলিন্দ জানে, তার অনুপস্থিতিতে তার পড়ার টেবিলে বই-এর গাদা ঘেঁটে একটাও পাঠ্যবই না দেখে বাবা চটে আছে। সত্যিকথা বলতে কি, সব পাঠ্যবই-এর নাম এখনও মিলিন্দ জানে না। বাবার ধারনা, পার্ট ওয়ান অনার্সে ফাঁকতালে সে ফার্স্ট-ক্লাস পেলেও পার্ট টুতে ভরাডুবি হবে। বাবার ধারণা যে অমূলক নয়, এমন আশংকা মিলিন্দরও হয়েছে। গত সাত, আট মাসে একটা পাঠ্যবই কেন, নতুন কেনা অনেকগুলো পেপারব্যাকও পাতা উল্টে দেখার সময় পায়নি সে। জন্মদিনে নবনীতার দেওয়া বইদুটোতেও ধুলো জমেছে। নতুন বই কেনার নেশাও কমে গেছে তার। তিন মাস আগে একটা প্রদর্শনী বিতর্কে সে এতো খারাপ বলেছিল, যে শ্রোতারা ছ্যা ছ্যা করেছে। বিতর্ক প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা, কোথাও আর যেতে ইচ্ছে করে না তার। মাথার মধ্যে যুক্তি, শ্লেষের সেই বিদ্যুৎচমক, জিভের ডগায় তীক্ষ্ণ, তীব্র, ধারালো শব্দপ্রবাহ, সব যেন থেমে গেছে। মাথা, জিভ অসাড়, ভোঁতা। কথা জড়িয়ে যায়। কেন এমন হলো, মিলিন্দ জানে না। যে মিলিন্দ বোস, মিলিন্দ দ্য গ্রেট্ তুড়ি মেরে দুনিয়া জয় করার স্বপ্ন দেখতো, সে এখন নিজেকে পরাজিত, বিধ্বস্ত ভাবে। মঞ্চে উঠতে বুক কাঁপে তার। দীর্ঘলালিত তার অগাধ আত্ম-বিশ্বাসের ভিত নড়ে গেছে।

এ পর্যন্ত কলেজে ক্লাসের সব পরীক্ষায় সে ছিল অদ্বিতীয়, তার ধারে কাছে ঘেঁসতে পারতো না কেউ। অথচ টেস্ট্ পরীক্ষায় প্রথম পাঁচজনের মধ্যে জায়গা হয়নি তার। যে অভিজিতকে লেখাপড়ায় প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে সে কখনো পাত্তা দেয়নি, সেই ছেলে ফার্স্ট্ হয়েছে টেস্টে। মিলিন্দ বুঝতে পারছে, লম্বা এক দৌড়যুদ্ধে অনেক এগিয়ে থেকেও পেছিয়ে পড়ছে সে। শুরু হয়েছে তার পশ্চাদাপসরনের পালা। অসহায়তা, হতাশা আচ্ছন্ন করছে তাকে।

কিংকর চুপচাপ সিগারেট টানছে। বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে মৃণাল বলল, সব রেডি, কমলকলিকে নিয়ে ইন্দ্রানী আর গায়ত্রী আসছে। ওরা তিনজন আর আমরা যাবো এই এ্যাম্বাসাডারে, বাকীরা যাবে ট্যাক্সিতে।

অধৈর্য কিংকর প্রশ্ন করল, কোথায় যাচ্ছি আমরা?

মৃণাল কিছু বলার আগেই বাড়ির ভেতর থেকে কমলকলি, দুপাশে ইন্দ্রানী, গায়ত্রী বেরিয়ে এলো। কমলকলিকে দেখে মিলিন্দ স্তব্ধ, স্থির, তার দুচোখের মনি যেন ঝলসে গেছে। এ পোশাকে সে আগে কখনও দেখেনি কমলকলিকে। সোনালী জরিপাড় লাল বেনারসী শাড়ি, গলায় বেলফুলের গোড়ের মালা, ভারী খোঁপায় জড়ানো বেলফুলের গুছি, কপালে, মুখে চন্দনের কারুকাজ, কল্কা, উঠোনের ফিকে আলো মাড়িয়ে গাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে কমলকলি। রহস্যময়ী, সুদূরচারিনী এ কমলকলি মিলিন্দর ভীষণ অচেনা। তার সামনে এসে কমলকলি হাসতে ঝিকমিক করে উঠলো তার দুধ সাদা দাঁত। কী ঘটছে, ধরতে পারছে না মিলিন্দ। কিংকরের সঙ্গে মৃণালের কথার টুকরো শব্দ শুনে মিলিন্দ বুঝলো, কমলকলির দাদার বন্ধু ইঞ্জিনিয়ার বিমল পালিতের সঙ্গে আজ তার বিয়ে। ওয়েলিংটনে এক ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে এখন যাচ্ছে তারা। বিমল পালিত বন্ধুবান্ধব নিয়ে অপেক্ষা করবে সেখানে। খুব গোপনে এ বিয়ে হচ্ছে। কমলকলির দু'চারজন বন্ধু, ভাই-বোনরা ছাড়া বাড়ির কেউ জানে না। বাবা জানলে রক্তারক্তি হতে পারে ভেবে এই গোপনীয়তা।

গাড়ির পেছনের সিটে কমলকলি, ইন্দ্রানী, গায়ত্রী, ড্রাইভারের পাশে মৃণাল কিংকর বসার পরও পাথরের মতো মিলিন্দকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কিংকর ডাকলো, তুই এখানে আয়।

কমলকলি বলল, মিলিন্দ আমার পাশে বসবে।

অন্ধকার গাড়িতে কমলকলির পাশে বসলো মিলিন্দ। নতুন বেনারসীর স্পর্শ, তাপ, ফুলের সুবাস জড়িয়ে ধরছে তাকে। বাড়ির ভেতর থেকে আর কেউ এলো না। গাড়ি ছেড়ে দিল। গাড়িতে সুসজ্জিত বিয়ের কনে নজর করে আলো ঝলমল রাস্তায় পথচলতি দু'এক জন মানুষ তাকাচ্ছে। কমলকলির চন্দন আঁকা মুখে, গলায়, লাল বেনারসীর ভাঁজে ভাঁজে রাস্তার আলো, অন্ধকার লুকোচুরি খেলছে। আধখোলা জানলা দিয়ে হুহু করে ভেতরে ঝাঁপিয়ে পড়ছে মাঘের হিমেল বাতাস। মিলিন্দ বোবা, নিস্তব্দ।

হালকা গলায় কমলকলিকে গায়ত্রী প্রশ্ন করল, কেমন লাগছে রে?

কমলকলির মুখে সলজ্জ হাসি। এ হাসি যে সে হাসতে পারে, মিলিন্দ ভাবতে পারেনি। অন্ধকার ট্যাক্সিতে হঠাৎ তার ডান হাত এক আঁজলা জলের মতো নিজের বাঁহাতের মধ্যে তুলে নিল কমলকলি। তার বাঁ হাতের নরম পাতা বরফের মতো ঠান্ডা। এতো ঠান্ডাও হয় জ্যান্ত মানুষের হাত! শীতল স্পর্শে শিউরে উঠলো মিলিন্দ। কমলকলির কাঁধ, নতুন বেনারসী, হাঁটু আলগোছে ছুঁয়ে আছে তাকে। সামনের সিটে গল্প করছে কিংকর, মৃণাল। উথালপাথাল যন্ত্রণা মিলিন্দর বুকের

মিলিন্দর মুখের ওপর নজর রেখে কমলকলি বলেছিল, কাজটা শক্ত, সেজন্যে তোমাকে বলছি, শক্ত কাজ তুমি ছাড়া আর কে করবে ?

কমলকলির দিকে চুপচাপ তাকিয়ে ছিল মিলিন্দ। কমলকলি বলল, আমার বিয়ের খবরটা কাল সকালে আমাদের বাড়িতে গিয়ে বাবাকে জানাতে হবে।

এক সেকেন্ড চুপ থেকে কমলকলি প্রশ্ন করল, যাবে তুমি আমাদের বাড়ি ?

যাবো।

কালই কিন্তু।

ঠিক আছে।

ছবি তোলার পর রেস্টুরেণ্টে ঢুকে মিলিন্দ টের পেল, তার মাথা পাথর, টলমল করছে পায়ের তলার মাটি। আনন্দ, উচ্ছ্বাস কথায়, সন্ধ্যে থেকে সকলে মুখর। কেউ নজর না করলেও কিংকর দেখছিল তাকে। হয়তো কমলকলিও বুঝতে পেরেছিল। রেস্টুরেণ্ট থেকে তার সঙ্গে বেরিয়ে এসে কিংকর প্রশ্ন করেছিল, কোথায় যাবি ?

এখনই কল্যাণ, চন্দন, নবনীতার খবর নিতে হবে।

মিলিন্দর জবাব শুনে হাত তুলে একটা খালি ট্যাক্সি দাঁড় করালো কিংকর। ট্যাক্সিতে উঠে কিংকর বলল, আগে মেডিকেল কলেজে যাওয়া যাক।

ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে কাজগুলো পরপর সাজিয়ে নিয়েছিল কিংকর। চলন্ত ট্যাক্সিতে বসে সে বলল, মেডিকেল কলেজে হদিশ না পেলে কল্যাণের বাড়িতে একটা ফোন করবো। সে রকম বুঝলে একবার যেতে হবে চন্দনের বাড়ি।

কিন্তু সে সব দরকার হলো না। মেডিকেল কলেজের এমার্জেন্সির সামনে কল্যাণের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল দু'জনের। শুকনো মুখ, এলোমেলো চুল, কল্যাণ বলল, চন্দন অজ্ঞান, রক্ত দেওয়া হচ্ছে। নবনীতা আছে চন্দনের কাছে।

কল্যাণের পাশে দাঁড়ানো অচেনা মানুষগুলো যে চন্দনের পার্টির লোক বুঝতে পারলো মিলিন্দ। রাত সাড়ে আটটায় ঢোকার নিয়ম না থাকলেও চন্দনকে একবার চোখে দেখার জন্যে তার বিছানার পাশে মিলিন্দ, কিংকর এসে দাঁড়ালো। মাথায় মোটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, নিথর চন্দন চোখ বুজে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। মাথার রক্ত বন্ধ হয়নি। চুঁইয়ে পড়া রক্তে ভিজে উঠছে ক্রেপ্ কাপড়। রক্তের বোতল থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঢুকছে চন্দনের শরীরে। চন্দনের বুকের ওপর হাত রেখে বসেছিল নবনীতা। মিলিন্দ, কিংকর গিয়ে দাঁড়াতে নবনীতা চোখ তুলে তাকালো। তার দু'চোখে জল। একটা কথা বলল না সে।

একজন নার্স এসে বলল, এখন ওয়ার্ডে আসার নিয়ম নেই। একজন থাকতে পারেন। তার বেশি নয়।

আর দাঁড়ানো উচিত নয়। দু'জনে ওয়ার্ড থেকে চলে আসার আগে নবনীতা ভজে চোখ তুলে মিলিন্দকে বলল, জ্ঞান হারাবার আগে চন্দন একটা কথা বলতে বলেছিল তোমাকে।

নবনীতার দিকে তাকিয়ে মিলিন্দ দাঁড়ালো। নবনীতা বলল, কলেজে ছাত্রসংসদ

নির্বাচনের দায়িত্ব তোমাকে নিতে অনুরোধ জানিয়েছে চন্দন। আর বলেছে।

কথাটা শেষ করার আগে গলা বুজে গেল নবনীতার। মিলিন্দর মনে হলো, তার সামনে মাথায় সিঁদুর কমলকলি দাঁড়িয়ে কাঁদছে। বিভ্রম, প্রহেলিকায় মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিল সে। তার কাঁধ শক্ত হাতে চেপে ধরলো কিংকর। নিজেকে সামলে নিয়ে মিলিন্দ বলল, চন্দনের জ্ঞান ফিরলে তাকে বলো, কলেজ ইউনিয়ন নির্বাচনের সব দায়িত্ব আমার। কাল সকালেই আবার আসবো আমি।

দু'পাশের বিছানায় অসুস্থ মানুষ। ওষুধের গন্ধে ভারী বাতাস, দম বন্ধ হয়ে আসছিল মিলিন্দর। চন্দনের মুখের দিকে আর একবার তাকিয়ে ওয়ার্ড থেকে কিংকরের সঙ্গে সে বেরিয়ে এলো সে। এমার্জেন্সির সামনে তখনও দাঁড়িয়ে ছিল কল্যাণ। একটা গাড়ি এসে থামলো। গাড়ি থেকে নামল নবনীতার সেজদা, সেজবৌদি।

নীতা কোথায়?

সেজবৌদি প্রশ্ন করতে তাকে নিয়ে কল্যাণ ওয়ার্ডের দিকে এগোলো। যাবার আগে মিলিন্দকে কল্যাণ বলল, তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে। কাল বলবো।

রাস্তায় এসে আবার একটা খালি ট্যাক্সিতে উঠে ড্রাইভারকে কিংকর বলল, আউট্রাম ঘাট।

মিলিন্দর মুখ দেখেই বোধহয় তার সঙ্গে কিছু সময় কাটাতে চাইছিল কিংকর। মিলিন্দর মনের নিদারুণ ব্যথার জায়গাটা টের পেয়ে তাকে একটু শান্তি, সান্ত্বনা, উপশম দিতে সঙ্গ নিয়েছিল তার।

কিংকর বলল, কথা বল্, চুপ করে আছিস কেন?

ঝাপসা গলায় মিলিন্দ বলল, কী বলবো?

ইডেন গার্ডেন্স্ পেরিয়ে গঙ্গার ধার ধরে ট্যাক্সি চলেছে। ধুধু ফাঁকা রাস্তা, আবছা নীল আকাশে অনেক তারা, জোয়ারের গঙ্গার ঢেউ-এর ছলাৎছল, তীরে বাঁধা নৌকোর গলুই-এ মিটমিটে আলো, মিলিন্দর মনে হলো নিরুদ্দেশে যাচ্ছে সে।

বিমলকে যে কমলকলি বিয়ে করবে, আমি জানতাম, কিংকর বলল, এতো তাড়াতাড়ি বিয়েটা হবে ভাবি নি।

কিংকরের কথা কানে ঢুকছিল না মিলিন্দর। কমলকলি, নবনীতা, মাথায় রক্তমাখা ব্যান্ডেজ বাঁধা চন্দনের মুখ মিলে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে।

কিংকর বলল, তোর মনের খবর আঁচ করতে পেরেও কিছু বলিনি। এসব ছেঁদো সম্পর্কের আলোচনা শুনে মিলিন্দ দ্য গ্রেট, চটে যাবে ভেবে ভরসা করি নি। অথচ স্টার থিয়েটারের সেই লাল গোলাপ।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে কিংকর বলল, বোকামি হয়েছে। আগেই বোঝা উচিত ছিল আমার। বাঘের বাসা থেকে অতনুকে তুলে আনলাম, আর কমলকলি।

কথা শেষ না করে থেমে গিয়েছিল কিংকর।

মিলিন্দ চুপ। কিংকর বলল, কমলকলির মুখ দেখে আমার মনে হল, নিরুপায় হয়ে বিয়ে করেছে সে। হয়তো সংসারে, বাড়িতে এমন কিছু কষ্ট, দুঃখ তার ছিল যে

বিয়ে অথবা আত্মহত্যা, একটা না করে উপায় ছিল না তার। এ বিয়েও একরকম আত্মহত্যা। আসলে মানুষ যা করতে চায়, আর যা করে, অনেক সময় হয়তো বাধ্য হয়েই করে, মেলে না।

ঠাণ্ডা ধারালো বাতাস আসছে জানলা দিয়ে। ড্রাইভারকে কিংকর বলল, এখানে দাঁড়ান।

ট্যাক্সি থেকে নেমে ড্রাইভারকে কিংকর প্রশ্ন করল, দাঁড়াবেন, না চলে যাবেন ?

কতোক্ষণ ?

আধঘণ্টা।

দাঁড়াচ্ছি।

মিলিন্দকে নিয়ে গঙ্গার ধারে এসে দাঁড়ালো কিংকর। পায়ের নিচে শিশিরভেজা শীতের বাদামী ঘাস। ভিজে ঘাসের ওপর পাশাপাশি বসলো দু'জন। নির্বাক মিলিন্দ যেন বরফের মানুষ। বন্ধুর জন্যে দরদে, কষ্টে অনেক কথা কিংকরের গলা পর্যন্ত উঠে এলেও ভাষা পাচ্ছিল না সে। কমলকলির ওপর অভিমানে সে ফুঁসছিল। অসুখী, অসহায় কমলকলি যে নির্ভরযোগ্য একজন মানুষকে এখনই আঁকড়ে ধরার জন্য ব্যস্ত, সে মানুষ যে মিলিন্দ নয়, মিলিন্দ হতে পারে না, প্রগাঢ় ভালোবেসেও তা সম্ভব নয়, কিংকর জানতো। মিলিন্দ কি জানতো না ? দক্ষিণেশ্বরে সেই সন্ধ্যেতে, কুড়ি বছর যার বয়স, সেই মিলিন্দ কি বোঝে নি ? বুঝেও শুধু স্বপ্ন দেখা ছাড়া কিছু করার ছিল না তার। বিমল পালিতও জানতো, বুঝতে পেরেছিল, কমলকলিকে পাবার এই শেষ, মোক্ষম সুযোগ।

নির্বাক মিলিন্দর কাঁধে ঘনিষ্ঠভাবে হাত রেখে কিংকর বলল, তুই কিছু বল। এরকম গুম মেরে থাকলে নিজেই কষ্ট পাবি। প্লিজ্, কথা বল।

কী বলবো, বিড়বিড় করল মিলিন্দ।

যা খুশি।

আমার ভয় করছে।

কীসের ভয় ?

হেরে যাচ্ছি আমি, ডিবেটে, লেখাপড়ায়, বন্ধুত্বে। কমলকলি, এমনকি চন্দনও হারিয়ে দিল আমাকে।

বাজে কথা, চেঁচিয়ে উঠলো কিংকর, তোর হেরে যাবার গল্প বিশ্বাস করি না আমি।

ভিজে ঘাসের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে ছিল মিলিন্দ। কিংকর বলল, আমাদের বাড়িতে চল। আজ রাতে বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে আমরা ঘুমোবো।

মা চিন্তা করবে।

মাসীমাকে বাড়ি থেকে ফোন করে দেবো।

নাহ্! আজ নয়।

কাল সকালে আয়।

দেখি।

মিলিন্দর কথা বলার ইচ্ছে মরে গেছে। কথা বলতে চাইছে না সে।

রাস্তা থেকে ট্যাক্সিড্রাইভার হর্ন বাজাতে প্রথমে কিংকর, তারপর মিলিন্দ উঠে দাঁড়ালো। মিলিন্দর পাঞ্জাবি থেকে শুকনো ঘাস, কুটো, পাতা ঝেড়ে দিল কিংকর। তারপর ট্যাক্সিতে বসলো দুজনে।

বালিশে মুখ চেপে অনেকক্ষণ কেঁদেও মিলিন্দর মনে হলো, আরো অনেক কান্না পাথরের মতো আটকে আছে তার বুকে। পাশের ঘরে ছোট বোন টুনি কাশছে। দু' তিন দিন ধরে সর্দিজ্বরে ভুগছে সে। সাত বছরের এই ছোট্ট বোনটা মিলিন্দর খুব ন্যাওটা। কেন হলো মিলিন্দ জানে না। পড়ুয়া, মেধাবী মিলিন্দর কাছ থেকে বাবার প্রত্যাশা অনেক। তার সমৃদ্ধি, সফলতায় সংসার ভরে যাবে, এমন এক স্বপ্ন মা বাবার চোখে জুড়ে আছে। বালিশে মুখ গুঁজে মিলিন্দ বলল, আমি পারবো না, আমার পক্ষে সফল হওয়া সম্ভব নয়। মধ্যবিত্ত, টিপিকাল পাতিবুর্জোয়া জন্ম পরিচয়ে হেরে বসে আছি আমি। আমার এই অমোঘ, অনিবার্য হার ঠেকাতে পারবে না কেউ।

অন্ধকার ঘরে ঠাণ্ডা বিছানার ওপর উঠে বসে মিলিন্দ ভাবলো, এখন একবার কিংকরের বাড়ি গেলে কেমন হয়? একটু আগে দালানের দেওয়াল ঘড়িতে তিনটে বাজার শব্দ শুনেছে সে। রাত শেষ হতে দু'তিন ঘণ্টাও নেই। ঘুম যখন হবে না, শুয়ে থেকে কী লাভ? শুধু আজ নয়, আগামী অনেক রাত ঘুমোতে পারবে না সে। হঠাৎ তার মনে হলো, কিংকরের বাড়ির বদলে মেডিকেল কলেজ, যেখানে চন্দন শুয়ে আছে, হয়তো তার জ্ঞান ফিরেছে, সেখানে যাবে। কিন্তু হাসপাতালের ওয়ার্ডে কি তাকে ঢুকতে দেবে এখন? কমলকলির শেষ অনুরোধ, তার বিয়ের খবরটাও যতীন দত্তকে কাল সকালে দিতে হবে। কমলকলির বাড়িতে কাল তার বাবার মুখোমুখি একা দাঁড়াবে সে। বিয়ের কথাটা বলার সুযোগ পাবে তো? আরো একটা কথা বলার বাসনা আছে যতীনকে।

বিছানা থেকে নেমে নিঃশব্দে সদর দরজা খুলে রাস্তায় এলো মিলিন্দ।

মেডিকেল কলেজের বদলে কিংকরদের বাড়ির সদর দরজায়, রাত প্রায় সাড়ে তিনটের সময় পৌঁছে গেল মিলিন্দ। দরজার দু'পাল্লা হাট করে খোলা। সদরের মাথায় আলো জ্বলছে। ঘুমন্ত, নিস্তব্ধ পৃথিবীর নিচে ফাঁকা রাস্তায় কয়েকটা কুকুর ছাড়া আর কারো সঙ্গে দেখা হয়নি। পায়ে হেঁটে কিংকরের বাড়ি আসতে পনেরো, বিশ মিনিটের বেশী সময় না লাগলেও অবসাদে মিলিন্দ নেতিয়ে পড়ছে। খোলা দরজা দেখে অবাক মিলিন্দ বুঝলো রাতেও এ বাড়িতে দরজা বন্ধ করার নিয়ম নেই। সদর দরজা থেকে বাড়ির ভেতরে যাবার একচিলতে করিডোর উঠোনে গিয়ে মিশেছে। করিডোরের দু'পাশে সামনাসামনি দুটো ঘর। দরজা থেকেই উঠোনে ডাঁই করা কাঁসার বাসন, বড়ো বড়ো হাঁড়ি, ডেকচি, থালা, গ্লাস, বাটি দেখা যাচ্ছে। এক পা এগোতে নিখুঁত, স্পষ্ট উচ্চারণে সংস্কৃত শ্লোক পড়ার গম্ভীর, উদাত্ত ধ্বনি শুনল মিলিন্দ। করিডোরের ডানপাশের ঘর থেকে ভেসে আসা শব্দ শুনে মিলিন্দ বুঝল, এ কণ্ঠস্বর কিংকরের বাবার। কিংকরের বাবা জেগে আছে। উঠোনের পাশ দিয়ে

একতলায় কিংকরের ঘরে পা টিপে যেতে গিয়ে ডানদিকের ঘরে কিংকরের বাবাকে দেখতে পেল মিলিন্দ। ঘরের কমজোরী আলোতে খালি গা, খাটো ধুতি, গলায় মোটা উপবীত, দুচোখ বুজে বসে থাকা মানুষটিকে বেদ, উপনিষদের মুনি-ঋষির মতো দেখাচ্ছে। মিলিন্দ শুনলো ধ্যানস্থ মানুষটির বুকের গভীর থেকে উঠে আসছে গীতার শ্লোক।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি
নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো
ন শোষয়তি মারুতঃ॥

একটার পর একটা শ্লোক চুম্বকের মতো ঘরের সামনে দাঁড় করিয়ে রাখলো মিলিন্দকে। বছর দুয়েক আগে মন দিয়ে টীকা, ভাষ্য, ব্যাখ্যা সমেত গীতা পড়েছিল সে। এ পড়ারও ইতিহাস আছে একটা। কার্ল মার্কসের একটা বই, কম্যুনিস্ট্ ম্যানিফেস্টো চন্দন পড়তে দিয়েছিল মিলিন্দকে। কিছু বুঝে, কিছু না বুঝে, পড়া শেষ করার পরেও বইটা চন্দনকে ফেরত দিয়ে উঠতে পারেনি মিলিন্দ। ঝোলাতে থেকে গিয়েছিল। ইতিহাসের অধ্যাপক ইন্দ্রনাথ বাবুর সামনে একদিন ঝোলা থেকে একটা খাতা বার করার সময় উঠে এসেছিল বইটা। কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো লেখা বইটা দেখে আঁতকে উঠে ইন্দ্রনাথ প্রশ্ন করল, তুমি কম্যুনিস্ট্?

তখনও মিলিন্দ জানতো না যে ইন্দ্রনাথ ঘোর কম্যুনিস্টবিরোধী। সে বলল, কম্যুনিস্ট্ ম্যানিফেস্টো পড়লেই কি কম্যুনিস্ট হওয়া যায়?

তাহলে তোমার কাছে এ বই কেন?

ইন্দ্রনাথের প্রশ্নে অবাক মিলিন্দ বলেছিল, পড়ার জন্যে।

পড়াটা ফ্যাশন্ নাকি?

মিলিন্দ জবাব দেয় নি প্রশ্নের। ইন্দ্রনাথ বলেছিল, বেদ, উপনিষদ, গীতা পড়েছো?

নাহ্।

তা পড়বে কেন?

মিলিন্দকে ধিক্কার দিয়ে প্রবীণ অধ্যাপক স্টাফ্‌রুমে ঢুকে গেল। হাতের খাতাটা আর তাকে দেখতে পারলো না মিলিন্দ। কিন্তু মিলিন্দর জেদ চেপে গেল। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, গীতা, উল্লেখযোগ্য প্রাচীন বইগুলো না পড়ে সে আর ইন্দ্রনাথবাবুর ক্লাস্ করবে না। জেদ বজায় রেখেছিল মিলিন্দ। ছ'মাসে প্রায় সব সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ, মূল সহ বঙ্গানুবাদে পড়েছিল সে। ধীরে ধীরে, সময় নিয়ে পড়লেও সম্পূর্ণ বোঝে নি। যা বুঝেছে, তার সিকিভাগ বিশ্বাস করে নি। কিন্তু ভারতীয় দর্শন যতোই বিমূর্ত, ভাববাদী হোক, অবহেলার জিনিস নয়, এদেশের মহান উত্তরাধিকার, জাতির ইতিহাস, জীবনস্রোতের মূল্যবান ফসল, শ্রদ্ধার সঙ্গে এ সত্য উপলব্ধি করেছে সে।

ইন্দ্রনাথবাবুর নিষ্ঠুর শ্লেষের জবাব দেবার জন্যে গীতা আর কম্যুনিস্ট্ ম্যানি-

ফেস্টো পাশাপাশি রেখে পড়েছিল সে। পড়ার পর দুই বিরোধী দর্শনের অন্তর্নিহিত মিল, যেমন হেগেল, ফয়েরবাকে পেয়েছিলেন মার্কস, দেখে অবাক মেনেছিল মিলিন্দ। গীতার চেয়ে সেদিন কমুনিস্ট ম্যানিফেস্টো অনেক বেশী যুগোপযোগী, বাস্তব মনে হলেও আজ রাতের এই শেষ প্রহরে বায়ুতরঙ্গে ভেসে আসা শ্লোকগুলো মথিত করে দিল তার অন্তরাত্মা।

প্রতিটি শ্লোক, আকাশবাণীর মতো তার চেতনায় ছড়িয়ে দিচ্ছে এক সুস্পষ্ট নির্দেশ, সঙ্কেত, দিশা। মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে থাকলো মিলিন্দ। একটার পর একটা শ্লোক, সত্যনিষ্ঠা, অলোলুপতা, অভয়, অদ্রোহ, অক্রোধ, অহিংসা, নিরহংকার, সত্ত্বসংশুদ্ধি, শীতল শিশিরের মতো ফোঁটা ফোঁটা ঝরে পড়ছে তার মনের ওপর। রাত কতো, সে কোথায়, কেন এসেছে, দাঁড়িয়ে আছে, বুঝতে পারে না। পাঠ শেষ হবার বেশ কিছুক্ষণ পরে, সজাগ হয়ে চোখ কচলে মিলিন্দ দেখলো, অন্ধকার ফিকে হয়ে এসেছে, ফুটি ফুটি ভোর, আচ্ছন্ন, আবিষ্ট মাথায় রাস্তায় এসে তার মনে হলো, জীবনের চাবি, ন্যায়যুদ্ধের কর্মসূচী পেয়ে গেছে সে। শান্ত মাথায়, ধীর পায়ে যখন সে বাড়ি ফিরলো, বাড়ির কেউ তখনও জাগেনি।

সকাল ন'টায় হাসপাতালে চন্দনকে দেখতে যাবার আগে কমলকলির বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়ালো মিলিন্দ। দরজা খোলা বাড়িটা এমন নিস্তব্ধ যে তার মনে হলো, ভেতরে এখনও সকলে ঘুমোচ্ছে। দরজা দিয়ে ভেতরের চাতাল পেরিয়ে উঠোনের পাশে এসে রান্নাঘরে কড়া, খুন্তির শব্দ শুনলো মিলিন্দ। রান্নাঘরের চৌকাঠে সে এসে দাঁড়াতেও কমলকলির মা টের পেল না। উনুনে বসানো কড়ায় কিছু ভাজছে কমলকলির মা। এক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থেকে মিলিন্দ ডাকলো, মাসিমা!

চমকে উঠে পেছন ফিরে মিলিন্দকে দেখে ফ্যাকাসে হয়ে গেল কমলকলির মা।

মেসোমশাই আছেন?

মিলিন্দর প্রশ্ন শুনে কমলকলির মা আবছা, কাঁপা গলায় বলল, আছে।

আমি একবার দেখা করবো।

ভয়ার্ত চোখে মিলিন্দর দিকে তাকিয়ে থেকে কিছু বলতে গিয়েও মা'র গলা থেকে আওয়াজ বেরোলো না। মিলিন্দ সেখানে আর দাঁড়ালো না। দোতলায় কমলকলির বাবার ঘর তার চেনা। সিঁড়ি দিয়ে সে দোতলায় এসে দাঁড়াতেই পাশের কোনো একটা ঘর থেকে বেরিয়ে মিঠুন বলল, পালান। বাঘের মতো ক্ষেপে আছে বাবা।

মিঠুনের মুখের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে মিলিন্দ হাসল। তারপর শক্ত, ধীর পায়ে এগিয়ে গেল কমলকলির বাবার ঘরের দিকে। তার মাথায় বহমান রক্তের ধ্বনি, চাপ, তাপ, কানে বাজছে ভোর রাতের মন্ত্র, পৃথিবী জয়ের স্পর্ধা। হারানো আত্ম-বিশ্বাস ফিরে পেয়েছে সে। আবার সে মিলিন্দ দ্য গ্রেট, অপরাজেয়। কেউ আর

তাকে হারাতে পারবে না। অপমানের চোরা স্রোত থেকে মাথা উঁচু করে উঠে আসার এই শেষ সুযোগ। ভেলকি দেখাবে সে।

পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকে মিলিন্দ দেখল, লুঙি, হাফ হাতা নেটের গেঞ্জি পরে একটা ইজিচেয়ারে যতীন দত্ত বসে আছে। বিশাল মুখ। চওড়া কপালে গভীর, লম্বা দাগ। ইজিচেয়ারের পেছনে গোলাপি দেওয়ালে ঝুলছে কালো সাপের মতো কুণ্ডলী পাকানো চামড়ার চাবুক। মিলিন্দর মুখের দিকে স্থির, পলকহীন, ঠাণ্ডা চোখে দু'তিন সেকেণ্ড তাকিয়ে থেকে কমলকলির বাবা প্রশ্ন করল, তুমি কে ?

আমি মিলিন্দ, কমলকলির বন্ধু।

ইজিচেয়ারে এলানো কমলকলির বাবার শরীর সোজা হলো। নিস্প্রাণ, কঠিন চোখ, কপালের ভাঁজ পড়া চামড়া তিরতির করে কাঁপছে। মিলিন্দর কানের দু'পাশ দিয়ে বইছে ঝোড়ো বাতাস, মাথার মধ্যে উড়ছে কুচো বিদ্যুৎ, বিতর্কের মঞ্চে দাঁড়ালে যেমন হয়, রক্তের গভীরে ছড়িয়ে পড়ছে সে অনুভূতি।

কী চাই ?

প্রশ্নটা শুনে মিলিন্দ বলল, আপনাকে একটা খবর দেবার জন্যে কমলকলি পাঠিয়েছে আমাকে।

ইজিচেয়ারে সোজা হয়ে বসা মানুষটার পাথুরে চোখ দুটো ধকধক করে জ্বলছে। দশাসই, লম্বা, চওড়া জোয়ান মানুষটা যেন এখনই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াবে।

মিলিন্দ বুঝতে পারলো, দরজার বাইরে, পর্দার আড়ালে বাড়ির সকলে জড়ো হয়েছে। লোমহর্ষক একটা খেলা দেখার জন্যে অপেক্ষা করছে তারা। কমলকলির খবর শোনার জন্যে ওৎ পেতে সামনে প্রতীক্ষা করছে একজন।

মিলিন্দ বলল, কাল রাতে বিমলবাবু, মানে বিমল পালিতকে বিয়ে করেছে কমলকলি।

হোয়াট ?

চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলো কমলকলির বাবা। ছ'ফুট লম্বা, ক্ষিপ্ত মানুষটা রাগে কাঁপছে। একটুও ভয় না পেয়ে মিলিন্দ বলল, রেজিস্ট্রি হয়েছে কাল। আমি সাক্ষী দিলাম।

ঘরের মধ্যে সীমাহীন স্তব্ধতা। গোলাপি দেওয়ালে কুণ্ডলী পাকানো মৃত সাপের মতো চাবুক, বাইরে ক্ষীণ পায়ের শব্দ, ফিসফিস কথা। খোলা জানলা দিয়ে সকালের এক টুকরো রোদ স্পটলাইটের মতো চাবুকের উপর লুটিয়ে আছে।

কমলকলির বাবা কী যেন খুঁজছে। মিলিন্দ বলল, আপনার চাবুক ওই দেওয়ালে।

শক্ত চিবুক, নিষ্ঠুর চোখ মানুষটা মিলিন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। মানুষটার মুখের রঙ, চোখের আগুন ধীরে ধীরে ম্লান হচ্ছে। হঠাৎ দু'হাতে মুখ ঢেকে ইজিচেয়ারে ধপ করে বসে পড়ল যতীন দত্ত। আবছা গোঙানির শব্দ। মানুষটা এলিয়ে পড়লো চেয়ারে।

মিলিন্দ বলল, মেসোমশাই, আমি যাচ্ছি।

মুখ থেকে হাত সরিয়ে মিলিন্দর দিকে তাকালো কমলকলির বাবা। তার কপালের ভাঁজ মুছে গেছে, দুচোখের জমিতে ধুসর বাষ্প। যে কথাটা বলার চিন্তায় কাল রাতে বহু সময় অন্ধকার ঘরে মিলিন্দ ছটফট করেছে, সহজ, দ্বিধাহীন গলায়, নির্ভয়ে আজ কথাটা বলতে তার অসুবিধে হ'লো না। মিলিন্দ বলল, এ বছর আমি বি. এ পরীক্ষা দেবো। পাশও করবো। আপনারা অনুমতি দিলে তারপর, কনকলতাকে আমি বিয়ে করতে রাজি।

হাঁ করে কমলকলির বাবাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে মিলিন্দ বলল, সব জেনে-শুনেই একথা বলছি। আর একটা কথা, কনকের সন্তানের কোনো ক্ষতি যেন না হয়।

বাড়ির সবাই কমলকলির মা, ভাইবোনেরা কখন ঘরে ঢুকে এসেছে, খেয়াল করেনি মিলিন্দ। কথা শেষ করে কমলকলির মাকে সে বলল, মাসিমা চললাম, দরকার হলে ডাকবেন আমাকে।

মিনিট দশ পরে কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট দিয়ে হনহন করে মেডিক্যাল কলেজের দিকে হেঁটে যাচ্ছিল মিলিন্দ। ব্যস্ত সকাল, রাস্তায় মানুষ, গাড়ি, ঝলমলে রোদ। অনেক দিন পরে এক কঠিন যুদ্ধে জিতে মিলিন্দর মনে হচ্ছে, তার পৌরুষ, যুদ্ধজয়ের ক্ষমতা বহুগুণ বেড়ে গেছে। পরিণত, সাবালক একজন মানুষের মতো নির্ভুল, দৃঢ় পায়ে সে হেঁটে চলেছে। দু'মাস পরে তার বয়স হবে একুশ। সে আর ছেলেমানুষ নয়। ছেলেমানুষ থাকার সুযোগও তার নেই। কনকলতার দায়িত্ব নিয়েছে সে। দূর ভবিষ্যতে দায়িত্ব বুঝে নেবার ডাক আসতে পারে। তাছাড়া অসুস্থ চন্দনের পাশেও দাঁড়াতে হবে তাকে। চন্দনের দেওয়া দায়িত্ব গত রাতে স্বেচ্ছায় মাথা পেতে নিয়েছে। একটা বড়ো যুদ্ধের জন্যে সে এখন তৈরি।

দিগ্বিজয়

সন্ধে নামছে পৃথিবীতে। অন্ধকার না হলেও ঘন হয়েছে ছায়া। রাস্তার একটা তোলা উনুন থেকে গলগল করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। ইলেকট্রিক পোস্টে ঝুলে আছে ধোঁয়া, কুয়াশার জট। নির্জন গলি ধরে হেঁটে চলেছে মিলিন্দ। ভিড়, গাড়ি, এড়াতে-এ রাস্তা দিয়েই যাতায়াত করে সে। কুণালের বাড়িতে এলে এটাই তার পথ। মিলিন্দর জ্যাঠতুতো দাদা কুণাল। তার সঙ্গে আজ দুপুর থেকে ছিল মিলিন্দ। সামনে মজা খাল, আদিগঙ্গা। সিমেন্টের সাঁকো পেরিয়ে চারু অ্যাভিনুতে এলো মিলিন্দ। দু'পা এগোতে চোখে পড়লো, ল্যাম্পপোস্টের তলায় আবছা অন্ধকারে পরমেশ দাঁড়িয়ে আছে। পরমেশ দেখেনি মিলিন্দকে। এই ভরসন্ধ্যেতে এখানে পরমেশ কেন দাঁড়িয়ে, বুঝতে পারলো না মিলিন্দ। এ পাড়ায় পরমেশের কোনো বন্ধু আছে না কি? থাকতেও পারে। কিন্তু বন্ধুর বাড়িতে না ঢুকে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে কেন দাঁড়িয়ে আছে পরমেশ? পরমেশের দাঁড়াবার ভঙ্গিও রহস্যময়, সন্দেহ করার মতো। সামনের বাড়ির দোতলার ঘর থেকে একফালি মিহি আলো তেরচাভাবে পড়েছে তার মুখে। চৌকো দেখাচ্ছে মুখটা।

পরমেশকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছে মিলিন্দ। এ মুহূর্তে পরমেশের মুখোমুখি হতে চায় না সে। তাছাড়া সে পছন্দও করে না পরমেশকে। পরমেশ সম্পর্কে চাপা ঘৃণা আছে তার মনে।

লোকটাকে ভয় পায় সে। অস্বস্তি, উত্তেজনায় দপদপ করছে মিলিন্দর কপালের দু'পাশ। মনে মনে সে বললো, তুমি কী করো, তোমার পেশা কী, জানতেই হবে আমাকে।

কোনো সংবাদপত্রে কাজ না করেও পরমেশ নিজেকে সাংবাদিক হিসেবে চালিয়ে যাচ্ছে। বলে, আমি ফ্রি-লান্স্, স্বাধীন।

তার লেখা কখনও কোনো সংবাদপত্রে, সাময়িকীতে মিলিন্দ পড়েনি। এ প্রসঙ্গে পরমেশের তৈরি জবাব আছে। জবাবটা হলো, তার বেশিরভাগ লেখা বিদেশী কাগজে ছাপা হয়। দেশের কাগজে বেনামে লেখে সে।

সাংবাদিক হোক, না হোক, তাকে দেখে সচ্ছল মনে হয়। কোনো অভাব আছে, কখনও বুঝতে দেয় না সে।

পরমেশকে এড়াতে রাস্তা বদল করার কথা ভাবলো মিলিন্দ। তাকে দেখলেই আটকে দেবে পরমেশ। লোকটা ভীষণ কথা বলে। অবিরাম, অনর্গল কথা। বেশিটা মিছে কথা। কী করবে, মিলিন্দ ভাবছে। ট্রাম রাস্তায় যাবার এই একটাই পথ। পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে পরমেশ। তার সামনে দিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। চিন্তাটা মাথায় আসতে তেতো হলো তার মেজাজ। গায়ের চাদরে মাথা, মুখ ঢেকে ঘাড় নিচু করে এগোলো সে। মুড়িশুড়ি দেওয়া তার মুখ দেখে নিশ্চয় চিনতে

পারবে না পরমেশ। কিন্তু উল্টোটা হলো। ল্যাম্পপোস্টের সামনে সে হাঁটার গতি বাড়াতে পরমেশ প্রশ্ন করল, মিলিন্দ না ?

ছলাৎ করে উঠলো তার বুকের রক্ত। দাঁড়াতে বাধ্য হলো সে। হঠাৎ দেখার ভান করে বলল, আপনি ?

যাচ্ছিলাম তোমার দাদার বাড়ি। ট্রামে, বাসে যা ভিড়, উঠতে ইচ্ছে করে না! এ-রাস্তাটা নির্জন শান্ত। সময়ও কম লাগে। ভিড় সহ্য করতে পারি না আজকাল। ভিড় দেখলে ঘেন্না করে।

গুচ্ছের মিথ্যে কথার জালে পরমেশ আটকে দেবে আশঙ্কা করে মিলিন্দ বলল, একটু তাড়া আছে আমার। দাদা বাড়িতে আছে। যান।

এরকম অদ্ভুত সাজ কেন ?

পরমেশের ফিসফিস প্রশ্ন শুনে কঠিন হলো মিলিন্দর মুখ। তার নির্ভুল পাত্তা লাগাতে চাইছে পরমেশ। লোকটার চরিত্র বুঝতে অসুবিধা হয় না তার। সে কিছু বলার আগেই চাপা গলায় পরমেশ বলল, বুঝেছি। সাবধানে থেকো।

পরমেশ কী বুঝেছে, জানার ইচ্ছে নেই তার। রাগে ঝাঁঝা করছে মাথা। চাদরের তলায় মুঠোবন্ধ হয়েছে দুটো হাত। নিঃশব্দে সে বিড়বিড় করল, দু'মুখো সাপ।

পরমেশ বলল, কুণাল, মানে তোমার দাদা, কিছু তো বলেনি আমাকে।

একটু তাড়া আছে আমার, মিলিন্দ বলল, পরে কথা বলবো একদিন।

আমার বাড়িতে চলে এসো। কোনো ভয় নেই সেখানে।

একটা খারাপ কথা জিভের ডগায় আসতে গিলে নিল মিলিন্দ। কথা না বাড়িয়ে হাঁটতে শুরু করলো সে। পরমেশ দেখলো, ধোঁয়া কুয়াশার মধ্যে ধূসর হচ্ছে মিলিন্দর শরীর।

রবীন্দ্রসরোবর স্টেডিয়ামের সামনে মিলিন্দর জন্যে অপেক্ষা করছে এধা। ঘন পাতায় ঢাকা ঝাঁকড়া ডালপালাওলা একটা বিশাল সেগুন গাছের তলায় ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে থাকবে সে। এই গাছতলাতেই এখন তাদের দেখা হয়। আজও হবে। মিলিন্দ ছাড়া এখন তার চলবে না। মিলিন্দই এখন তার আশ্রয়, ভরসা। ট্রাম-লাইন টপকে অন্ধকার মাঠের মধ্যে দিয়ে মিলিন্দ হাঁটছে। নিজেকে একটা উচ্চিংড়ে মনে হচ্ছে তার। দেওয়ালে সেঁটে থাকা একটা টিকটিকির চোখের সম্মোহনে এগিয়ে যাচ্ছে সে। টিকটিকিটা ছোঁ মেরে কামড়ে ধরবে তাকে! ধীরে ধীরে গিলে নেবে। অনিবার্য মৃত্যু এড়াতে পারবে না উচ্চিংড়ে।

ঘাসের ডগা থেকে ছিটকে উঠছে শিশির। ভিজে যাচ্ছে পায়ের পাতা। মিলিন্দর মনে পড়লো, ছেলেবেলার এক ঘটনা। বিষাক্ত এনড্রিন মেশানো এক টুকরো নরম চুন ঝাঁটার কাঠির মাথায় গেঁথে ঘরের দেওয়ালে একটা দুটো টিকটিকির সামনে ধীরে

ধীরে নাড়াতো সে। শিকার ভেবে বিষাক্ত চুণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তো টিকটিকি। এক সেকেন্ড পরে দেওয়াল থেকে খসে পড়তো ফ্যাকাসে, ছোট্ সাদা একটা মাংস-পিণ্ড। মেঝেতে পড়েও কয়েক সেকেন্ড ছটফট করতো সেটা। তারপর নিথর হতো।

সাদার্ন এ্যাভিনুর অল্প-আলোকিত রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে পুরোনো স্মৃতি ভেবে শিউরে উঠলো মিলিন্দ। এ মুহূর্তে নিজেকে টিকটিকি মনে হচ্ছে তার। এধার হাতের বিষাক্ত চুন খেতে যাচ্ছে সে। যেতেই হবে। এধার সঙ্গে দেখা হবার পর এখন যা যা ঘটবে, আগেভাগেই দেখতে পাচ্ছে। নাটকের মতো সাজানো প্রতিটি দৃশ্য। তাকে দেখে ম্লান হাসি টেনে আনবে এধা। চেষ্টা করে হাসবে। চুপচাপ পাশাপাশি হেঁটে অন্ধকার মাঠে ঢুকবে। অন্ধকার, আরও নির্জন অন্ধকারে চলে যাবে দুজন। দাঁড়াবে। ব্যাগ থেকে একটা লম্বা সেলোফেন পেপার বার করে ভিজে ঘাসের ওপর পেতে দেবে এধা। গত তিনবছর এই টুকরো সেলেফেন পেপার ব্যাগে রেখেছে সে। তিন বছরে হয়তো কয়েকবার বদল হয়েছে সেলোফেন। খবর রাখেনি মিলিন্দ। রাখার উপায়ও নেই। অন্ধকারে নতুন, পুরোনো কীভাবে চিনবে সে? আগে বসতো উত্তর কলকাতার দেশবন্ধু পার্কে। এখন বসছে লেকে। দুটো পার্কেই ঘটনা, দৃশ্য একরকম। তাদের আগেই অন্ধকার মাঠে এসে বসে যাবে জোড়া জোড়া তরুণ-তরুণী। গায়ে গা লাগিয়ে তারা উপভোগ করবে পরস্পরের শরীরে, তাপ। মিলিন্দ, এধার শরীরেও এসে লাগবে সে ঢেউ। তারপর? মিলিন্দর কোল ঘেঁষে, বুকের কাছে বসবে এধা। দূরের আকাশে এক ঝাঁক তারা। ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে পেছনে আলকাতরার মতো তরল অন্ধকার। সেই অন্ধকারে গাছপালা যুবক-যুবতী সব যেন দক্ষ ট্যাক্সিডার্মিস্টের তৈরী অবিকল পুতুল। গাছের ডালপাতা ঝাঁপিয়ে একটা পাখি হঠাৎ ডেকে কখনও চমকে দেবে। সেই গভীর নির্জনতায় বুদবুদের মতো মাঝে মাঝে জেগে ওঠে পোকামাকড়ের চলাফেরার শব্দ, ঝিঁঝির ডাক। নিস্তব্ধতার মধ্যে বুজকুড়ির মতোই সে শব্দ আসে এবং মুছে যায়। তখন অতীত ভবিষ্যৎ একাকার। স্থির দাঁড়িয়ে থাকে শুধু বর্তমান। ধুধু অন্ধকার এবং তাৎক্ষণিক বর্তমান। ফাঁকা রাস্তায় বর্তমান শব্দটা মনে মনে উচ্চারণ করলো মিলিন্দ।

অন্ধকার মাঠে এধার পাশে এখনই বসতে হবে তাকে। শোনাতে হবে সহানুভূতির কথা। দরকার হলে আদর করতে হতে পারে। মেয়েরা আদুরে। আদর চাই তাদের। অন্ধকার মাঠে এধাকে বসিয়ে রেখে একবার বাদাম কিনতে গিয়েছিল মিলিন্দ। বাদামের ঠোঙা হাতে ফিরে এসে এধার পাশে বসে মুহূর্তে টের পেল, পাশের মেয়েটা এধা নয়। ভুল করে ফেলেছে সে। অচেনা তরুণীটি বোধহয় প্রেমিকের জন্য অপেক্ষা করছিল-। হয়তো তার প্রেমিকও কিছু কিনতে গিয়েছিল। অন্ধকারে মিলিন্দকেই প্রেমিক ভেবে আদর করার জন্যে হাত বাড়িয়েছিল মেয়েটি। ছিটকে সরে গিয়ে মিলিন্দ বলেছিল, মাপ করবেন, ভুল হয়ে গেছে।

দ্রুত সে চলে এসেছিল এধার কাছে। ঘটনাটা এধাকে জানিয়ে মিলিন্দ বলেছিল, সমস্ত শরীর, আত্মা অন্ধকারে একরকম দেখায়।

কথাটা বুঝে উঠতে পারেনি এধা। প্রশ্ন করেছিল, মানে?

আমরা শুধু শরীর।

কমলকলিও কি তাই ছিল?

প্রশ্নের খোঁচায় চমকে উঠে মিলিন্দ ভেবেছিল, কমলকলির কাহিনী এধাকে শোনানো উচিত হয় নি। সে বলেছিল, হয়তো তাই। জানি না। অন্ধকারের সঙ্গে তখনও পরিচয় হয়নি আমার।

বাসস্টপের পাশে ঝাঁকড়া সেগুন গাছের তলায় এধা দাঁড়িয়ে আছে। দূর থেকে তাকে দেখতে পেল মিলিন্দ। যেভাবে এধার দাঁড়াবার কথা, ঠিক সেভাবে ছায়ার মতো প্রতীক্ষা করছে সে। এখনই প্রতিটি দৃশ্য, ছবি, মিলিন্দ যা ভেবেছে ঘটতে শুরু করবে। এনড্রিনের ঝাঁঝালো বিষাক্ত গন্ধ পেল সে।

পুরোনো সেলোফেন পেপার ফেলে দিয়ে নতুন একটা কাল কিনেছে এধা। তাড়াহুড়োয় সেটা আনা হয়নি। তালতলা থেকে সাদার্ন এ্যাভিনু কম দূর নয়। বাসে আসতে প্রায় একঘণ্টা লাগে। চন্দনের ওপর বিরক্ত হয়েছে এধা। চন্দনের জন্যেই আসতে দেরী হয়ে গেল। খুব বেশি নয়। দশ মিনিট দেরী হয়েছে। মিলিন্দ নিশ্চয় ফিরে যায়নি। চন্দন এতো বকবক করে যে, তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া মুশকিল। চন্দনকে দায়ী করে পরমুহূর্তে লজ্জা পেল এধা। স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক মনে হলো নিজেকে। তার জন্যে চন্দন যা করছে, ভাবা যায় না। এক কথায় তুলনাহীন। ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া, ভুয়োগুনাল ইঞ্জেকশন দেওয়ানো, এমন কি তার ইউরিন পর্যন্ত পরীক্ষার জন্যে বয়ে নিয়ে গেছে চন্দন। সব করার পর দুর্ঘটনা যে ঘটেছে, পাকা খবর শুনে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল এধা। বোধবুদ্ধি অসাড়। কিছু ভাবতে পারছিল না সে। তার মুখ, চোখ দেখে চন্দন বলেছিল, ভয় নেই। আমরা তো আছি। যা করার করবো।

বোবা চোখে এধা তাকিয়ে থাকতে চন্দন ফের বলেছিল, মিলিন্দটা যে কী? এই দুর্দিনে।

চন্দন কী বলেছে, শুনতে পাচ্ছিল না এধা। ইথারের স্রোতে সোনালি ধুলোর মতো শব্দের গুঁড়ো উড়তে দেখলো সে। তার পর ইথার নেই, ধুলো নেই, সীমাহীন শূন্যতা। সংকোচমোচনের উপায় চন্দন বাতলাতে না পারলেও তার ওপর নির্ভর করেছিল এধা। আসলে এই দুঃসময়ে একজন ভাগীদার পেয়েছিল সে।

মিলিন্দ খবরটা শোনেনি। আগেভাগে অভাস পেয়েও মিলিন্দকে কিছু জানায়নি এধা। মিলিন্দও দুর্যোগ, অনিশ্চয়তার মধ্যে আছে। পাড়াছাড়া, বাড়িছাড়া সে। ডাক্তারের কাছ থেকে পাকা খবর না শুনে মিলিন্দকে ব্যস্ত, বিব্রত করতে রাজি হয় নি এধা। হাতের কাছে চন্দন ছিল। সব সময়ই আছে। সন্দেহটা তাকে জানিয়েছিল।

তারপর ডাক্তার ওষুধ যা করার, চন্দনই করেছে। এধাকে আগলে রেখেছে। সান্ত্বনা, সাহস জুগিয়েছে। অন্ধকার বাসস্টপে একা দাঁড়িয়ে চন্দনের জন্যে করুণা বোধ করলো এধা। নিজেকে নিষ্ঠুর মনে হলো। সৌভাগ্যের ভাগ না দিয়ে দুর্ভোগে কাউকে সঙ্গী করতে সংকোচ হয় তার। এধার মনে হলো, চন্দনের সরলতা, প্রীতি কাজে লাগাচ্ছে সে। ব্যবহার করছে। তখনই প্রশ্ন জাগলো, তার জন্যে কেন এতো করছে চন্দন? মিলিন্দর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার জন্যেই হয়তো তার প্রেমিকার বিপদে এগিয়ে এসেছে চন্দন। মিলিন্দর দেওয়া মাতৃত্বই বইছে এধা।

বিকেলের ঘটনা মনে পড়লো তার। ডাক্তারখানা থেকে চন্দনের সঙ্গে ফিরছিল সে। তাকে বাসে তুলে দিয়ে চন্দন বাড়ি যাবে। পাশাপাশি হাঁটছিল দুজনে। আড়চোখে চন্দনের মুখ একবার দেখে নিল এধা। তিনকোনা মুখে শক্ত, ঝুলোনো চোয়াল। মজবুত শরীর। সাড়ে পাঁচ ফুটের বেশি লম্বা নয়, অথচ দেখায় বেশি। খাপে বসানো স্থির, তীক্ষ্ণ চোখ। এক নজরে বোঝা যায় চন্দন বাস্তববাদী, মেপে পা ফেলে। অলীক স্বপ্ন না দেখলেও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস তার।

মতামত জানিয়ে দিয়েছিল ডাক্তার। চন্দন,-এধাকে স্বামী-স্ত্রী ভেবে নিয়ে ডাক্তার বলেছিল, প্রথম চাইল্ড, নষ্ট করবেন না। কেন করবেন? রেজিস্ট্রি যখন করাই আছে, সামাজিক বিয়েটা চুকিয়ে ফেলুন।

মুখ কালো করে ডাক্তারের কথা শুনছিল এধা। এক মুহূর্ত কিছু ভেবে ডাক্তার বললো, যা করার পনেরো দিনে করতে হবে। হ্যাঁ, টু উইক্স্। তারপর বিপদ হতে পারে।

কী বিপদ, প্রশ্ন করেনি চন্দন। প্রশ্ন করতে এধাও ভুলে গিয়েছিল। বাসস্টপে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে চন্দন বলেছিল, চিন্তার কিছু নেই।

এধা চুপ। চন্দন আবার বললো, ব্যাপারটা তুমি গুছিয়ে বলো মিলিন্দকে। এটা কোনো কেলেঙ্কারি নয়। হতেই পারে। স্বাভাবিক। দু'চার দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রি করে কলকাতার বাইরে কোথাও চলে যাও তোমরা। দরকার হলে থাকার জায়গা খুঁজে দেবো আমি। কিন্তু কিছুতেই যেন ধরা না পড়ে মিলিন্দ। তাকে বেধড়ক খুঁজছে পুলিশ। সাবধানে থাকতে ব'লো।

চন্দনের কথায় চমকে উঠেছিল এধা। এই দেড়, দু'ঘণ্টায় মিলিন্দর ধরা পড়ার প্রসঙ্গ দু'বার পাড়লো চন্দন। ডাক্তারের চেম্বারে ঢোকার আগেই এ আশঙ্কার কথা একবার শুনিয়েছে সে। গভীর চিন্তায় ডুবে ছিল এধা। শেষ বিকেলের ফ্যাকাসে আলোয় দুর্বোধ্য ঠেকছে চন্দনের তিনকোনা মুখ। ঝোলানো থুতনি লম্বাটে দেখাচ্ছে। গা ছমছম করছিল এধার। চন্দন বললো, কাল সকালে মিলিন্দর সঙ্গে দেখা হবে আমার। কথাগুলো তাকেও বলবো।

প্লিজ, দয়া করে তুমি কিছু বলো না মিলিন্দকে।

এধার গলার কাতরতায় অবাক চোখে তাকিয়েছিল চন্দন। কিছু আঁচ করে বলেছিল, ঠিক আছে। তুমি বারণ করলে মিলিন্দকে কিছু বলবো না আমি।

ট্রাফিক আলো জ্বলছে, নিভছে। বাস পেয়ে উঠে পড়লো এধা। গেটের পাশেই

বসার জায়গা পেল। মাথায় চিন্তার ঢেউ উঠছে, ভাঙছে, ফুঁসছে। চন্দন কি ভণ্ড? বন্ধু সেজে কোনো মতলব হাসিল করতে চাইছে? কেন বারবার মিলিন্দকে সাবধান হতে বলছে? এমন কিছু রাজনীতি মিলিন্দ করে না। বরং তার চেয়ে চন্দন বড়ো মাপের নেতা। ছাত্রজীবনে রাজনীতিতে নেমেছে সে। মিলিন্দকে রাজনীতিতে চন্দনই টেনে এনেছে। বনগাঁয় যে আন্দোলনে থাকার অভিযোগে মিলিন্দকে পুলিশ খুঁজছে, সে লড়াই-এ চন্দনও ছিল। মিলিন্দর চেয়ে অনেক বেশী জড়িত ছিল চন্দন। কলকাতা থেকে বনগাঁয় মিলিন্দকে নিয়েও গিয়েছিল চন্দন। কিন্তু মিলিন্দ বনগাঁয় যাবার পরে সরকারী ভেস্‌ট্ জমি দখলের আন্দোলনে শাসক দলের দু'জন খুন হয়ে গেল। কাগজে বেরোলো মিলিন্দর নাম। আড়ালে চলে গেল চন্দন। এক বছর আগের ঘটনা এটা। তখন থেকে গা ঢাকা দিয়েছে মিলিন্দ। তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে এধাকে চন্দনের সাহায্য নিতে হয়। পার্টি সংগঠনের দায়িত্ব চন্দনের চেয়ে এখন মিলিন্দর বেশি। তবে এধা চাইলেই তার সঙ্গে মিলিন্দকে দেখা করিয়ে দেয় চন্দন। তার সুবাদেই মিলিন্দর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল এধার। সে পরিচয় দিনে দিনে ভালোবাসা, প্রগাঢ় প্রেমে দাঁড়িয়েছে। চন্দনের চোখের সামনেই ঘটেছে সব। দুই বন্ধুর সম্পর্কের রূপান্তর উপভোগ করেছে চন্দন। দুজনের দিকেই বাড়িয়ে দিয়েছে স্নেহ, সহযোগিতার হাত। সময়ে, অসময়ে নানা দরকারে তাকে পাশে পেয়েছে এধা। বই কেনা, ওষুধ কেনা, নিউমার্কেট, সিনেমায়, ডাকলেই তার সঙ্গী হয়েছে চন্দন। মিলিন্দর চেয়ে চন্দনকে বেশি পেয়েছে সে। নির্ভর করেছে তার ওপর। কিন্তু চন্দন সঙ্গী, বন্ধু, তার বেশী নয়। মিলিন্দ তার প্রেমিক, প্রাণের আরাম।

ধর্মতলা পেরোতেই গাদাগাদি ভিড় হলো বাসে। চিন্তায় তলিয়ে গিয়েছিল এধা। কিছু সন্দেহ, সম্ভাবনা ঝিলিক দিচ্ছিল তার মাথায়। মনে হচ্ছিল তাকে, মিলিন্দকে ফাঁদে ফেলেছে চন্দন। অনেক দিনের চিন্তা, চেষ্টায় তৈরি এই ফাঁদে শক্ত, কঠিন। এধার স্মৃতিতে জেগে উঠলো দু'মাস আগের এক সন্ধ্যে। চন্দনের ছোট ভাই সবিতের সঙ্গে তাদের বিধবা মা রিষড়ায় বোনের বাড়ি গিয়েছিল সেদিন। ফাঁকা ফ্ল্যাট। কেউ ছিল না। বাড়ি খালি থাকবে আগের দিন অবশ্য এধাকে জানিয়েছিল চন্দন। সিনেমার দুটো টিকিট এধার হাতে দিয়ে চন্দন বলেছিল, এই ছবিটা দেখতে চেয়েছিল মিলিন্দ। অনেক চেষ্টায় তিনটে টিকিট পেলাম। কাল ইভ্‌নিং শো। পার্টির কাজে আজই কলকাতার বাইরে যাচ্ছি আমি। কাল সোজা সিনেমা হলে চলে যাব। আমার টিকিটটা রেখে দিলাম। কিন্তু আমাদের ফ্ল্যাটে কাল সাড়ে চারটেতে আসবে মিলিন্দ। মা, সবিত যে কাল রিষড়ায় মাসির বাড়ি যাবে, গতকালও জানতাম না। ফলে গোলমাল হয়ে গেছে পরিকল্পনা। মিলিন্দকে খবর পাঠাবারও সময় নেই। ফ্ল্যাট বন্ধ দেখে ফিরে যাবে সে। যাচ্ছেতাই হবে সেটা। এখন তুমিই উদ্ধার করতে পারো। তুমি যদি আমাদের ফ্ল্যাটে চারটেতে যাও, মিলিন্দকে নিয়ে সিনেমা হলে চলে আসো।

ফ্ল্যাটের চাবি হাতে কাঁচুমাচু মুখে চন্দন তাকাতে মুচকি হেসে এধা বলেছিল, ঠিক আছে, আমি যাবো।

বাঁচালে।

হাসি ফুটেছিল চন্দনের মুখে। পরের দিন চারটের আগেই চন্দনের ফ্ল্যাটে পৌঁছে গিয়েছিল এধা। বাড়ি থেকে বেরোবার সময় তার চোখে পড়েছিল ঘন কালো মেঘ জমেছে আকাশে। দু'দিগন্ত ফেঁড়ে ঘনঘন চমকাচ্ছিল বিদ্যুৎ। আকাশের চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছিল, বৃষ্টি শুরু হলে সহজে থামবে না। ভাসিয়ে দেবে শহর। বাড়ি থেকে সে বেরোবার আগে মা বলেছিল, আকাশের তো এই অবস্থা। আজ না বেরোলেই পারতিস।

সিনেমার টিকিট কাটা আছে।

জবাব শুনে চুপ করে গিয়েছিল রেণুকা, এধার মা। এ বছর এম. এ. পরীক্ষা দিয়েছে এধা। যে-কোনোদিন তার রেজাল্ট বেরোবে। এখন মেয়েকে আটকে রাখার কোনো মানে হয় না। আগেও রেণুকা আটকায়নি। চন্দনদের অন্ধকার, ফাঁকা ফ্ল্যাটে ঢুকে ভয় করছিল এধার। তাড়াতাড়ি আলো জেবলে, দুটো জানলা খুলে দিল। বিকট শব্দে বাজ পড়লো কোথাও। খোলা জানলা দিয়ে হু হু করে ঢুকে পড়লো ঠান্ডা হাওয়া। চড়চড় শব্দ তুলে তুমুল বৃষ্টি নামলো। সাড়ে চারটের একটু আগে মিলিন্দ যখন ফ্ল্যাটে এলো, ভিজে সপসপ করছে তার চুল, শরীর, পোশাক। গায়ে আটকে গেছে পাঞ্জাবি। পাজামার দুপাশের ঘের থেকে জল ঝরছিল। এধা বললো, ইস, কী দশা হয়েছে তোমার। ঠান্ডা লাগবে।

হেসে মিলিন্দ বলেছিল, ননীর পুতুল নই আমি।

তারপর কলঘরে ঢুকে এধাকে বলেছিল, ডানদিকের ঘরটা চন্দনের। ও ঘরের আলনা থেকে একটা পাজামা, পাঞ্জাবি দাও।

এ বাড়ির ঘর, আসবাব, আনাচ-কানাচ মিলিন্দর চেনা। কলঘরে ঢুকে কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে ভিজে পোষাক ছাড়লো সে। গায়ে জুড়ে যাওয়া ভেজা পাঞ্জাবি মাথার ওপর তুলে এধাকে ডেকে ঝুলিয়েছিল।

কলঘরের দরজা এঁটে স্নান সেরে চন্দনের পাজামা, পাঞ্জাবি পরে সে বাইরে আসতেই ফোন বাজলো। পার্টি দপ্তর থেকে ফোন করছিল চন্দন। প্রথমে ফোন ধরেছিল এধা। তারপর মিলিন্দ রিসিভার কানে লাগাতে চন্দন প্রশ্ন করেছিল, এ দুর্যোগে কী করে বেরোবি?

বেরিয়ে পড়বো। চলে আয় তুই।

জরুরি মিটিংএ আটকে গেছি। তোরা চলে যা। ন'টার সময় সিনেমা হলের সামনে দাঁড়াবো আমি। না গেলেও চিন্তার কিছু নেই। আমার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে না। ফ্ল্যাটের একটা চাবি পার্টি অফিসেও আছে।

রিসিভারের পাশে দাঁড়িয়ে দুই বন্ধুর কথা শুনছিল এধা। আগেও ঘটেছে এ ঘটনা। উল্টোভাবে ঘটেছে চন্দন এসেছে। মিলিন্দ পৌঁছোয়নি। তাকে বাদ দিয়ে চন্দনের সঙ্গে সিনেমায় যেতে বাধ্য হয়েছে এধা। রিসিভার রেখে মিলিন্দ প্রশ্ন করেছিল, তাহলে?

তার চোখে চোখ রেখেছিল এধা। রহস্যময় হয়ে উঠেছিল দু'জোড়া চোখ। এধা

বলেছিল, এভাবে ভিজে এসে আবার স্নান করা উচিত হয়নি তোমার।

বৃষ্টিতে ভেজার পর বাড়ি ফিরে ভালোরকম স্নানই হলো একমাত্র ওষুধ। স্নান করলে ঠাণ্ডা লাগে না, জ্বরজারি হয় না, মিলিন্দ বলেছিল।

বৃষ্টির কামাই নেই। আধপাল্লা জানলা খুলে মিলিন্দ দেখলো, বাতাসের দাপটে ধোঁয়ার মতো এলোপাথাড়ি উড়ছে জলের গুঁড়ো। ঝাপসা হয়ে আছে বাইরেটা। রাস্তা, বাড়ি, গাড়ি, মানুষ, কিছু দেখতে পেল না সে। তার কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুঁকে চারপাশ নজর করছিল এধা। তার শরীরের সুবাস, তাপ, সামান্য চাপে বেসামাল হলো মিলিন্দর রক্ত। শেষ শরতের প্রবল বৃষ্টিতে শীতল হয়ে গেছে আবহাওয়া। বৃষ্টির একটানা রিমঝিম শব্দ। দু'জনেই বুঝতে পারছিল যে, সিনেমা হলে পৌঁছোনো মুশকিল। দেখা হবে না ছবিটা। দেখা কী খুব দরকার?

চোখ তুলে এধা দেখলো, তার দিকে তাকিয়ে আছে মিলিন্দ। ছলছল করছে এধার চোখ, ঠোঁট কাঁপছে। তার দু কাঁধে হাত রেখে ঠোঁটের ওপর ঝুঁকে পড়লো মিলিন্দ। ঠোঁট থেকে সারা মুখ, গলা, বুক, শরীর, ভেসে গেল মোহন নেশায়।

এক, দেড় ঘণ্টা পরে মিলিন্দ টের পেল শুকিয়ে গেছে তার ভেজা চুল। ছেঁড়া মালার মতো নেতিয়ে পড়ে আছে এধা। ঘুমিয়ে পড়লো নাকি? এধার মুখে ক্লান্তির সঙ্গে মিশেছে তৃপ্তি, ঢলঢল লাবণ্য। তার গলা জড়িয়ে মিলিন্দ বলেছিল, কোনো ভয় নেই। খুব সতর্ক ছিলাম।

চোখ খুলে মিলিন্দর মুখে দুষ্টুমির হাসি দেখে তার বুকে মুখ গুঁজেছিল এধা। দুজনেই জানতো সতর্কতায় ফাঁক থেকে গেছে। মিলিন্দর সতর্কতা যেমন এধা শিথিল করে দিয়েছে, তেমনই উল্টোটাও ঘটেছে। এধার লঘু প্রতিরোধ এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিয়েছে মিলিন্দ। কাউকে ঠেকাতে পারেনি কেউ। ঠেকাতে চায়নি। জীবনটা ভেজা আতপচাল, তুলসীপাতা নয়। বিশুদ্ধ গঙ্গাজল খেয়ে মানুষ বাঁচে না। এসব মিলিন্দর কথা। এধাও মেনে নিয়েছে।

সেই সোনালী সন্ধ্যের স্মৃতি ক্রমশ বদলে গেছে। স্মৃতির সুতোয় তৈরী হয়েছে নিশ্ছিদ্র, কঠিন এক মাকড়শার জাল। এ জালের কারিগর চন্দন। সে ধূর্ত, কপট। নিজের জালে এধাকে বেঁধে ফেলেছে সে। এধা নিজেও জানে তার অপরাধ। সে অনুতপ্ত। মুখে অনুতাপের ছাপ না থাকলেও বিবেকের কামড় বোধ করছিল সে। মিলিন্দর সঙ্গে তার সম্পর্ক সবাই জানে। মিলিন্দর পার্টি, বন্ধুরা জানে শুরু থেকে। এধার বাড়িতেও খবরটা অজানা নেই। এ বিষয়ে একবার প্রশ্নও করেছিল রেণুকা। ভাসাভাসা জবাবে মায়ের প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়েছিল এধা। আসলে জবাব দেবার কিছু ছিল না তার। তিন বছর ঘনিষ্ঠ মেলামেশার পরেও আজ পর্যন্ত তাকে একবারও আমি তোমাকে ভালবাসি, তুমি আমার ভবিষ্যৎ স্ত্রী, একথা মিলিন্দ বলেনি। এমন কি অকালবর্ষার উদ্দাম, বিবশ সেই সন্ধ্যেতেও শুধু নাকচ আর ভাঙনের কথা বলেছে মিলিন্দ। সান্নিধ্যের নিবিড়, তুঙ্গ মুহূর্তে সে বলেছিল, ভালোবাসা বলে কিছু নেই। প্রেম, ভালোবাসা ছেঁদো শব্দ। ন্যাকামি। আমি বিশ্বাস করি না। মানুষের খিদে, তেষ্টা, মন্থনে আমার গভীর বিশ্বাস। খিদে,

তেষ্টা মহান, পবিত্র।

মিলিন্দর সব কথা শুনতে পাচ্ছিল না এধা। স্রোতের মতো বিগলিত হচ্ছিল সে। স্রোতের শব্দ শুনছিল।

মিলিন্দ না বললেও তার প্রেমিকা, বাকদত্তা এধা, এ খবর রটে গেছে। কীভাবে রটলো এধা জানে না। কিন্তু এ রটনাই সত্য, সর্বস্ব ভেবে নিয়েছিল সে। বাসে বসে হঠাৎ এক ভয়ানক সন্দেহে সে কেঁপে উঠলো। সেদিনের ষড়যন্ত্রে চন্দনের সঙ্গে মিলিন্দও কি হাত মিলিয়েছিল? ছকের শরিক ছিল?

বাসের ব্রেক চাপার তীক্ষ্ণ, ধাতব আওয়াজ হলো। পাশের মহিলার ওপর ছিটকে পড়লো এধা। দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রীরা মুহূর্তের জন্যে তালগোল পাকানো মাংসের মতো হয়ে গেল। বাসের ভেতর হল্লা, গালাগাল। চিন্তার খেই হারালো এধা। মনে মনে ঠিক করলো, অন্যায়, নোংরা চিন্তাকে আমল দেবে না সে। এতো নিচে মিলিন্দ নামতে পারে না।

কিন্তু সন্দেহ বড়ো সাংঘাতিক। জন্ম হলে· জীবাণুর মতো হুহু করে বেড়ে ওঠে। চেষ্টা করেও এধা ঝেড়ে ফেলতে পারলো না তার সংশয়। সন্দেহের সপক্ষে নিঃশব্দে যুক্তি খাড়া করতে থাকলো সে। কোনো ঘটনাই আকস্মিক, কাকতালীয় নয়। কার্যকারণ ছাড়া কিছু ঘটে না। সে সন্ধ্যেটাও আকস্মিক আসেনি। তাই আকস্মিকতার অজুহাতে নিষ্ঠুর সত্যকে আড়াল করা যাবে না। তা হবে আত্ম-প্রবঞ্চনা। এ কাজ সে করবে না।

সেগুন গাছের তলায় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে তার মনে হলো, গভীর জলে ডুবে যাচ্ছে সে। ধরার মতো একটা খড়কুটোও হাতের কাছে নেই।

মিলিন্দ যে এভাবে এধাকে ডোবাবে, চন্দন ভাবতে পারেনি। শুধু সে কেন, পার্টির কেউ ভাবেনি। মিলিন্দর কাছে পার্টির অগাধ প্রত্যাশা। অনেকে বিশ্বাস করে নেতৃত্বের শিখরে যাবে সে। এধাকে সহানুভূতি, সান্ত্বনা জানালেও মিলিন্দর আচারণে ক্ষুন্ন হয়েছে চন্দন। স্বাভাবিক, সাধারণ জীবন থেকে এ মুহূর্তে মিলিন্দ অনেক দূরে। পুলিশের তাড়ায় লুকিয়ে আছে। স্বাভাবিক জীবন সে যাপন করলে কোনো ঝামেলা হতো না। খবরটা পাঁচকান হবার আগে মিলিন্দ, এধার সম্পর্কের একটা সামাজিক চেহারা দেওয়া যেত। অজ্ঞাতবাসের সংযম, শৃঙ্খলা না মেনে ঘোর অন্যায় করেছে মিলিন্দ। তার জন্য সংগঠনের দুর্নাম হবে। চরম বিপদে পড়বে এধা। অপরাধের দায় এধাও এড়াতে পারে না। এ দুর্ঘটনায় তারও ভূমিকা আছে। অথচ চন্দন, তার এই ছাব্বিশ বছরের জীবনে এধার মতো মেয়ে দেখেনি। এধার সঙ্গে মিশে যে-কোনো পুরুষ খুশি, তৃপ্ত হবে। সে অকপট, অজটিল, খোলামেলা। আর পাঁচটা মেয়ের মতো তার চরিত্রে বানানো কিছু নেই। পারিবারিক শিক্ষা, সচ্ছলতাই হয়তো স্বাভাবিক, সুস্থ রেখেছে তাকে। মনের গভীরে এধার জন্যে গভীর আকর্ষণ বোধ

করে চন্দন। মিলিন্দ, এধার ঘনিষ্টতা বাড়ার সঙ্গে তীব্র হয়েছে এ আকর্ষণ। এক গোপন আক্ষেপ, হাহাকার তার বুকে মাঝে মাঝে জেগে ওঠে। এধা, মিলিন্দর যোগা-যোগে উদ্যোগ নেবার জন্যে ধিক্কার দেয় নিজেকে। তার কলেজের বন্ধু মিলিন্দ। মিলিন্দকে ভালোবাসে সে। বলা যায় মিলিন্দর গুণে সে মুগ্ধ। শিক্ষা, সাহস, ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মিলিন্দর আছে মৌলিকতা। তার বক্তৃতা, বিতর্কে উজ্জ্বল সেই দিন-গুলো আজও ভোলেনি চন্দন। সরাসরি রাজনীতি না করলেও তাদের সংগঠনের সমর্থক ছিল মিলিন্দ। তাকে সামনে রেখে বহু ছাত্রছাত্রীকে নিজেদের সংগঠনে টেনে এনেছিল চন্দন। তখনই একদিন ঘটেছিল এক ভয়ঙ্কর ঘটনা। বিরোধী সংগঠনের মার খেয়ে হাসপাতালে যেতে হলো তাকে। বেহুঁশ ছিল আটচল্লিশ ঘণ্টা। কলেজের ছাত্র সংসদের নির্বাচন হতে এক মাসও দেরি নেই তখন। হাসপাতালে তাকে দেখতে এসে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের সব দায়িত্ব মেনে নিয়েছিল মিলিন্দ। তাকে জয় করেছিল নবনীতা, কল্যাণ। নির্বাচনের দিনও কলেজে যেতে পারেনি চন্দন। তবু দারুণভাবে জিতেছিল তারা। তাদের সংগঠনের রাশ ধরেছিল মিলিন্দ। সেবছরই প্রথম সরাসরি রাজনীতি করেছিল মিলিন্দ। কিন্তু তাকে আর ছাড়েনি চন্দন। সব কাজে সামনে রেখেছে। মিলিন্দর বন্ধুবাৎসল্য অসম্ভব। চন্দনের কোনো অনুরোধ, নির্দেশ, ডাক এড়াতে পারে না সে। আজ পর্যন্ত এড়ায়নি। একটাই মিলিন্দর সমস্যা। তাকে দেখে বেশির ভাগ মেয়ে প্রেমে হাবুডুবু খায়। প্রেমে সায় না থাকলেও মেয়েদের কাউকে বিমুখ করতে পারে না সে। শুধু একবার জব্দ হয়েছে সে। তাকে কাঁদিয়ে-ছিল কমলকলি। ইঞ্জিনিয়ার স্বামী বিমল পালিতের সঙ্গে কমলকলি এখন বিলেতে। কমলকলির খবর এধাও জানে। মিলিন্দ বলেছে। সব কিছু জেনেই মিলিন্দকে মেনে নিয়েছে এধা। গোপনে কষ্ট পেলেও মিলিন্দ, এধার সম্পর্ক মেনে নিতে দ্বিধা করে নি চন্দন। এধার মুখে হাসি ফোটাতে, তাকে খুশি করতে সব সময়ে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছে সে। এধাকে সখী, বন্ধু মেনে নিয়েছে। আজও মানে। কিন্তু সেই সন্ধ্যের ছবি মনে পড়লেই তার বুকে মরুভূমির তৃষ্ণার্ত বাতাস বইতে শুরু করে।

বাতাস নয়, ক্ষ্যাপা ঝড়।

সিনেমার টিকিট পকেটে রেখে জরুরী বৈঠকে বসে মনমরা হয়ে গিয়েছিল সে। অস্বস্তির কাঁটা খচখচ করছিল বুকে। তাড়াতাড়ি সভা সেরে সিনেমা হলে একবার ঢুঁ মারার জন্যে টিকিটটা রেখেছিল। সুযোগও এসে গেল। সংগঠনের সম্পাদক একটা চিঠি ধরিয়ে দিল তাকে। বাগুইহাটিতে তখনই পৌঁছোতে হবে সে চিঠি। তুমুল বৃষ্টি। রাস্তায় বাস, ট্রাম থেমে গিয়েছিল। তার মধ্যে একজন ডেকে আনলো একটা ট্যাক্সি। বাগুইহাটি যাবার পথে একটা বই কেনার জন্যে কলেজ স্ট্রীটে নামলো সে। রাস্তায় থইথই জল। প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে পরিমল বিশ্বাসকে দেখে চমকে উঠলো চন্দন। খুশির চমক। চিঠি দেবার জন্যে বাগুইহাটিতে যার বাড়িতে যাচ্ছে, সে কলেজ স্ট্রীটে, চোখের সামনে, চন্দন বিশ্বাস করতে পারছিল না। পরিমল বিশ্বাসকে চিঠি দিয়ে বাড়িতে ফোন করার কথা একবার ভাবলো সে। হাতঘড়ি দেখে মনে হলো, মিলিন্দ, এধা বেরিয়ে পড়েছে। সেই ট্যাক্সিতেই সোজা সিনেমা হলে

পৌঁছোলো সে। অন্ধকার সিনেমা হল। ছবি শুরু হয়ে গেছে। পাশের দুটো সিট্ খালি। মিলিন্দ, এধা নেই। বর্ষা, দুর্যোগে নিশ্চয় বাড়ি থেকে বেরোতে পারেনি তারা। বিস্তর সিট খালি পড়ে আছে। অনেকেই আসতে পারেনি। মন খারাপ হয়ে গেল তার। অপরাধী লাগলো নিজেকে। তার ফোন পেয়েই হয়তো সিনেমা দেখা বাতিল করেছে মিলিন্দ, এধা। দুই বন্ধুর আমোদ মাটি করে এখন সে একা ছবি দেখছে। এ তার স্বার্থপরতা। চিন্তাটা মাথায় জাগতে চেয়ার ছেড়ে হলের বাইরে এলো সে। পরের দিন ছবি দেখার জন্যে আবার তিনটে টিকিট কিনতে গিয়ে টের পেল টাকায় কুলোবে না। ট্যাক্সি ভাড়া দিয়ে ফতুর হয়ে গেছে। বাস ধরে বাড়ি ফিরেছিল চন্দন। রাস্তা থেকে নজর করলো, ফ্ল্যাটের সব জানলা বন্ধ। আলো জ্বলছে ভেতরে। বৃষ্টির জন্যে নিশ্চয় জান লা বন্ধ করেছে মিলিন্দ। তাড়াতাড়ি দোতলায় উঠে এলো চন্দন। দুই বন্ধুর সঙ্গে দেখা হবে ভেবে খুশি হয়েছে সে। ঝিপঝিপ বৃষ্টিতে ভিজে গেছে পোষাক, শরীর। শীত করছিল। দরজার বেল্ টেপার আগে নিছক মজাতেই চাবির গর্তে চোখ রেখেছিল সে। সোজাসুজি তার ঘর, বিছানা। বিছানায় দৃষ্টি পড়তে মুছে গেল তার আদর্শ, রুচি, বিচক্ষণতা। নড়তে পারলো না, নজর সরাতে পারলো না সে। আলো জ্বলছে ঘরে। চড়া আলোয় ঝলসে উঠছে দুটো শরীর। নিখুঁত, নির্ভাঁজ, নগ্ন দুটি শরীর। তারা পরস্পরকে নিংড়ে নিশ্চিহ্ন করতে চাইছে।

দোতলা বাড়ি। তিনতলায় ছাত। দোতলার খালি ফ্ল্যাটে কেউ আসবে না জেনেই নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে ছিল চন্দন। দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছিল তার। মনে মনে সে বলেছিল, কী করছিস মিলিন্দ ?

আওয়াজ বেরোলো না তার মুখ থেকে। ব্যথায় টনটন করছিল ঘাড়, কোমর, হাঁটু। তবু নড়লো না সে। বিড়বিড় করল, মিলিন্দ, আমি জানি খেলা করছিস তুই। পরীক্ষা, নিরীক্ষার নিষ্ঠুর খেলা। কলেজে শুরু করেছিলি, আজও থামালি না। কমলকলি চলে যাবার পরে তোর হৃদয়হীনতা আরও বেড়েছে। এতো দুঃসাহস ভালো নয়। শেষ হয়ে যাবি তুই। নিজেকে শেষ করাই তোর মূল খেলা। এধাকে ছেড়ে দে। মেয়েটা সরল, নিষ্পাপ। জীবনের কাছে আজও অনেক প্রত্যাশা ওর।

দরজা ছেড়ে কখন রাস্তায় চলে এসেছিল, চন্দনের খেয়াল নেই। ভেজা পোষাক আরও ভিজলো। হাড়ের মধ্যে ঢুকে গেল জল। তবু দাউদাউ তাপে পাগলের মতো দেড়, দু'ঘণ্টা রাস্তায় ঘুরে বেড়ালো সে। অন্ধকার রাস্তায় একাকী এক কালো কুকুর জিভ বার করে মাটি শুঁকছে। অকারণে লালা ঝরছে তার জিভ থেকে। তীব্র অভাববোধে কুঁকড়ে যাচ্ছিল চন্দনের বুক। এ অনুভূতি তার অচেনা। কিছুক্ষণের জন্যে তার মাথা থেকে ঝরে গেল চেনা পৃথিবী, হাজার লক্ষ মানুষ, সযত্নলালিত আদর্শবাদ, সংগঠন। বুকের মধ্যে পাক খাচ্ছিল এক বিষক্ষুধা। হৃৎপিণ্ড কুরে কুরে ঢুকছিল তীক্ষ্মমুখ স্ক্রুড্রাইভার। লালচে কালো আকাশে তারা নেই। শরীর, মনের তাপ সামান্য জুড়োতে সে ভেবেছিল, কেন এ নির্বোধ বিকারে কষ্ট পাচ্ছে সে ? মিলিন্দকে কি সে হিংসে করে ? কেন ? এধার জন্যে কি নষ্ট হলো তার কাণ্ডজ্ঞান ?

এতো খারাপ, ইতর সে ?

একটা প্রশ্নেরও জবাব না পেয়ে ছটফট করছিল চন্দন। শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল তার গলা, বুক। ইলশেগুঁড়িতে ভিজছে মাথা। সোনালি, নিটোল মাখনের মতো এধার শরীর দেখে পুড়ে গেছে তার চোখ। চোখ জ্বালা করছে। নিজের বিরুদ্ধে আক্রোশে ফুঁসছিল চন্দন। তারই প্রেমিকা হবার কথা ছিল এধার। মিলিন্দর অনেক আগেই তার সঙ্গে এধার চেনাজানা। এধার সঙ্গে বহুবার দীর্ঘসময় কাটিয়েছে সে। অন্তরঙ্গ, সহজ ছিল এধার আচরণ। সে অন্তরঙ্গতা আজও মিলিন্দ-এধার হয়নি। তবু মিলিন্দই এধার প্রেমিক। বেশী অন্তরঙ্গকে মেয়েরা বোধহয় প্রেমিক নির্বাচন করে না। চিন্তাটা চাবুক মারলো চন্দনকে। আদর্শ, দায়িত্ব, সংগঠন, নেতার দীপ্ত মুখ ভেবে অন্যায় চিন্তাগুলো তাড়াতে চাইছিল সে। এধার প্রেমিক মিলিন্দ না হলেও তার প্রেমিকা এধা। এধা সৎ, মমতাময়ী। তার জন্যে লোলুপ হওয়া পাপ। সখি, বন্ধুই তাকে ভাবতে হবে সারাজীবন।

পাড়ার ফাঁকা চা-দোকানে ঢুকে একটা চেয়ারে বসেছিল চন্দন। উনুন থেকে বেরোচ্ছে কাঁচা কয়লার ধোঁয়া। দোকানী অনন্ত চা দিল এক কাপ। বিদ্যুৎ চমকালো আকাশে। আবার হয়তো বৃষ্টি হবে রাতে। চায়ের কাপে চুমুক দিল। চা শেষ হতে একটু সুস্থ বোধ করলো সে। দামাল চিন্তাগুলো সংযত হলো ধীরে ধীরে। বাড়ি ফিরেছিল রাত আটটায়। মিলিন্দ, এধা তখন গুছিয়ে বসেছে। তবু মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল এধা।

এধাকে বাসে তুলে হাঁটতে শুরু করেছে চন্দন। সংগঠনের দপ্তরের দরজায় পৌঁছে হুঁশ ফিরলো তার। মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাইলো সেই সন্ধ্যের স্মৃতি। পার্টি অফিসে ঢোকার আগে সে ভাবলো, এধার খবর এতোক্ষণে নিশ্চয় জেনে গেছে মিলিন্দ। এ মুহূর্তে কী করছে তারা ?

মিলিন্দদের সংগঠনের কয়েকজন ছেলের ওপর চটেছিল পরমেশ। রাগে সে বিড়বিড় করল, ছাগল, সব ছাগল।

পরমেশের চটার কারণ আছে। তার পেশা সম্পর্কে কেউ বাড়তি আগ্রহ দেখালে রেগে যায় সে। পেশার প্রশ্ন তুলে তাকে বেকাদায় ফেলতে চায় তরুণ ছেলেরা। তারা সন্দেহ করে তাকে। পরমেশ আজকের লোক নয়। চল্লিশ ছুঁইছুঁই। পার্টির সক্রিয় কর্মী ছিল একদা। অথচ সেদিনের ডেঁপো ছোকরাগুলো কাল রাজনীতিতে এসে সন্দেহ করে তাকে। কথাটা ভেবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে গেল সে। সত্যি কি ছেলেগুলো সন্দেহ করে, বিদেশী সংস্থার চর ভাবে তাকে ? প্রশ্ন জাগতে তার স্নায়ু, শিরায় ছড়িয়ে পড়লো হিমেল ভয়। বিদেশী সংস্থার চর, এ অপবাদ অনেকদিন শুনছে সে। পার্টিই শুরু করেছিল তার বিরুদ্ধে এ প্রচার। কিন্তু গ্রাম উজাড় হবার আশঙ্কায় এ নিয়ে

বিশেষ খোঁচাখুঁচি করেনি। কিন্তু এখনকার ছেলেরা শুধু ছাগল নয়, ত্যাঁদোড়ও! লোকের হাঁড়ির খবর পর্যন্ত টেনে বার করে। তার জীবিকার হদিশও যদি ছেলেগুলো জেনে যায়? মিলিন্দর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বললে অনেক খবর পাওয়া যেত। কিন্তু কোথায় মিলিন্দ? প্রায় মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল সে। পরমেশের ছেলের বয়সী ছেলেরা তাকে স্পাই, গুপ্তচর, ফেউ ভাবছে। কী স্পর্ধা!

ছেলে সায়নের কথা ভেবে টনটন করছে পরমেশের বুক। এখন তার ছেলে নয় সায়ন। সে এখন তার মা, বন্দনার ছেলে। হ্যাঁ, শুধু মায়ের ছেলে সায়ন। তার বাবা থেকেও নেই। পরমেশও তাই। বাবা হয়েও বাবা নয় সে। তার একটি ছেলে আছে এবং নেই। দিন কয় আগে এক বিয়েবাড়িতে বন্দনার মুখোমুখি পড়ে গিয়েছিল পরমেশ। ভূত দেখার মতো চমকে উঠেছিল বন্দনা। পরমুহূর্তে ঘৃণায় কুঁকড়ে গিয়েছিল তার তলার ঠোঁট। এ অভিব্যক্তি পরমেশের চেনা। বন্দনার পাশে যে তরুণ ছেলেটা দাঁড়িয়েছিল, একনজরেই তাকে চিনেছিল পরমেশ। তার বুকে বাজছিল প্রাগৈতিহাসিক এক ঘণ্টা। সায়ন, সায়ন, কান্নার মতো ছড়িয়ে পড়ছিল সে ঘণ্টাধ্বনি। সায়নের হাত ধরে তাড়াতাড়ি ভিড়ে মিশে গিয়েছিল বন্দনা। তারপর বোধহয় ছেলেকে নিয়ে বিয়েবাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল সে। মা, ছেলেকে আর সেখানে দেখেনি পরমেশ।

সামনে মজা খাল। খাল পাড়ে বটতলায় বাঁধানো চাতালে কালীমূর্তির সামনে সন্ধ্যেপ্রদীপ জ্বলছে। কালীমূর্তির লাল টকটকে জিভে নাচছে প্রদীপের আলো। এধার সঙ্গে দেখা করে পরমেশ জানতে চায়, তার বিরুদ্ধে ছেলেরা কী বলছে? আজকাল এধাও কেমন বদলে গেছে। শুকনো মুখ, আলুথালু চেহারা। পরমেশের সঙ্গে কথা না বলতে পারলে যেন সে বেঁচে যায়। অথচ এ মেয়েকে জন্মাতে দেখেছে পরমেশ। ছেলেবেলায় কোলে নিয়ে কতো আদর করেছে। লজেন্স, টফি দিয়েছে। এধার ছোটকাকা নিরুপমের সঙ্গে পরমেশের অনেক দিনের বন্ধুত্ব।

পরমেশ শুনেছে মিলিন্দর সঙ্গে প্রেম করছে এধা। সে ছোকরা বেশ কিছুদিন বেপাত্তা। তার সঙ্গে অনেকদিন পরে আজ পরমেশের দেখা হলো। মিলিন্দর জ্যাঠতুতো দাদা কুণাল, পরমেশের বন্ধু। কুণালের ফ্ল্যাটেও যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে মিলিন্দ। পরমেশকে কুণাল অন্তত তাই বলে। আপাদমস্তক চাদর মোড়া মিলিন্দকে হঠাৎ সামনে দেখে তাই চমকে গেল পরমেশ। মনে হলো, টেলিপ্যাথিতে সে টেনে এনেছে মিলিন্দকে। তার সঙ্গে পরমেশের কিছু কথা ছিল। সুযোগ দিল না মিলিন্দ। মিলিন্দ চলে যেতে সিমেন্টের সাঁকোর দিকে হাঁটতে শুরু করল পরমেশ। কুণালের বাড়িতে এখনই একবার যেতে হবে তাকে। একটা গোরুর গাড়ির বাঁদিকের চাকা খালের দিকে নেমে গেছে। বলদ দুটোকে অমানুষিক চাবুক মারছে চালক। দুটো বোবা পশু অনেক চেষ্টাতেও টেনে তুলতে পারছে না গাড়ি। তাদের কস বেয়ে দরদর করে লালা পড়ছে। গাড়ির চার পাশে ভিড় করেছে বস্তির মানুষ। মজা দেখছে তারা।

মাথা থেকে চাদর সরিয়ে একটা সিগারেট ধরালো মিলিন্দ। ডানদিকে লেক, বাঁ পাশে আকাশছোঁয়া বাড়ির লাইন। সাঁ-সাঁ করে রাস্তায় ছুটে চলেছে গাড়ি। মিলিন্দর ঘাড়ের ওপর খসে পড়লো হিমশীতল শুকনো একটা পাতা। শিথিল পায়ে তার সামনে এগিয়ে এসেছে এধা। এধার চেহারায় আভিজাত্য, সৌন্দর্য থাকলেও তীক্ষ্ণতার অভাব। আভিজাত্য, সচ্ছলতার সঙ্গে বোধহয় বুদ্ধিমত্তার বিরোধ আছে। এধা পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি লম্বা। মিলিন্দ পাঁচ আট। কিন্তু হঠাৎ দেখে তার চেয়ে লম্বা মনে হয় এধাকে। ঝকঝকে ফর্সা এধার গায়ের রঙ। কপাল, মুখ, নাক নিখুঁত। ঠোঁট এবং চিবুক ভোঁতা, খাপছাড়া পুরুষালী। লম্বা নিটোল দু'পা, কোমরের তলা পর্যন্ত ছাপিয়ে পড়া ঘন কালো চুল। এধার শরীরে ডুবে সেই বৃষ্টির সন্ধ্যেতে সময়, পরিবেশ ভুলে গিয়েছিল মিলিন্দ। এ মুহূর্তে এধাকে মনে হচ্ছে অন্ধকারের একটা স্তূপ।

মিলিন্দকে দেখে এধা হাসলো। হাসতে গিয়ে চড়চড় করে উঠলো মিলিন্দর ঠোঁট। ঠোঁট ফেটেছে শীতে। জ্বালা করছে। স্টেডিয়ামের সামনে অন্ধকার মাঠে বসলো দু'জন। তাদের মতো কয়েকজোড়া যুবক-যুবতী ছড়িয়ে আছে মাঠে। ফিসফিস কথা, দুর্বোধ ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। স্টেডিয়ামের কিছু ঘরে আলো জ্বলছে। দু'জনের শরীরের চাপে খরখর করছে ঘাসে পাতা সেলোফেন পেপার। একটা খবর শোনার প্রতীক্ষা করছে মিলিন্দ। অন্ধকারে ফস করে জ্বলে উঠলো একটা দেশলাই কাঠি। সিগারেট ধরাচ্ছে কেউ। এধা বলল, যা ভেবেছিলাম, তাই।

মিলিন্দ চুপ। এধা প্রশ্ন করল, কথা বলছো না কেন?

মিলিন্দ ভাবছিল, আমি জানতাম। আমি জানতাম। যা ভেবেছি, ফলে গেছে।

এধার প্রশ্নে সম্বিত পেয়ে সে বলল, রেজিস্ট্রিটা করা দরকার। কবে করা যায়?

তুমি কি সত্যি একথা ভাবছিলে?

এধার প্রশ্নে শক্ত হলো মিলিন্দর শরীর। শীত করছে তার। সে বলল, নাহ্, অন্য কথা ভাবছিলাম।

এক মুহূর্ত থেমে সে আবার বলল, তার মানে এই নয় যে, রেজিস্ট্রির কথা ভাবতে আমি রাজি নই। বরং এখনই একটা দিন পাকা করতে চাই।

গায়ে গা লাগিয়ে বসেও তারা কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। মাঝে মাঝে জ্বলে উঠছে দেশলাই। টুপটুপ শিশির পড়ার শব্দ। এধা প্রশ্ন করলো, তুমি কি ভালোবাসো আমাকে?

অবশ হলো মিলিন্দ। এধার মুখ দেখা না গেলেও উত্তরের জন্যে সে তাকিয়ে, বুঝতে মিলিন্দর অসুবিধে হলো না। মাথার ওপর তারায় ভরা স্লেটের মতো

আকাশ। দূর আকাশও জবাব শুনতে প্রতীক্ষা করছে।

হ্যাঁ, বাসি।

জবাব দিয়েই মিলিন্দর মনে হলো, সে কি ঠিক বললো! ভালোবাসা কী? কাকে বলে ভালোবাসা?

আমাকে ভালোবাসার কথা কখনও বলোনি তুমি, আবছা গলায় এধা বললো, তবে বিশেষ বিশেষ সময়ে, অন্য তাগিদে কয়েকবার বলেছো।

লেকের পূর্বদিকের কলোনিতে বিকট শব্দে পরপর কয়েকটা বোমা ফাটলো। ডানা ঝাপটে ডেকে উঠলো গাছে গাছে ঘুমন্ত পাখি। দূর থেকে ভেসে আসছে কোলাহল, কুকুরের ডাক। আবার ফাটলো একাধিক বোমা। আলো নিভিয়ে, দরজায় তালা লাগিয়ে স্টেডিয়ামের ঘরগুলো থেকে একে একে চলে যাচ্ছে মানুষ। অন্ধকার চঞ্চল। ঘনিষ্ঠতায় লগ্ন তরুণ-তরুণীরা মাঠ ছেড়ে ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে। প্রায় ফাঁকা হয়ে গেল মাঠ। নির্জন মাঠের অন্ধকারে আরও কিছু যুগলের সঙ্গে বসে থাকে মিলিন্দ, এধা। মাটি ছুঁয়েছে ঘন কুয়াশা।

প্রশ্নের জবাব কিন্তু পেলাম না, এধা বলল।

মিলিন্দ ভাবছে ভালোবাসা শব্দটা মেয়েরা কেন এভাবে বারবার শুনতে চায়? কী তৃপ্তি, আনন্দ পায়? ভালোবাসা শব্দটায় মেয়েদের কেন এমন সীমাহীন ভালোবাসা?

এধার প্রশ্নে সজাগ হলো মিলিন্দ। বলল, সত্যি কথা বলতে কি, ভালোবাসা কাকে বলে, আমি জানি না। বুকের মধ্যে কখনও তীব্র একাকীত্ব, অতৃপ্তি জাগলে মনে হয়, ভালোবাসা চাই। কিন্তু ভালোবাসা কোথায়?

কথা, প্রশ্ন, জবাব, একা চালিয়ে যাচ্ছে মিলিন্দ। এক মিলিন্দ হয়ে গেছে অনেক। সে বলল, তোমার মতো ঘনিষ্ঠতা আর কোনো মেয়ের সঙ্গে হয়নি আমার। কমলকলি যুবক করেছিল আমাকে। তুমি করেছো পুরুষ। তোমাকে না দেখলে কষ্ট পাই, অশান্ত হয় শরীর, মন। এর নাম বোধহয় ভালোবাসা। কষ্টের এই মুহূর্তের নামই হয়তো প্রেম। পর্দা ঢাকা কেবিনে তোমাকে কয়েক ডজন চুমু খেয়ে মনে হয়েছিল, এতোক্ষণে বুঝলাম প্রেমের স্বরূপ। কিন্তু তারপর শুরু হলো আরো কষ্টকর দাহ। বুঝলাম চুমুতে প্রেম নেই। আরও কিছু চাই। তন্নতন্ন করে তোমার শরীর ছুঁয়ে অস্বস্তি, দাহ কমতে ভাবলাম, এতোদিনে প্রেম কাকে বলে জানা হলো। বেশিদিন স্থায়ী হলো না এ বোধ। একদিন এলো সেই সন্ধ্যে। কয়েক ঘণ্টা সম্পূর্ণভাবে পেলাম তোমাকে। সেদিন মনে হয়েছিল শারীরিক মিলন, তৃপ্তি প্রেমের শেষ কথা। কয়েকদিন যেতেই বুঝলাম, আমার ধারণা ভুল।

চুপ করো, তুমি চুপ করো।

এধার আর্তগলা শুনে মিলিন্দর ধারণা হলো আজেবাজে বকছে সে। কথা আটকে গেল তার। লজ্জা, অপমানে এধা কাঁপছে। মিলিন্দর মনে হলো, ফুলের পাপড়ি ছিঁড়ে ছিঁড়ে যে গন্ধের কাছে সে পৌঁছোতে চাইছে, সেখানে কোনদিন যাওয়া হবে না তার।

দুটো ডাগর চোখে এধা দেখতে চাইছে মিলিন্দকে। আবছা দেখা যাচ্ছে তাকে। ছিপছিপে, পেটানো লম্বা শরীর, খাড়া নাক, পাতলা ঠোঁট, দুচোখ তীক্ষ্ণ, ব্যঞ্জনাময়, দুটো লম্বা হাত, এলোমেলো কটা চুল, অন্ধকারে স্পষ্ট হয়ে উঠছে মিলিন্দ।

মিলিন্দ, আমার মিলিন্দ, অন্ধকারে নিঃশব্দে ডুকরে উঠলো এধা। সে জানে বাবা, মা, ভাইবোন, সবাই থাকতেও মিলিন্দর কেউ নেই। বাড়ির সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় য়ুনিভার্সিটিতে পড়ার সময় থেকে শিয়ালদার একটা মেসে আছে সে। ভালো ছাত্র। দু'বছর আগে ইতিহাসে এম এ পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাস্ পেয়েছিল। টুইশান করে বেঁচে আছে। এধা তখন ইতিহাসে অনার্স পড়ছে। তাকে পড়াবার জন্যে একদিন মিলিন্দকে বাড়িতে নিয়ে এসেছিল চন্দন। এধার মা, বাবা অপছন্দ করেনি মিলিন্দকে। তারপর বেরোলো আরও পরিচয়। পরমেশদাও চিনলো মিলিন্দকে। বললো, ও হচ্ছে আমার বন্ধু কুণালের খুড়তুতো ভাই। কুণালের বাড়িতে মাঝে মাঝে যায়। ছাত্র ভালো, কিন্তু একটু ডেঁপো।

শিক্ষক, ছাত্রী থেকে তারা হলো বন্ধু। গভীর হলো পরিচয়। অথচ আজও এধার কাছে অচেনা রয়ে গেছে মিলিন্দ।

রাত বাড়ছে। অন্ধকার পৃথিবীতে জেগে উঠছে আর এক পৃথিবী। দুহাতে জড়িয়ে ধরে, বুকে মুখ রেখে মিলিন্দকে চেনার চেষ্টা করছে এধা। মিলিন্দ ভাবছে, ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে তার সব ছক, পরিকল্পনা। একটা স্কাইস্ক্রাপারের ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে গেছে সে। গতানুগতিক জীবন ছেড়ে বেরিয়ে আসতে গিয়ে জড়িয়ে পড়েছে সেই জীবনের জালে। অথচ গতানুগতিক হতে কোনো অসুবিধে ছিল না তার। সহজেই হতে পারতো। সুযোগ ছিল। সুযোগ নেয়নি সে। সারাজীবন জীবন্ত থাকার জেদে সব কিছু তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে। কয়েকটা জীবন্ত মুহূর্তের যোগফল জীবন নয়। জীবন্ত মুহূর্তগুলোকে একটানা, নিরবচ্ছিন্ন করতে চেয়েছিল সে। পারেনি। কেন? কেন? জন্মের সঙ্গে বিধিনিষেধ, নিয়মের একটা রুটিন তার গলায় বেঁধে মহাসমুদ্রে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে তাকে। রুটিনের ভারে হাবুডুবু খাচ্ছে সে। রুটিন অনুযায়ী ঘণ্টায় ঘণ্টায় ক্লাস বদল করে নির্ভুল পাঠ সে শিখে নিতে পারেনি। এধা বলল, এবার আমাদের ওঠা উচিত।

সজাগ হলো মিলিন্দ। বলল, একটা দিন আজই ঠিক করা দরকার। রাজনৈতিক অবস্থা খারাপ। কাল কোথায় থাকবো জানি না।

এধা নিস্তব্ধ। বলার কথা খুঁজে পাচ্ছে না। তাকে বিয়ে করে মিলিন্দ কোথায় তুলবে? কীভাবে চলবে তার সংসার? যে আসছে, তার কী হবে? আর আমাদের ভালোবাসা?

শেষ প্রশ্নের হুংকারে বাঘিনী হলো এধা। জানতে চাইলো, আমাকে ভালোবাসো তুমি?

মিলিন্দ চুপ।

কথা বলো।

মিলিন্দ বলল, আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে চাও তুমি? মিথ্যেবাদী, প্রতারক

বানাতে চাও ?

একমুহূর্ত চুপ থেকে সে বলল, নাহ্, মিথ্যে বলবো না। প্রেম, ভালোবাসা, কাকে বলে আমি জানি না। সে-সব কিছু আছে কিনা, মনেই পড়েনা আমার। ছেঁদো, গতানুগতিক এ সব শব্দে আমার অরুচি। গা ঘিনঘিন করে। প্রেম, ভালোবাসার সংজ্ঞা না জানা পর্যন্ত এ নিয়ে আর প্রশ্ন ক'রো না আমাকে।

অনর্গল কথা বলছে মিলিন্দ। প্রেম, ভালোবাসা যাই বলো, মস্তিষ্কের ব্যাপার। দেহের ক্ষুধার সঙ্গে মাথার যোগ নিশ্চয় আছে। কিন্তু সবটা মাথা নয়। মাথা দেহের অংশ। অথচ শুধু মাথা নিয়েই আমাদের মাথাব্যথা। দেহজ আকাঙ্ক্ষায় দারুণ ঘৃণা, ঘোর আপত্তি। এ তঞ্চকতায় আমি নেই। আমার মস্তিষ্ক আছে কি নেই, জানি না। দেহ আছে। দেহ আমার কাছে সবচেয়ে দামী. পবিত্র।

রাতের আকাশের তলায় অন্ধকার, ফাঁকা মাঠ যেন এক মঞ্চ। এধার থেকে সামান্য দূরে সরে গেছে মিলিন্দ। সে বলছে, মানুষের ভাতের যারা সংস্থান করতে পারে না, প্রেম, ভালোবাসা ইত্যাদি শব্দ সেই ষড়যন্ত্রীদের আবিষ্কার। পবিত্র যৌনতা বন্দী রাখতে তারা খুলেছে ধেনোমদের ভাঁড়ার, বেশ্যাপল্লী। প্রেম ভালো-বাসার ফেরিওলারা কেউ প্রেম, ভালোবাসায় বিশ্বাস করে না। তাদের ঘরে থাকে জালা জালা চোলাই, মদ, আর অগুনতি রক্ষিতা। শরীরতত্ত্ববিদদের মতে ষোল থেকে কুড়ি বছরের ছেলেমেয়েরা সব চেয়ে উর্বর। প্রবল তাদের সৃষ্টিক্ষমতা। এ খবরে ভয় পেয়ে সমাজের মাতব্বরেরা এই বয়সের ছেলেমেয়েদের নানা ছুতোয় বন্দী করে রাখতে চায়। কিন্তু তাদেরও ক্ষিধে আছে। ক্ষিধের নিবৃত্তি চাই। ক্ষিধে না মিটলে ভাঙচুর হতে পারে। তাই প্রেম, ভালোবাসার ঝুমঝুমি তাদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছে অভিভাবকরা। এ প্রেম বিশুদ্ধ, কামের গন্ধ নেই। অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠার আগে উল্টো কিছু করলেই তরুণ-তরুণীরা ধ্বংস হয়ে যাবে। প্রতিষ্ঠা পেলে প্রেম, যৌনতার গলাগলি হ্যান্ডশেকে আর আপত্তি থাকে না। তরুণ প্রাণের প্রাচুর্য, সৃজনশীলতা এভাবে হাজার হাজার বছর ধরে ধ্বংস করা হচ্ছে। যাদের সঙ্গতি, সামর্থ্য নেই, তাদের জন্যে যৌনতা নিষিদ্ধ। যাদের টাকা আছে, তাদের সাত খুন মাপ।

কথার মধ্যেই মিলিন্দর মনে হ'ল রেজিস্ট্রির দিনটা পাকা করা জরুরী। সে বলল, ম্যারেজ অফিসারের সঙ্গে :কথা বলে ঠিকঠাক করছি। চন্দনের কাছ থেকে খবর পাবে।

কথা বলছে না এধা। মিলিন্দ ডাকলো, এধা !

এধা নিরুত্তর, জবাব নেই। সামনে, ডাইনে, বাঁয়ে তাকিয়ে এধাকে দেখতে পেল না সে। নির্জন, অন্ধকার মাঠে এতোক্ষণ একা কথা বলেছে সে। কোথায় গেল এধা ? কখন গেল ? হঠাৎ মিলিন্দর মনে হলো, এধা কি এসেছিল ?

শরীরের তলায় সেলোফেন পেপার খরখর করে উঠতে অন্ধের মতো চারপাশে হাত বুলিয়ে এধাকে ছুঁতে চাইল সে। শিশিরে ভিজে গেছে দু'হাতের পাতা। ছন্ন-ছাড়া দুঃখে হা হা করছে বুক। গলা শুকনো কাঠ। চীৎকার করে মিলিন্দ ডাকলো, এধা !

কেউ উত্তর দিল না। মাথার ওপর গাছে ডানা ঝাড়লো একটা পাখি। দূরে থেকে ভেসে আসছে কুকুরের ডাক।

থমথমে, অস্বস্তিকর ঘরের পরিবেশ। বিরক্ত কুণাল একটা সিগারেট ধরিয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো। জমাট কুয়াশার মধ্যে ম্যাড়মেড়ে দেখাচ্ছে ল্যাম্পপোস্টের আলো। রাস্তার মোড়ের চায়ের দোকানে ইলেকট্রিক্ নেই। টিমটিম করে রোজ একটা হ্যারিকেন জ্বলে। বারান্দা থেকে দোকানটাকে পাহাড়ি গুহার মতো দেখায়। রাস্তায় যাতায়াত করছে কিছু মানুষ।

কুণালের স্ত্রী ছায়া। রাগে থমথম করছে তার মুখ। শোবার ঘরে খাটে পুতুলের মতো বসে আছে সে। খাটের পাশে টিপয়ের ওপর ফুলদানিতে একগোছা শুকনো রজনীগন্ধা। কুণাল, ছায়ার বিয়ের পাঁচ বছর পূর্ণ হলো কাল। ফুলগুলো বিবাহ-বার্ষিকীর স্মৃতি। বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসলো কুণাল। সামনে টেবিলের ওপর পাতা খোলা গতকালের স্টেট্‌স্‌ম্যান। পত্রিকায় ব্যক্তিগত কলমে তাদের বিবাহ-বার্ষিকীর খবর। খবরের তলায় লাল পেন্সিলের দাগ। উদ্যোগ নিয়ে কুণালই ছেপেছিল এই সাড়ম্বর সুখের ঘোষণা। বিজ্ঞাপনটা এখন তীরের মতো বিঁধছে তাকে।

অফিস থেকে বাড়ি ফিরতে আজ সামান্য দেরী হয়েছে তার। অজুহাত তৈরী করে হাসিমুখে ফ্ল্যাটে ঢুকেছিল সে। সরল গলায় ছায়া প্রশ্ন করেছিল, এতো দেরী?

বড়োসাহেবের জরুরী ফাইল, আর ব'লো না।

কুনালের জবাব শুনে শিশুর সরলতা মুছে কঠিন, নির্মম হলো ছায়ার মুখ। সে বললো, তুমি লায়ার, মিথ্যেবাদী।

বোবা হয়ে গিয়েছিল কুণাল। ছায়া বললো, দু'বার ফোন করেছিলাম তোমার অফিসে তোমাদের বড়োসাহেবই ফোন ধরে বললেন, দুপুর একটায় অফিস থেকে বেরিয়ে গেছো তুমি। আর ফিরবে না।

ছায়ার কণ্ঠস্বরে ক্ষুরের ধার। কী বলবে, ভেবে পেল না কুণাল। ছায়া আবার প্রশ্ন করেছিল, চেকবই খুঁজে পেলে?

নাহ্।

কুণালের জবাবে আত্মবিশ্বাসের অভাব ছিল। তার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে ছায়া বলল, আমি পেয়েছি। খাট থেকে তোমার একটা ফাইল টেবিলে রাখার সময় চেকবইটা পড়ে গেল মেঝেতে।

ছায়ার মুখে বাঁকা হাসি।

গোয়েন্দাগিরি করছো আমার ওপর? ক্রিমিনাল নাকি আমি?

কুণালের ঝাঁঝালো প্রশ্নের জবাবে ছায়া বলেছিল, জানি না। তবে এ মিথ্যে আর সহ্য হচ্ছে না আমার।

গতকালও অফিস থেকে ফিরতে দেরী করেছিল কুণাল। অফিসের কাজেই দেরী হয়েছিল। অশান্তি করল ছায়া। থমথমে মুখে চলে গেল পাশের ঘরে। কুণাল ভেবেছিল, বাইরে যাবার জন্যে পোষাক বদলে তৈরি হচ্ছে ছায়া। বছরের এ দিনটায় বাইরে যায় তারা। গত তিন বছর তাই হয়েছে। কুণাল ঢুকেছিল বাথরুমে। মেজাজ খিঁচড়ে গেলেও স্নান করে ঠাণ্ডা হতে চাইছিল সে।

গতকালের সেই ভয়ঙ্কর ঘটনাটা ভুলতে রাস্তার দিকে তাকালো কুণাল। বারান্দার ঠিক নিচে চাপা গলায় কথা বলছে দু'জন মানুষ। মাঝে মাঝে চোখ তুলে বারান্দার দিকে তাকাচ্ছে। আশঙ্কায় গুড়গুড় করে উঠলো কুণালের বুক। পুলিশ নাকি? মিলিন্দর এখানে যাতায়াতের খবর কি জানাজানি হয়ে গেল?

বারান্দায় জ্বলছে অল্পশক্তি আলো। গল্প করতে করতে অচেনা লোক দু'জন চলে গেল। খালপাড়ে বাজছে মাইক। বারান্দা থেকে কুণাল টের পাচ্ছে, মুখের সামনে একটা সাময়িক পত্রিকা খুলে খাটে বসে আছে ছায়া। আড়চোখে তাকে দেখলো কুণাল। পরিষ্কার চাদর পাতা ডাবল্ খাট। ঠিক ডাবল্ নয়, আড়াই জনের জায়গা আছে। পাঁচ বছর পরেও খালি পড়ে আছে আধজনের জায়গা! আধজন আসেনি। কুণাল, ছায়ার আজও ছেলেমেয়ে হয়নি। অথচ একটা সন্তান খুব দরকার। ছায়ার সুস্থতার জন্যেই একটা শিশু চাই। রান্নাঘর থেকে ভেসে আসছে হাতা, খুন্তির শব্দ। রাঁধুনির কাশির খুকখুক আওয়াজ। এই ফ্ল্যাট, নিলামে কেনা আসবাবপত্র, পুরোনো থালা, বাসন, ফ্রিজের সঙ্গে অমোঘ নিয়মে জড়িয়ে পড়ায় নিজের ওপর কুণালের ঘৃণা হয়। ছায়ার সঙ্গে দূরত্ব যতো বাড়ে, ততো ঘন হয় ঘৃণা। এই সংসার, ছায়ার রাগ, অনুরাগ, আক্রমণে নির্বিকার থাকতে চায় কুণাল। পারে না। প্রতিহিংসায় জ্বলতে থাকে। ছায়াকে কঠিন শাস্তি দেবার মতলব ভাঁজে। তাকে মিথ্যেবাদী, কপট বানিয়েছে ছায়া। তার প্রেম, ভালাবাসা, আত্মা পর্যন্ত শুষে নিয়েছে। অন্ধকার রাস্তার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে। টেবিলের ওপর লাল পেন্সিলে দাগানো খবরের কাগজ। কুণাল জানে, কে কাকে আগে শাস্তি দেবে, এ নিয়ে তার সঙ্গে ছায়ার তীব্র প্রতিযোগিতা চলছে। গতকালের ঘটনা ভেবে শিউরে উঠলো সে। স্নান সেরে চটপট পাজামা, পাঞ্জাবি পরে বারান্দায় এসে কালও বসেছিল। সাজগোজ করতে ছায়া সময় নেয়। তা নিক। প্রতীক্ষা করছিল কুণাল। ভেতরের ঘর থেকে হঠাৎ ভেসে এলো ভারি কিছু পড়ার শব্দ। ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকলো কুণাল। ঘরের মেঝেতে পড়ে আছে একটা চেয়ার। চেয়ারের পাশে মেঝেতে আধশোয়া ছায়া। ফ্যানের রড্ থেকে ঝুলছে প্যাঁচানো শাড়ি। ফ্যানের তলায় একটা টেবিল। নিমেষে কুণাল বুঝলো, টেবিলের ওপর চেয়ার তুলে গলায় শাড়ির ফাঁস লাগাতে চেষ্টা করেছিল ছায়া। বেকায়দায় চেয়ার উল্টে পড়ে গেছে।

কুণালের চোখে চোখ পড়তে শুকনো হেসে ছায়া বলেছিল, মজা করছিলাম। ভয় পেলে?

কথা সরলো না কুণালের মুখে। কুণাল দেখলো, ছায়ার সখের ড্রেসিংটেবিল এলোমেলো, চিরুনি দু টুকরো, থেঁতলানো লিপস্টিক্, নখরঞ্জিনীর ভাঙা শিশি। রক্তের মতো গড়াচ্ছে নেল্‌পালিশ। চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল কুণাল। মেঝে থেকে উঠে ছায়া বলল, এখনই তৈরি হচ্ছি।

ঘরের দরজা খোলা রেখে পাঁচ মিনিটে তৈরি হয়েছিল সে। হোটেলে খাবার সময় দু'একটা মামুলি কথা চালাচালি করল তারা। রাতে বিছানায় শুয়ে সারা সন্ধ্যের চাপ, তাপ, ভয়াবহ জিঘাংসা কীভাবে উবে গেল কুণাল জানে না। সন্ধি হলো। সন্ধির শর্ত কেউ কাউকে আঘাত করবে না, খোঁটা দেবে না, অবিশ্বাস করবে না, আদর্শ দম্পতি হবে তারা। আবছা সবুজ আলোয় আড়াইজনের বিছানায় নামলো স্বর্গীয় রাত। বাকী আধজন নিশ্চয় এবার ভূমিষ্ঠ হবে।

ঘুমিয়ে পড়ার আগে তৃপ্ত, ক্লান্ত কুণালের মনে জমতে থাকলো বিষাদ, বিস্বাদ। সে জানতো চুক্তি মেনে চলা তাদের কারো সম্ভব নয়। কাল সকাল থেকেই শুরু হবে দু'জনের ঠান্ডা যুদ্ধ, গোপনে অস্ত্র শানানোর কাজ। তেতো হয়ে গিয়েছিল তার মন। কুকুর মনে হয়েছিল নিজেকে। শরীরের তাগাদায় কুকুর হয়ে গেছে সে। বোধ-হয় সব পুরুষের এই দশা। একজন নারীকে সারাদিনে খুব বেশী একঘণ্টা শোষণ করে একজন পুরুষ। নারী শোষণ করে চব্বিশ ঘণ্টা। এক ঘণ্টা দেহদানের দাম হিসেবে মেয়েরা শুষে নেয় পুরুষের স্বাধীনতা, বিবেক, জ্ঞান, অস্তিত্ব। ঘুনপোকার মতো খেয়ে ফোঁপরা করে দেয় পুরুষকে। শিশুসুলভ সরলতায় তারা একাজ করে। মেয়েরাও শিশু, শুধু শিশুর সারল্য তাদের নেই। নিষ্ঠুর, স্বার্থপর তারা।

তখনই কুণালের মনে পড়লো, অফিস থেকে ফেরার পথে কাল ছায়ার জন্যে একটা দামী সেণ্ট কিনেছিল। পারফিউমের শিশি আজও পড়ে আছে ব্রিফকেসে। কিন্তু এ মুহূর্তে দেবার ইচ্ছে হলো না তার।

মুখের সামনে পুরোনো ম্যাগাজিন খুলে ছায়া ভাবছে, পুরুষ জাতটাই ভণ্ড। টাকা আর গায়ের জোরে মেয়েদের দাবিয়ে রেখেছে। মেয়েদের ওরা ভাবে খেলার পুতুল। অন্ধকার বিছানায় একঘণ্টা খেলার জন্যে চাকর হয়ে যায়। হৃদয় নেই, ভালোবাসা নেই, আছে শুধু যৌনতা। চোখে জল এলো তার। রাতের সব প্রতিশ্রুতি দিনের আলোয় মিলিয়ে যাবে জেনেও বিছানায় বারবার বিগলিত হবার জন্যে অনুতাপ বোধ করল। তবে হ্যাঁ, রাতেই পুরুষদের ওপর প্রতিশোধ নেওয়া যায়।

দালানে একটানা টিকটক টিক টক দেওয়াল ঘড়ির শব্দ। বারান্দায় বেতের চেয়ারে কুণাল, পরিপাটি বিছানায় ছায়া একভাবে বসে থাকে। কলিংবেল্ বাজতে খাট থেকে নামলো ছায়া। শাড়ি গুছিয়ে, আয়নায় চকিতে মুখ দেখে ফ্ল্যাটের দরজা খুলছে সে। কুণাল দেখলো, কী দ্রুত শিশুর মতো সরল হয়ে গেল ছায়ার মুখ। ঘৃণা, প্রতি-হিংসার বদলে ঠোঁটে ভাসছে অনাবিল হাসি।

খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলো পরমেশ। মুখে হাসি থাকলেও ভেতরে ভেতরে বিরক্ত হয়েছে ছায়া। মাসির বাড়িতে আজ যাবার কথা ছিল তার। কুণাল

ফিরতে দেরী করলেও শেষ পর্যন্ত যাওয়া হবে, ভেবেছিল সে। ভরাডুবি হলো সব। বারান্দা থেকে দালানে এসেছে কুণাল। পরমেশ আসায় কুণাল খুশি। এই বিপজ্জনক নীরবতা থেকে কিছুক্ষণ রেহাই মিলবে। ছায়ার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে পরমেশ বলল, তোমার দেওর 'তবারিশ' মিলিন্দর সঙ্গে দেখা হলো রাস্তায়। ভূতের মতো দেখাচ্ছিল তাকে। চমকে উঠেছিলাম। সে গা ঢাকা দিয়ে আছে, তোমরা তো কেউ বলোনি।

একনাগাড়ে এখন কথা বলবে পরমেশ। কথার মধ্যে গুঁজে দেবে এক, দুটো রাশিয়ান শব্দ। অভিধান থেকে মুখস্থ করা বিশ, পঁচিশটা শব্দ তার পুঁজি। এখনই বলল তবারিশ। মানে কমরেড। ঠান্ডা চোখে কুণালকে একবার দেখলো ছায়া। চোখে চোখ পড়তে কুণাল বুঝলো, তার গোপন চিন্তাগুলো। ছায়া ধরে ফেলেছে। পরমেশকে নিয়ে বসার ঘরে ঢুকলো কুণাল। ছায়াও এলো। পরমেশকে প্রশ্ন করলো, চা, না কফি ?

কফি।

কফি বানাতে রান্নাঘরে গেল ছায়া। রাঁধুনি বাড়ি চলে গেছে। কাল সকালে আবার আসবে। ট্রেতে তিন কাপ কফি নিয়ে ছায়া ফিরলো। কথা বলছে পরমেশ, ছায়া। মাঝে মাঝে দু'একটা মন্তব্য জুড়ে দিচ্ছে কুণাল।

আপনার মা কেমন আছেন, বাড়িওলার সঙ্গে মামলার কী হলো, নতুন কী লিখলেন, ইত্যাদি কিছু বাঁধা প্রশ্নের পর ফুরিয়ে গেল ছায়ার কথা। অবশ্য এই গুটিকয় প্রশ্নই যথেষ্ট। প্রতি প্রশ্নের জবাবে কম করে আধঘণ্টা সময় নেবে পরমেশ। তিনটে প্রশ্ন মানে আপাতত দেড়ঘণ্টা শ্রোতাদের ছুটি। কেউ শুনছে, শুনছে না, খেয়াল করে না সে। পনেরো মিনিট তার কথা শোনার পর কুণালের হাই ওঠে, মনঃসংযোগ, আগ্রহ ফুরিয়ে যায়। পরমেশ এখন বলছে, শৈশবে তার লেখা এক উপন্যাসের কথা। পড়লে মনে হবে, তার উপন্যাসের হুবহু ফরাসি অনুবাদ সার্ত্রের এজ্ অব্ রিজ্ন্। পরমেশের দুর্ভাগ্য, তার উপন্যাসটাই সার্ত্রে আগে লিখে ফেলেছেন। উপন্যাসের জন্যে একজন প্রকাশক পায়নি সে। বাঙালী প্রকাশকরা সব ছাগল। প্রতি মুহূর্তে প্রসঙ্গ বদলাচ্ছে পরমেশ। কলের গানের ফাটা রেকর্ডের মতো বেজে চলেছে তার কণ্ঠস্বর। ছায়ার মুখে স্নিগ্ধ হাসি। অন্যমনস্ক কুণাল দেখছে পরমেশকে। চল্লিশের কাছাকাছি বয়স হলেও মনে হয়, সদ্য ত্রিশ। পরমেশের চেয়ে কুণাল চার, পাঁচ বছরের ছোট, বোঝা যায় না।

আগামী হপ্তায় দু'তিনটে পত্রিকায় পরমেশের কিছু দুঃসাহসী লেখা বেরোবে। নাম থাকবে না তার। পড়েই বোঝা যাবে, লেখক কে। কুণাল, ছায়া চুপচাপ শুনছে। লেখার বিষয়, কাগজের নাম জানতে চাইছে না কেউ। এ সব প্রশ্ন করলে বিরক্ত হয় পরমেশ। মুখে প্রশান্তি বাঁচিয়ে রাখলেও ছায়া রাগছে। তার মনে পড়লো মিলিন্দর মুখ। কুণালের নিজের কোনো ভাই-বোন নেই। অল্পবয়সে মা, বাবাকে হারিয়েছিল সে। তাকে মানুষ করেছে কাকা, মিলিন্দর বাবা। কাকার ছেলে মেয়েরা কুণালের আপন ভাই বোনের চেয়ে বেশি। বিশেষ করে মিলিন্দর জন্যে আছে তার বাড়তি

ভালোবাসা। মিলিন্দকে দেখলে নরম হয়ে যায় সে।

গাঁকগাঁক করে মাইক বাজছে খাল পাড়ে। খোল, করতাল সঙ্গতে মাইকে চলেছে হিন্দুস্থানীদের জগঝম্প গান। বাড়ি ফেরার পর থেকে কান ঝালাপালা। হপ্তায় তিন, চারদিন বসে এ আসর। কুণাল ভাবছিল, মিলিন্দর কথা। ছেলেবেলা থেকেই সে জেদী, একরোখা, অসাধারণ মেধাবী। বাইরে থেকে রুক্ষ মনে হলেও, আসলে সে অন্যরকম। কোমল, হৃদয়বান। হোস্টেলে থেকে লেখাপড়া করেছে কুণাল। গরমের ছুটি, পুজোর ছুটিতে কলকাতায় এসে কাকার বাড়িতে থাকতো কিছুদিন। দশ-বারো বছরের ছোট মিলিন্দই ছিল তার সঙ্গী। কুণালের ছুটির জন্যে হাঁ করে বসে থাকতো মিলিন্দ। কাকার পরিবারের সঙ্গে মাঝখানে দশ-বারো বছর কুণালের যোগাযোগ ছিল না। বোম্বে আই আই টি থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে সেখানেই পাঁচ-সাত বছর চাকরি করেছে সে। দু' চারদিনের জন্যে কখনও কলকাতায় এলে মিলিন্দর সঙ্গে চুটিয়ে আড্ডা দেবার সুযোগ পায়নি। তবু দু'একবার অল্পসময় কথা বলেই কুণাল বুঝতে পেরেছিল, মিলিন্দ অনেক বদলে গেছে। চেনা জীবন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে সে।

চার বছর আগে চাকরি নিয়ে কলকাতায় ফিরলো কুণাল। সঙ্গে ছায়া। ছায়া তখনও নববধূ। বিস্বাদ হয়নি জীবন। মিলিন্দর সঙ্গে কুণালের আবার যোগাযোগ হলো। বেশিরভাগ পুরোনো আত্মীয়-বন্ধুদের ফিরে পেল সে। তাকে সবচেয়ে অভিভূত করলো মিলিন্দ। বয়সে অনেক ছোট হয়েও মিলিন্দ ঢুকে গেল তার চেতনায়। আজ বিকেলে একশো টাকা মিলিন্দকে দিয়ে কুণাল প্রশ্ন করেছিল, পার্টি ফান্ড ?

নাহ্।

মিলিন্দর উত্তরে অবাক হয়েছিল কুণাল। নিজের দরকারে তার কাছ থেকে কখনও টাকা চায়নি মিলিন্দ। মিলিন্দ বলেছিল, আমার ধারণা, অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে এধা। তাড়াতাড়ি রেজিস্ট্রি করতে হবে।

জবাব শুনে হতবাক কুণাল প্রশ্ন করেছিল, জানলি কী করে ?

মনে হচ্ছে।

একমুহূর্ত থেমে মিলিন্দ আবার বলল, সেরকম না হলে টাকাটা ফেরত দিয়ে যাবো।

টাকা ফেরতের কথা বলছি না।

জানি।

এক মুহূর্ত গুম হয়ে থেকে কুণাল প্রশ্ন করেছিল, রেজিস্ট্রির পর ?

জানি না।

বাড়িতে বলেছিস ?

বলবো। না বললেই বা কী আসে যায় ?

এক সেকেন্ড চিন্তা করে মিলিন্দ বলেছিল, এধার নিরাপত্তার জন্যেই রেজিষ্ট্রি করছি।

শুধু নিরাপত্তা, ভালোবাসা নেই ?

প্রশ্ন করে কুণাল তাকিয়েছিল মিলিন্দর দিকে।

পাল্টা প্রশ্ন করেছিল মিলিন্দ, ভালোবাসা কী ? দাদা, ভালোবাসার ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে দেবে আমাকে।

মিলিন্দর অনুরোধে ঘাবড়ে গিয়েছিল কুণাল। তার ফ্যাকাসে মুখের দিকে তাকিয়ে মিলিন্দ আবার প্রশ্ন করেছিল, ভালোবাসা বলে কিছু আছে ? বিশ্বাস করো তুমি ?

আছে।

কুণালের জবাবে ম্লান হেসেছিল মিলিন্দ। সে হাসি দেখে কুণালের প্রশ্ন জেগেছিল, সে কি মিলিন্দকেও মিথ্যে বলছে, প্রতারণা করছে ? বোধহয় তাই। দুপুরে অফিসে বসেই সে খেয়াল করেছিল, জরুরি একটা ফাইল তাড়াহুড়োয় আনা হয়নি। বাড়িতে পড়ে আছে। ফাইলের ভেতরে আছে চেক্‌বই। আজই একটা চেক্ কেটেছে সে।

পরমেশ বলে চলেছে, বেশি নয়, আমার তিন, চারটে বই বাজারে বেরোলে ছাগলের দল পালাতে পথ পাবে না। তার আগে বাড়িওলার সঙ্গে মামলাটার ফয়সালা হওয়া দরকার। যে পরিবেশে আছি, কোনো কাজ করা যায় না।

কুণাল ছায়ার মুখ দেখে এতোক্ষণে পরমেশ বুঝলো, কেউ শুনছে না তার কথা। অপমান, গ্লানিতে ভরে গেল তার বুক। সে জানে এখন কারো কথা কেউ শোনে না। শোনার ভান করে অন্য কথা ভাবে। নিজের চিন্তায় ডুবে থাকে। তবু মানুষ কথা বলে, শোনাতে চায় নিজের কথা। কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ বসে শুকনো হেসে পরমেশ বলল, উঠি।

কুণাল, ছায়া কিছু বলার আগেই ফ্ল্যাটের দরজা খুলে বেরিয়ে গেল সে। পরমেশ চলে যেতে আবার একা হয়ে গেল দু'জন। নিস্তব্ধ ফ্ল্যাট্। এ নিস্তব্ধতায় ধাক্কা খেয়ে ফিরে যাচ্ছে খালপারের জগঝম্প। বসার ঘর যুদ্ধক্ষেত্র।

ভাবলেশহীন চোখে ছায়া দেখলো কুণালকে। তুমি কিছুতেই শান্তি দেবে না আমাকে, আমি জানি।

বরফের মত ঠান্ডা গলায় বললো ছায়া। স্নিগ্ধতা মুছে আবার নির্মম হয়েছে তার মুখের চেহারা। কুণাল জানে নীরবতাই এখন প্রতিরোধ। তার নীরবতায় আরও চটে যাবে ছায়া। কিন্তু কথা বলার ইচ্ছে কুণালের নেই।

নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়ে ছায়া। সরকারি চাকরি করতো তার বাবা সদানন্দ ঘোষ। বদলির চাকরি। সদানন্দের পরিবারের সঙ্গে বোম্বেতে যোগাযোগ হয়েছিল কুণালের। রীতিমতো রূপসী ছিল ছায়া। লেখাপড়াতেও ভালো করতো। পাঁচ মেয়ে, এক ছেলে নিয়ে সারা দেশ চাকরির সুবাদে ভেসে বেড়ানোর জন্যই একটু ছন্নছাড়া ছিল সদানন্দের সংসার। সে কারণেই হয়তো সুস্থির, সচ্ছল এক সংসারের স্বপ্ন দেখতো ছায়া। বাড়ি, গাড়ি, ফ্রিজ, টিভি, ভিসিআর, এবং বিলাসী জীবনে যা যা দরকার, সবকিছুর অদম্য তৃষ্ণা ছিল তার। বোম্বে ছেড়ে কলকাতায় আসতে রাজি

ছিল না সে। কুণালের চাপেই এসেছিল। তখন নতুন বিয়ে, দু'জনের সম্ভাবও ছিল। প্রত্যাশা মরে যায়নি ছায়ার। কলকাতায় এসে আত্মীয়, পুরোনো বন্ধুদের নিয়ে কুণাল যেভাবে মশগুল হলো, ছায়া পারলো না। তার আত্মীয়-বন্ধু কলকাতায় বিশেষ ছিল না। কুণালের বন্ধুদের সঙ্গেও মিশতে পারলো না সে। ফলে সংসার, ফ্ল্যাট, গাড়ি, ভোগের নানা উপকরণে আরও বেশি জড়িয়ে পড়লো। সবচেয়ে বেশি চাপ দিল কুণালকে। তার আত্মীয়-বন্ধুদের বিরুদ্ধে ছায়ার মনে তৈরি হলো রাগ, ঘৃণা। মিলিন্দকে পছন্দ হলেও তার সঙ্গে ছেলেমানুষের মতো কুণালের মাখামাখি ছায়ার অসহ্য লাগলো। তার মনে হলো, দশ-বারো বছরের বড়ো কুণালকে বশ করেছে মিলিন্দ। মিলিন্দর সঙ্গে বেশি মেলামেশার জন্যেই ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে কুণালের উচ্চাশা। মিলিন্দর প্রভাবে কুণালের এই বালকোচিত পরিবর্তন দেখে তার ওপর ছায়ার ঘৃণা জন্মেছে। মনে হয়েছে, কুণাল ব্যক্তিত্বহীন, ক্লীব। মুখে একথা ছায়া বলেছে কুণালকে। শুনেও কুণাল উদাসীন। সে ভেবেছে, ছায়া ভোগসুখের কাঙাল। ঐশ্বর্য ছাড়া কিছু চেনে না সে। এ সব মুহূর্তে ছেলেবেলা, ছাত্রজীবনের অসংখ্য স্মৃতি, ট্রেনে চেপে সাঁওতাল পরগনায় বেড়াতে যাবার রঙীন ছবি কুণালের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। স্বেচ্ছায় ভাসিয়ে তোলে সে। সুখের মুহূর্তগুলো ভেবে বাস্তব জীবনের রূঢ়তা ফিকে করতে চায়। ছায়ার কাছে তার আর কোনো প্রত্যাশা নেই। জীবনের কাছে? বোধহয় নেই। সুন্দর, অসুন্দর, সুখ, শোক, এমনকি নারীদেহ পর্যন্ত চেটেপুটে ভোগ করেছে সে। তাহলে? কুণালের মনে হয়, ক্লান্তিকর, একঘেয়ে এই বাঁচার কোনো মানে নেই। চেবানো জিনিস কতোবার চিবোতে পারে একজন মানুষ! প্রতিদিন, ঘণ্টা, মুহূর্ত, ঘটনা একরকম, বৈচিত্র্যহীন। নতুন কিছু ভোগ দখলের সুযোগ নেই। সামর্থও নেই।

এ সব চিন্তা আগেও করেছে কুণাল। কিন্তু গতকাল ছায়ার কাণ্ড দেখে নতুন করে ভাবছে সে। কুটিল ভাবনা প্ররোচনা দিচ্ছে তাকে।

বসার ঘর ছেড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো কুণাল। শীত তাড়াতে খালপাড়ে আগুন জ্বেলেছে কিছু মানুষ। আগুন ঘিরে বসে আছে তারা। কুণালের মনে হলো, তারও আগুন চাই। কোথায় আগুন? এ জীবনে আগুন বোধহয় তার জুটবে না। খরখরে মুখে হাত বোলালো কুণাল। ব্যস্ততায় সকালে দাড়ি কামানো হয়নি। দাড়ি না কামিয়ে অফিসে যাবার কথা আগে ভাবতে পারতো না সে। এখন পারে। দাড়ি না কামিয়েই অফিসে যায় দু'একদিন। মিলিন্দর প্রশ্নটা আবার মনে পড়লো, দাদা, ভালোবাসা কী?

প্রায় বাড়ির সামনে রাস্তার ওপর মিলিন্দকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়েছিল কুণাল। সারা দুপুর, বিকেল একসঙ্গে ছিল দু'জন। দুপুর পৌনে একটায় অফিস থেকে ব্যাঙ্কে গিয়ে টাকা তুলেছিল কুণাল। আর অফিসে ফেরেনি। তার জন্যে লাইট্-হাউসের সামনে বই-এর দোকানে অপেক্ষা করছিল মিলিন্দ। তাকে গাড়িতে তুলে পার্ক স্ট্রীটে পৌঁছেছিল কুণাল। একটা রেস্টুরেন্টে খেয়েছিল দু'জনে। তারপর গঙ্গার ধারে বসে আড্ডা মেরেছিল। মিলিন্দর সঙ্গে কথা বলে আরাম পায় কুণাল।

মনে হয়, আগুনের খোঁজ পাওয়া অসম্ভব নয়। গঙ্গার ধারে বসেই একশো টাকা মিলিন্দকে দিয়েছিল সে। কীভাবে বিকেল শেষ হলো, টের পায়নি। কিন্তু গাড়িতে মিলিন্দকে নিয়ে বাড়ি পর্যন্ত আসা অনুচিত হয়েছে। রাস্তায় কোথাও নামিয়ে দিলে মিলিন্দকে দেখতে পেত না পরমেশ। ছায়ার সামনে এভাবে প্যাঁচে পড়তে হতো না তাকে। মিলিন্দকে সে টাকা দিয়েছে, চেক্ বই দেখে মালুম করেছে ছায়া। প্রখর বিষয়বুদ্ধি তার। হাড় কাঁপানো শীতে অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আপন মনে কুণাল বললো, প্রেম, ভালোবাসা আছে কিনা জানি না, তবু প্রেমে আমরা বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করাটা সংস্কার। বেঁচে থাকার মতোই সংস্কার।

রুগ্ন, জীর্ণ, পাকাচুল এক বুড়ো বেতাল পায়ে রাস্তায় হেঁটে চলেছে। হাঁটার ভঙ্গিতে মনে হচ্ছে, যে কোনো মুহূর্তে লোকটা মুখ থুবড়ে পড়বে। রক্তবমি করবে। মরবে। লোকটার মুখ দেখে ডুকরে কেঁদে উঠলো চন্দন। এ যে তারই মুখ।

ধাক্কা মেরে চন্দনের ঘুম ভাঙিয়ে ছোট ভাই সবিত বলল, কী হলো, চেঁচাচ্ছো কেন?

সবিতের ঘুম-জড়ানো মুখ, চোখে ক্ষোভ, বিরক্তি। চোখ মেলে চন্দন তাকাতে নিজের বিছানায় ফিরে আবার ঘুমিয়ে পড়লো সবিত। স্বপ্নের জের তখনও চন্দনের কাটেনি। কষ্ট হচ্ছে তার। গত রাতের ঘটনায় সত্যি বুড়ো হয়ে গেছে সে। কাল রাত এগারোটায় ছিল পার্টি মিটিং। পার্টির সর্বোচ্চ নেতা এসেছিল সেখানে। হাজির ছিল মিলিন্দ, সবিত এবং ইউনিটের আরও তিনজন। সে সভায় পার্টির কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে চন্দন বলেছিল, গণসংগঠন, গণ-আন্দোলনে না থাকলে সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবো আমরা। ইতিমধ্যেই কিছুটা কোণঠাসা অবস্থা আমাদের। অকারণ সংঘর্ষ যতোটা সম্ভব এড়িয়ে যেতে হবে আমাদের। এসব পছন্দ করছে না সাধারণ মানুষ।

কথা শেষ হবার আগেই হৈচৈ করে থামিয়ে দেওয়া হলো তাকে। জ্বালাময়ী ভাষণে তার বক্তব্য তছনছ করে দিল নেতা। সকলের সামনে প্রমাণ করা হলো চন্দন ভীরু, কাপুরুষ, মধ্যপন্থী। সিদ্ধান্ত হলো, চন্দনের সঙ্গে আর যোগাযোগ রাখবে না পার্টি। মিলিন্দ, সবিতও সায় দিল সিদ্ধান্তে। দেড়, দুঘণ্টার সেই সভা বুড়ো করে দিয়েছে চন্দনকে। নেতার ভাষণ শুনে সব চেয়ে বেশি আশ্চর্য হয়েছে সে। তার মনে হচ্ছিল, মিলিন্দর লেখা দলিল পড়ছে নেতা। ভারতীয় বিপ্লবের প্রশ্নে গত ছ'মাস যে কথাগুলো মিলিন্দ বলছিল, সেগুলো হুবহু উগরে দিল নেতা। মিলিন্দ কীভাবে নেতাকে বশ করল, বুঝতে না পারলেও আতঙ্কে কাঁপছিল চন্দন। পনেরো বছর আগের বাতিল রাজনীতি আবার ফিরিয়ে আনা হচ্ছে, টের পেয়েছিল। দল, নেতা, রাজনীতিও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে মিলিন্দ যে কব্জা করে ফেলেছে, বুঝতে

চন্দনের অসুবিধে হয়নি। এ ঘটনা ঘটতে চলেছে, বছর খানেক আগে চন্দনকে আভাস দিয়েছিল মিলিন্দ। তার কথাকে সেদিন কল্পনাবিলাস ভেবে চন্দন হেসেছিল। তার হাসি দেখে মিলিন্দও মুচকি হেসেছিল। বিজয়ীর হাসি, শেষ হাসিটাও হাসলো সে। মিলিন্দ তার বিধ্বংসী, আক্রমণাত্মক রাজনৈতিক লাইন গিলিয়ে দিয়েছে পার্টিকে। এ লাইন যে মিলিন্দ খুব গভীরভাবে বিশ্বাস করে, তা নয়। তবু ষাট, সত্তর দশকের বাতিল রাজনীতি আশির দশক মেনে নেয় কিনা, দেখতে চায় সে। এ তার বৈজ্ঞানিক কৌতূহল। তার ধারণা, প্রতিটি পরবর্তী প্রজন্ম, আগের প্রজন্মের অতি-বাম রাজনীতি, বিশুদ্ধ বাম রাজনীতিতে রূপান্তরিত করে। তাই ষাট, সত্তরের রাজনীতির উগ্র গন্ধ আজ নেই। ঝাঁঝ মরে মৃদু, মোলায়েম হয়েছে।

মিলিন্দর মতামত, ধারণা অনেকবার হেসে উড়িয়ে দিয়েছে চন্দন। মিলিন্দও মেনে নিয়ে বলেছে, এ রকম ভাবনায় একটা মজা আছে। মজা পাই আমি।

মজা করার জন্যে কি পার্টির ঘাড়ে এমন এক বিপজ্জনক রাজনীতি চাপিয়ে দিল মিলিন্দ? পার্টির প্রবীণ অভিজ্ঞ, পোড় খাওয়া নেতৃত্ব কীভাবে মেনে নিল মিলিন্দর রাজনীতি?

ঘুমন্ত সবিতের দিকে তাকালো চন্দন। পার্টির বিশ্বস্ত, জঙ্গী কর্মী সবিত। রাজনীতিতে তার হাতেখড়ি দিয়েছিল চন্দন। সবিত এখন মিলিন্দর অন্ধ অনুগামী। বাড়িতে দাদার সঙ্গেও হয়তো আজ থেকে কথা বলবে না সবিত। খাতায় কলমে না হলেও বলা যায়, কাল রাতে দল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে চন্দনকে। সিদ্ধান্ত হয়েছে, সম্পর্ক রাখা হবে না। সম্পর্ক ছিন্ন করা মানে তাড়ানো। কিছু-দিন পরে পার্টি হয়তো শত্রু চিহ্নিত করবে তাকে। তারপর? চন্দন টের পেল বুকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে শব্দহীন হাহাকার। কিছু না করতে পারার হতাশায় কুঁকড়ে যাচ্ছে মন। এই নির্বাসন, একাকীত্ব সে চায়নি। সমাজ রূপান্তরের কাজে লাগতে চেয়েছিল। মনে আরও এক গোপন প্রত্যাশা ছিল। একটি মেয়ের প্রেম, ভালোবাসা চেয়েছিল। এমন অপদার্থ সে, যে, একটা প্রেম পর্যন্ত করতে পারলো না। প্রেম, নারী ইত্যাদি শব্দের সঙ্গে মাথায় জেগে উঠলো এধার মুখ। ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করে সবিত কিছু বলল। রাতে বাড়িতে থাকা উচিত নয় জেনেও মাঝে মাঝে থাকছে সবিত। বারণ করেনি চন্দন। সে বাড়িতে থাকলে সবিত কেন থাকবে না? গণতান্ত্রিক আন্দোলনে চন্দন এখনও কাজ করায় পুলিশের চোখে তার গুরুত্ব কম। বেআইনী হিংসাত্মক কাজকর্মের সঙ্গে পুলিশের সন্দেহ, সবিতের যোগাযোগ আছে। তাই হুলিয়া বেরিয়েছে তার নামে।

প্রলম্বিত শীতের সকাল। আলো, অন্ধকারে ঘরের ভেতরটা আবছা। নিদ্রিত সবিতের দিকে তাকিয়ে আছে চন্দন। সবিত হঠাৎ চোখ খুলতে আটকে গেল দুজনের দৃষ্টি। ধড়ফড় করে বিছানায় উঠে বসলো সবিত। ছিটকে পড়লো গায়ের কম্বল। তার মুখে, চোখে ভয়, সন্দেহ। সবিতের প্রতিক্রিয়ায় অবাক হলো চন্দন।

কী দেখছো?

হিসহিস গলায় সবিত প্রশ্ন করতে চন্দন বলল, ভাবছিলাম, রাতে তোর বাড়িতে

না থাকাই ভালো।

বটেই তো, সবিত বলল, তোমার মতো দাদা যে বাড়িতে আছে।

ভাই-এর কথায় পাথর হয়ে গেল চন্দন। কথা বলতে ভুলে গেছে সে। ধারালো গলায় সবিত বলছে, শত্রুরা কিছু কাপুরুষ ঢুকিয়ে দিয়েছে পার্টিতে। ভয় ছড়াচ্ছে তারা। আমরা গুঁড়িয়ে দেব তাদের। শয়তানও ঠেকাতে পারবে না।

সবিতের কথার মধ্যে দু'কাপ চা হাতে ঘরে ঢুকলো প্রভাবতী। দু' ছেলের কিছু কথা প্রভাবতীর কানে গেছে। শান্ত গলায় প্রভাবতী প্রশ্ন করল, রাত না কাটতে শুরু হয়ে গেল ঝগড়া?

ফিকে আলোয় দু'ছেলের মুখ দেখে আশঙ্কায় কেঁপে উঠলো প্রভাবতীর বুক। চন্দনের মুখ ফ্যাকাশে। উত্তেজনায় দপদপ করছে সবিতের দু'চোখ। দু'ছেলে যেন দুটো আলাদা দ্বীপ। এক রাতের ঝড়ে ভেঙে পড়েছে তাদের সংযোগের সেতু। কী এমন হলো? জবাব না জেনেও প্রভাবতীর মনে হলো, তার মাতৃত্বের ভিত কাঁপছে। যে কোন সময়ে দু'টুকরো হয়ে যাবে ভিত। মায়ের হাত থেকে কাপ নিয়ে প্রায় এক চুমুকে চা শেষ করলো সবিত। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বিছানায় চা রেখে চুপচাপ বসে আছে চন্দন। রান্নাঘরে ঢুকলো প্রভাবতী।

বড়ো ছেলের বিরুদ্ধে অভিমান আছে প্রভাবতীর মনে। ছেলেবেলা থেকে সবিত ছিল দাদার ভক্ত। সব সময়ে অনুকরণ করতো দাদাকে চন্দনকে দেখেই রাজনীতিতে ঢুকেছে সবিত। লেখাপড়া ছেড়ে বাউন্ডুলের মতো ঘুরছে। পুলিশ লাগলো সবিতের পেছনে। কোন্নগরে বোনের বাড়িতে দু'মাস আগে সবিতকে রেখে এসেছিল প্রভাবতী। তিন, চার দিনের বেশী সেখানে থাকেনি সবিত। ফিরে এসেছে কলকাতায়। প্রভাবতীর আশা ছিল ছোট ভাইকে চন্দন সামলাবে। পাঠিয়ে দেবে মাসির বাড়ি। দায়িত্ব পালন করেনি চন্দন। দু' ছেলেকে ঘিরে প্রভাবতীর নানা স্বপ্ন ভেঙে পড়ছে। সব কিছুর জন্যে চন্দনকে নিঃশব্দে দায়ী করছে প্রভাবতী।

চায়ের কাপ নিতে এসে প্রভাবতী দেখলো, চা জুড়িয়ে জল। এক চুমুকও খায়নি চন্দন। বালিশ কোলে পুতুলের মতো বসে আছে। লম্বাটে দেখাচ্ছে তার চিবুক। এ মুহূর্তে চন্দনের জন্যে কষ্ট জাগলো প্রভাবতীর মনে।

বাড়িতে বসে সকালটা কাটিয়ে দিল চন্দন। শীতের ঘন নীল আকাশে ছড়িয়ে আছে ঝকঝকে রোদ। যন্ত্রের মতো স্নান সেরে ভাত খেল চন্দন। সকালে সেই যে সবিত বেরিয়ে গেছে, এখনও ফেরেনি। প্রায়ই এরকম করে সে। চন্দনের অসাড় মাথা কাজ করছে না। খোলা জানলার বাইরে নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ তার মনে হলো, মিলিন্দ সর্বনাশ করেছে সবিতের। এধার শরীরেও আগুন ধরিয়ে দিয়েছে মিলিন্দ। মানুষ, সমাজ, রাজনীতি নিয়ে নিষ্ঠুর গবেষণা চালাচ্ছে সে। ঘরে, বাইরে কোণঠাসা চন্দনের প্রতিক্রিয়া দেখার পাগলামি পেয়ে বসেছে মিলিন্দকে। কিন্তু মিলিন্দর কোনো ক্ষতি করেনি সে। সেরকম কিছু চিন্তা করতে পারে না। রুদ্ধ আক্রোশে দু'হাতে মুখ ঢাকলো চন্দন।

তখনই তার মনে পড়লো, আজ বেলা তিনটেতে ডাক্তারের কাছে এধাকে নিয়ে

যেতে হবে। ডাক্তারের সঙ্গে সেরকমই কথা আছে। অবশ্য গতকাল মিলিন্দ, এধা কী ঠিক করেছে, চন্দন জানে না। রাতের সভায় তাকে কিছু বলে নি লিলিন্দ। বাচ্চাটা রাখার সিদ্ধান্ত দু'জনে নিয়ে থাকলে এখনই ডাক্তার দেখাবার দরকার নেই। থিয়েটার রোডের পূর্বদিকের এক পার্কে এধার সঙ্গে তিনটের সময় দেখা হলে জানা যাবে সব। এধার মুখটা ভেবে খুশিতে ভরে গেল চন্দনের মন। এধার লম্বা, মাজা শরীর, স্নিগ্ধ হাসি, সাবলীল কথা, যাবতীয় সূক্ষ্মতা, চুম্বকের মতো চন্দনকে টেনে রাখে। পোষাক বদলে রাস্তায় এসে দাঁড়ালো চন্দন। বাসস্টপে দাঁড়িয়ে হঠাৎ মনে প্রশ্ন জাগলো, মিলিন্দর বিরুদ্ধে তার রাগের কারণ এধা, না রাজনীতি? প্রশ্নটা উঠতে হকচকিয়ে গেল সে। সবিতকে বিগড়ে দেবার অভিযোগের কারণও কি তাই? এধা অলভ্য হবার জন্যেই কি মিলিন্দকে দুষছে সে? কথাটা ভেবে গ্লানি বোধ করল চন্দন। পরমুহূর্তে মনে হলো, নাহ্, তা কেন?

নির্জন পার্কে গুটিকয় মানুষ ঘাসে বসে রোদ পোহাচ্ছে। বেশিরভাগ মহিলা, সঙ্গে একটা, দুটো শিশু। রঙীন বেলুন হাতে বাচ্চাদের লোভাতুর করছে এক বেলুনওলা। বেলুনে হাওয়া ভরে সুতো বেঁধে উড়িয়ে দিচ্ছে সে। লাল, নীল, সবুজ, হলুদ উড়ন্ত বেলুনগুলো ড্যাবড্যাব করে বাচ্চারা দেখছে। কিনছেও দু'একজন। শ্লথ পায়ে এগিয়ে আসছে এধা। গুনে গুনে মেপে পা ফেলছে। এধার হাঁটার ধরণ অস্বাভাবিক ঠেকলো চন্দনের। পার্কের নির্জনতম কোনে একটা বেঞ্চে সে বসেছে। তাকে দেখেছে এধা। সে কাছাকাছি আসতে বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো চন্দন। দূরত্ব রেখে বেঞ্চের ধার ঘেঁসে বসলো এধা। তার এই গাছাড়া, ঠাণ্ডা ভঙ্গি আগে দেখেনি চন্দন। তাকে স্থির চোখে দেখছে এধা। মিলিন্দর সঙ্গে কাল কী কথা হলো শোনার জন্যে চন্দন উৎকর্ণ। এধা প্রশ্ন করল, আমাকে বিয়ে করতে রাজি আছো?

চমকে উঠলো চন্দন। বোবার মতো তাকে চেয়ে থাকতে দেখে তীক্ষ্ণ গলায় এধা প্রশ্ন করল, জবাব দিচ্ছো না কেন?

চন্দনের মনে হলো এধা অন্তর্যামী। তার মনের অন্ধকারে লুকোনো ইচ্ছেটাকে দেখে ফেলেছে এধা। চোখ তুলে তাকাতে ভরসা পাচ্ছে না সে। তার চোখের মণিতেও হয়তো আঁকা আছে পাপের অভিলাষ। দুজনের মাঝে ঘন নিস্তব্ধতা। অল্পদূরে বাচ্চাদের মায়েরা খোসগল্প জুড়েছে। বেলুন হাতে ছুটোছুটি করছে দুটো বাচ্চা। রাস্তায় ভেসে যাচ্ছে যানবাহন, মানুষ। চন্দনের মনে প্রশ্ন জাগলো, এধার দায়িত্ব নিতে মিলিন্দ কি রাজি হয়নি? বিশ্বাসঘাতকতা করল মিলিন্দ? এ কি সম্ভব?

তখনই চন্দন দেখলো এধার দু'চোখ, চোখের জল, লালচে মণিতে আগুন। আহত বাঘিনীর মতো তাকে দেখছে এধা। ভয় পেল চন্দন।

কী হলো তোমার?

চন্দনের প্রশ্নে ঘৃণায় মুচড়ে গেল এধার ঠোঁট। কপালে ফুটলো গভীর রেখা।

বেইমান, ট্রেচারাস্।

শব্দ দুটো উচ্চারণ করে ভস্মলোচনার মতো তাকিয়ে আছে এধা।

কী বলছো তুমি?

চন্দন ডুকরে উঠতে ভাঙা গলায় এধা বলল, তুমি ভেবেছো, মিলিন্দকে পুলিশে ধরিয়ে দিয়ে দখল করবে আমাকে ? তা হবে না। মিলিন্দর নখের যোগ্য নও তুমি। তুমি ষড়যন্ত্রকারী, বিশ্বাসঘাতক। আমার সঙ্গে শোবার সাধ কখনও মিটবে না তোমার।

ষড়যন্ত্রকারী, বিশ্বাসঘাতক, শোবার সাধ, প্রতিটা শব্দ সিসের গুলির মতো ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে চন্দনের হৃৎপিন্ড।

এধা এ শব্দগুলো বলতে পারে, বিশ্বাস হচ্ছে না তার। কাজ করছে না তার বোধ, বুদ্ধি। ঘৃণা, প্রতিহিংসায় ফোঁসফোঁস করে শ্বাস ফেলছে এধা। তার নিঃশ্বাসে মদের গন্ধ পেল চন্দন। বেঞ্চ ছেড়ে উঠে হাঁটতে শুরু করেছে এধা। দ্রুত হাঁটছে। তার শাড়ি, লম্বা বিনুনি, হাতের বটুয়া ক্রমশ আবছা হচ্ছে। চন্দনের মনে হলো শক্ত পাথরের ওপর ভিজে ন্যাতার মতো কেউ আছড়াচ্ছে তাকে। টুকরো টুকরো হচ্ছে তার শরীর! গলা দিয়ে শব্দ বেরোচ্ছে না।

শীতের খাটো বিকেল ফুরিয়ে আসছে। মাঠের কোণে কেণে জমছে ধোঁয়াটে কুয়াশা। রোদবিলাসীরা চলে যেতে নির্জন হয়েছে পার্ক। হঠাৎ তার শরীরে শীতের কাঁপুনি জাগলো। বেঞ্চে বসে ঠকঠক করে কাঁপছে সে। মিলিন্দ ধরা পড়েছে। কবে, কখন, কোথায় তাকে ধরলো পুলিশ ? মিলিন্দর অ্যারেস্টের জন্যে তাকে দায়ী করেছে পার্টি। নিশ্চয় করেছে। তার বিরুদ্ধে শুরু হয়ে গেছে প্রচার। অথচ এইমাত্র এধার মুখে খবরটা শুনলো সে। মিলিন্দও কি তাই বলেছে ? নাহ, হতে পারে না। তাকে কখনও দায়ী করবে না মিলিন্দ। এধার এখন কী হবে ? এ দুঃসময়ে কে দেখবে তাকে ? এধার নিষ্ঠুরতা, অপবাদ, অপমান ভুলে তার জন্যে অনুকম্পায় ভরে গেল চন্দনের মন। মিথ্যে প্রচারে বেচারী দিশেহারা হয়ে গেছে। এধার কোনো দোষ নেই। সে চাইলে এখনও তার পাশে গিয়ে দাঁড়াবে চন্দন।

ধীরে ধীরে শান্ত হলো তার মন। অপমানের জ্বালা কমে এলো। বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে মুহূর্তের জন্যে এক চক্কর ঘুরে গেল মাথা। ক্লান্ত লাগছে। শরীরের গাঁটে গাঁটে ব্যথার ভাব। গরম নিঃশ্বাস পড়ছে। চন্দনের মনে হলো, জ্বর আসছে। রাস্তার একটা দোকান থেকে দুটো অ্যাসপিরিন কিনে বাসে উঠলো। বাড়ি ফিরে দুধ খেয়ে মাথা পর্যন্ত লেপ মুড়ি দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো। আবছা ঘুম, তন্দ্রার মধ্যে মনে হলো দলছাড়া পাখির মতো মরুভূমির আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে সে। বসার জায়গা পাচ্ছে না।

ঘরের আলো জ্বলতে আচ্ছন্নতা কাটলো তার। মাথা থেকে লেপ সরিয়ে সে দেখলো, সামনে দাঁড়িয়ে সবিত। চন্দনের মতোই তার ছুঁচোলো চিবুক। ঘন দাড়িতে তা চিবুক দেখা যায় না। লম্বা, পেটানো স্বাস্থ্য। মাথায় রুক্ষ, এলোমেলো চুল। প্যান্টের পকেটে ডান হাত পুরে উদ্ধত বেতের মতো দাঁড়িয়ে আছে সবিত। মারমুখী ভাব। তার দুচোখের তারায় নাচছে আগুন।

বিশ্বাসঘাতক!

সবিতের চাপা গলা শুনে তার মুখের দিকে তাকালো চন্দন।

পুলিশের খাতায় নাম লিখিয়ে প্রতিশোধ মেটাচ্ছো? উচিত শাস্তি পাবে তুমি।

সবিতের কথাগুলো পরিষ্কার না বুঝলেও পকেটে রাখা রিভলভরটা যে সে মুঠোয় ধরে আছে, বুঝতে চন্দনের অসুবিধে হলো না। জ্বরের তাপে ছিঁড়ে যাচ্ছে তার মাথা। তবু শান্ত, স্থিতধী থাকার চেষ্টা করছে সে। সবিতের আক্রমনাত্মক ভঙ্গির জন্যেই বোধহয় চন্দনের মনে গড়ে উঠলো সংযত, প্রবল প্রতিরোধ। ধীর গলায় সে বলল, আমারও তো কিছু বলার থাকতে পারে। ফাঁসির আসামীও আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পায়। সে সুযোগ আমি কি পাবো না?

নিশ্চুপ সবিত তাকিয়ে আছে। চন্দন বললো, আজ তিনটের সময় এধার মুখে প্রথম শুনলাম মিলিন্দর অ্যারেস্টের খবর।

পকেটের যন্ত্রটা ধরে ছটফট করছে সবিত। চন্দন বলল, আমি যদি বলি, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা মেটাতে আমার বিরুদ্ধে কুৎসা রটানো হচ্ছে, কী জবাব দিবি? আমি যদি বলি, তদন্ত না করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার কারও নেই, কী জবাব দিবি?

জ্বরে লাল চন্দনের দু'চোখ। শরীরের অসুস্থতায় তার গলার স্বর হয়ে উঠেছে তীব্র, জীবন্ত। তার চোখের দিকে তাকিয়ে আলগা হয়ে গেছে পকেটে রাখা সবিতের মুঠো। তবু সে বলল, মিলিন্দদার ঠিকানা তুমি ছাড়া আর কেউ জানতো না।

ভুল। অনেকেই জানতো।

দম নিয়ে চন্দন আবার বলল, তাছাড়া কোথা থেকে সে ধরা পড়লো, সে খবর কি জানা গেছে? তদন্ত হয়েছে? কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সত্য কি জানা যায়? আসলে মিলিন্দ ধরা পড়ার আগেই আমার বিরুদ্ধে দন্ডাদেশ জারী হয়ে গেছে। মিলিন্দ ধরা না পড়লেও এ দন্ড ভোগ করতে হতো আমাকে। মিলিন্দ অ্যারেস্ট হতে মজবুত হয়েছে আদেশ।

চন্দনের কথায় থিতিয়ে গেলেও প্যান্টের পকেটে হাত পুরে রেখেছে সবিত। জ্বরে প্রলাপ বকার মতো চন্দন বলে চলেছে, তবু বিপ্লবের স্বার্থে, দলের স্বার্থে যদি দরকার হয়, মরতে রাজি আছি আমি। তবে এখানে নয়। এ বাড়িতে মা আছে, তোকেও থাকতে হবে। এখানে কিছু ঘটলে পুলিশ অতিষ্ঠ করে তুলবে তোর আর মায়ের জীবন। কোনো নির্জন জায়গায়, খিদিরপুরের বিচালিঘাটের কাছাকাছি কোথাও, আজ রাতে তোর সঙ্গে আমি যাবো। মানুষজন সেখানে বিশেষ থাকে না। আমাকে মারার খবর জানবে না কেউ। অজ্ঞাত-পরিচয় লাশের ভিড়ে মিশে যাবো আমি। তোর কোনো ক্ষতি হবে না। তবে মরার আগেও আমি বলবো তোদের অভিযোগ, অপবাদ নিদারুণ মিথ্যে।

উত্তেজনা, আবেগে বুজে গেছে চন্দনের দু' চোখের পাতা। চোখ খুলে সে দেখলো, ঘর ফাঁকা, সবিত নেই। তার মনে হলো, আদৌ কি এসেছিল সবিত, অথবা জ্বরের তাড়সে দুঃস্বপ্ন দেখছে সে? আলো জ্বলছে ঘরে। চাপা কান্নার মতো নিস্তব্ধ পরিবেশ। জানলার পর্দার পেছনে বারান্দায় দেখা গেল সাদা থানের আঁচল।

প্রভাবতী নজর রাখছে। খুঁটিয়ে শুনছে দু' ছেলের বাদবিতণ্ডা। আলো নিভিয়ে আবার শুয়ে পড়লো চন্দন। কীভাবে ধরা পড়লো মিলিন্দ? এধার কী হবে?

প্রশ্ন দুটোর চাপে বারবার ছুটে যাচ্ছে চন্দনের ঘুম।

কী হবে এধার, বাড়িতে কী বলবে, জবাবদিহি করবে সে? অন্ধকার সেলের মধ্যে প্রশ্নগুলো ব্যতিব্যস্ত করছে মিলিন্দকে। আফশোসে হাত কামড়াচ্ছে সে। রাস্তা থেকে রাত বারোটায় পুলিশ তুলে নিতে পারে, মিলিন্দ আশংকা করেনি। বাড়তি আত্ম-বিশ্বাস, অসাবধানতার মাশুল এখন দিতে হবে।

এধার জন্যে দুশ্চিন্তায় একটু অন্যমনস্কও ছিল সে। অন্ধকার মাঠে চোখের সামনে কীভাবে কর্পূরের মতো মেয়েটা উবে গেল, মিলিন্দ হদিশ পাচ্ছিল না। সভা শেষ হতে রাস্তায় বেরিয়ে এধার বাড়িতে যাবার ইচ্ছে ছিল তার। ঘড়িতে রাত বারোটা দেখে যায়নি।

সন্ধ্যে ছটায় শালপাতায় চারটে রুটি, আলু-কুমড়োর ঘ্যাঁট দেওয়া হয়েছিল মিলিন্দকে। পুলিশ সেলের ডায়েট্। মেঝেতে পড়ে আছে খাবার। ক্ষিধের অনুভূতিই নেই। এ মুহূর্তে এধা কী করতে পারে, ভাবার চেষ্টা করছিল মিলিন্দ। তার স্ত্রী, সন্তানের মা হিসেবে অনায়াসে পরিচয় দিতে পারে এধা। কুণালদাকে খবরটা নিজে বলেছে মিলিন্দ। কেউ এগিয়ে না এলেও কুণালদার সাহায্য এধা পাবে। কিন্তু মিলিন্দর মুখ থেকে ভালবাসার কথা না শুনে এধা হয়তো স্ত্রী পরিচয়ে রাজি হবে না। মুখ ফুটে প্রেম, ভালোবাসার কথা মিলিন্দ একদিনও বলেনি তাকে। প্রেমে যার অবিশ্বাস, তার সঙ্গে কেন দাম্পত্য সম্পর্কে যাবে এধা? দ্বিতীয় কাউকে সবকিছু খোলাখুলি জানিয়ে বিয়ে করতে পারে সে। হাতের কাছে আছে চন্দন। এক কথায় রাজি হয়ে যাবে সে। চন্দনের জন্যে উদ্বেগ বোধ করল মিলিন্দ। চন্দন হয়তো এ মুহূর্তে বিপদে আছে। পার্টি অবিশ্বাস করছে তাকে। শাস্তিও দিতে পারে। পার্টির প্রচার এধার কানে গেলে সে হয়তো চন্দনকে পাত্তা দেবে না। তাহলে? কী করবে এধা? কোনো ক্লিনিকে গিয়ে গর্ভপাতের ব্যবস্থা করা কঠিন কাজ নয়। আর যাই করুক, আত্মহত্যা করবে না সে। কনকলতার মুখ মনে পড়লো তার। কাল লাইট্হাউস্ সিনেমার সামনে বই-এর দোকান থেকে রাস্তায় চোখ পড়তে কনকলতাকে দেখতে পেয়েছিল মিলিন্দ। চার বছর পরে কনককে দেখে চমকে গিয়েছিল। তবু এক নজরে তাকে চিনতে পেরেছিল মিলিন্দ। ষোল, সতেরোর ছিপছিপে সেই তরুণী এখন রীতিমতো যুবতী। আরও সুন্দরী হয়েছে কনক। তাকে ঘিরে ছিল তিনজন কেতাদুরস্ত ভদ্র-লোক। পঁচিশ থেকে ত্রিশের মধ্যে তাদের বয়স। দামী শাড়ি পরেছিল কনক। চোখে হালফ্যাশানের হালকা কালো কাচের রোদচশমা। ধবধবে সাদা পলার মতো সাজানো দাঁতে ঝিলিক তুলে মাঝে মাঝে হাসছিল সে। কমলকলির ছোট বোন কনকলতাও

চার বছর আগে কুমারী অবস্থায় গর্ভবতী হয়েছিল। ষোল, সতেরো বছরের মেয়েটার মাতৃত্বের দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেছিল অধ্যাপক পুলকেশ সেন। অথচ জড়িত ছিল সে। চার বছর আগের ঘটনাগুলো ছবির মতো নিমেষে ভেসে উঠেছিল মিলিন্দর মাথায়। তখনই দেখলো, তিনি পুরুষসঙ্গীর সঙ্গে বই-এর দোকানের দিকে এগিয়ে আসছে কনক। নুন্ শোতে সিনেমা দেখতে এসেছিল নিশ্চয়। ফুটপাতের কাছে কনক এসে দাঁড়াতে গুড়গুড় করে উঠলো মিলিন্দর বুক। ইচ্ছে করেই নিজেকে লুকোলো না সে। একটা সাদা অ্যাম্বাসাডারে উঠলো চারজন। সামনে দু'জন,পেছনে দু'জন। সামনের সিটে বসলো কনক। শাঁখের মতো মসৃণ, লম্বা গ্রীবা ঘুরিয়ে বাঁয়ে নজর ফেলেই সে দেখলো মিলিন্দকে। অবাক চোখে দু' তিন সেকেন্ড্ চেয়ে থাকলো। তারপর না চেনার ভান করে সরিয়ে নিল দৃষ্টি। গাড়ি ছেড়ে দিতেই অপমানিত মিলিন্দ ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। সে চাইছিল গাড়ি থেকে অন্তত একবার কনক দেখুক, মিলিন্দ তাকিয়ে নেই। পেছন ফিরে দাঁড়াতে জানে সে।

চৌরঙ্গীর মুখ ছুঁয়ে সাদা অ্যাম্বাসাডার যে ফিরে এসেছে, খেয়াল করেনি মিলিন্দ। সিমোন দ্য ব্যুভেয়ারের লেখা, এডিউ বইটা নেড়েচেড়ে দেখছিল সে। ভাবছিল, অন্য কথা। কমলকলির ছোট ভাই মিঠুনের সঙ্গে বছর দুই আগে একবার মিলিন্দর দেখা হয়েছিল। মিঠুনের মুখে মিলিন্দ খবর পেয়েছিল, আসামে আছে কনকলতা। তার মেয়ে আছে কলকাতায় মিঠুনদের বাড়িতে। নাতনিকে ঘরে রেখে মেয়েকে গৌহাটি পাঠিয়ে দিয়েছে যতীন দত্ত। মেয়েলি গলা ডাকলো, মিলিন্দদা ?

সামান্য চমকে ঘাড় ঘুরিয়ে কনকলতাকে দেখলো সে। পেছনে ফুটপাত ঘেঁসে দাঁড়িয়েছে গাড়ি। কনকের সঙ্গীরা গাড়িতে বসে আছে। মিলিন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে মধুর হেসে কনক প্রশ্ন করল, চিনতে পারছেন ?

একবার দেখেই চিনেছি।

কথা বললেন না কেন ?

সুযোগ পেলাম না।

জবাব দিয়ে মিলিন্দ প্রশ্ন করল, চলে গিয়ে আবার ফিরে এলে কেন ?

আপনার ঘুরে দাঁড়ানোর জন্যে।

আমি জানতাম।

কী জানতেন ?

আমি ঘুরে দাঁড়ালে ফিরে আসবে তুমি।

একদম আগের মতো আছেন।

মৃদু হেসে মিলিন্দ প্রশ্ন করেছিল, কেমন আছো তুমি ? কোথায় আছো ?

পেছনে গাড়ির দিকে এক লহমা তাকিয়ে কনকলতা বলেছিল, সে অনেক গল্প। একদিন আসুন, সব বলবো।

ঠিকানা ?

সেণ্ট্রাল এ্যাভিনুর একটা ঠিকানা দিয়ে কনকলতা বলল, জায়গাটার আসল নাম সোনাগাছি।

কথাটা বলে তীক্ষ্ণ নজরে সে দেখলো মিলিন্দকে। তারপর বলল, ভয় নেই, দেখা হলে শরৎ চাটুজ্জের গল্প শোনাবো না।

গলা শুকিয়ে গেলেও হাসার চেষ্টা করল মিলিন্দ।

আসবেন কিন্তু।

কথাটা বলে তাড়াতাড়ি গাড়িতে গিয়ে উঠলো কনকলতা। চলন্ত গাড়ি রাস্তার বাঁকে মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিল মিলিন্দ। ঘুরে দাঁড়াবার কথা আর ভাবতে পারেনি।

সেলের বাইরে বুটের খটখট শব্দ। ডিউটি সিপাই ঘুরছে। কনকলতার রাস্তায় এধা নিশ্চয় যাবে না। যদি যায়? কথাটা ভেবে চঞ্চল হলো মিলিন্দ। বিশুদ্ধ, নিষ্কাম প্রেম করার সামাজিক বিধান ভাঙার জন্যে যদি শাস্তি পায় এধা? সমাজ যদি বার করে দেয় তাকে? নাহ্, তা হবে না। যতীন দত্তর পরিবারের সঙ্গে এধার পরিবারের অনেক তফাৎ। কিন্তু কীভাবে বিপদ থেকে রেহাই পাবে এধা? চন্দন বাঁচাতে পারে। কিন্তু এ মুহূর্তে চন্দনও নিশ্চয় বিপর্যস্ত। এধা আমল দেবে না তাকে। মিলিন্দর মনে হলো, সে, তার বন্ধুরা সকলেই হাউইবাজী। জ্বলে উঠে রঙীন আলো ছড়িয়ে ছাই হবার জন্যে উসখুস করছে সবাই। যে কোনো রকমের একটু আগুন, রাজনীতি, শিল্প, সাহিত্য, যৌনতার কুঁচো ফুলকি ছুঁয়ে দিলেই পরম আহ্লাদে সকলে জ্বলতে থাকবে। এতটুকু কষ্ট, জ্বালা পাবে না কেউ।

একবার, একটি দিনের জন্যে এই হাজত থেকে বেরোতে চায় সে। তারপর আজীবন কারাবাস, ফাঁসিতেও তার আপত্তি নেই। চব্বিশ ঘণ্টায় দুটো কাজ সারবে সে। এধার সঙ্গে সম্পর্কের সামাজিক, আইনী চেহারা দেবে, আর জানিয়ে আসবে তার অ্যারেস্টে চন্দনের হাত নেই। চন্দন আঠারো আনা নির্দোষ, নিরপরাধ, বিশ্বাসী বন্ধু। একটা দিনের জন্যে মুক্তি চায় সে। চিন্তার টানাপোড়েনে সেলের মধ্যে পাগলের মতো পায়চারি শুরু করল মিলিন্দ। তার মনে হলো, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাময়িক একটা আপোস, রফা করলে এ ঝামেলা মিটে যায়। দু' তিন জোড়া ভারি বুটের শব্দ সেলের দিকে এগিয়ে আসছে। গরাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো মিলিন্দ। তাকে নিতে এসেছে উর্দিপরা তিন পুলিশ। জোরালো টর্চের আলো পড়লো ফাটকের তালায়। খুলে গেল লোহার ফটক। গম্ভীর গলায় একজন বলল, যেতে হবে আপনাকে।

সেলের বাইরে মিলিন্দ আসতে তার গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়ালো দুজন। টর্চধারী থাকলো সামনে। তিনতলার সেল থেকে প্রহরীদের সঙ্গে একতলায় নামলো মিলিন্দ। সামনে অন্ধকার উঠোন। উঠোন পেরিয়ে লম্বা সরু করিডোর। মিটমিটে আলো জ্বলছে সেখানে। করিডোরের শেষ মাথায় ছোট ধাপওলা মইয়ের মতো খাড়া সিঁড়ি। অন্ধকার সিঁড়ি ওপরে কোথায় পৌঁচেছে, দেখতে পেল না মিলিন্দ। টর্চের এক ঝলক আলোয় মিলিন্দর মনে হলো, সিঁড়িটা আকাশ ছুঁয়েছে। কোথাও কোনো শব্দ নেই। মাঝরাত। তাকে মাঝখানে রেখে সিঁড়ি ভেঙে উঠছে তিন পুলিশ। সামনের টর্চধারী হাঁকলো, সাবধান।

সতর্ক পায়ে সিঁড়ি ভাঙছে মিলিন্দ। পা ফেলতে ভুল হলে কোথায় ছিটকে পড়বে, ঠিক নেই। একটার পর একটা ধাপ, উঠছে তো উঠছেই, শেষ হচ্ছে না সিঁড়ি। এই শীতেও ঘাম জমছে তার কপালে। ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে। টর্চধারী হাঁকলো, সাবধান।

দাঁড়িয়ে গেল সবাই। টর্চের আলোয় মিলিন্দ দেখলো, ডানদিকে একতলার মতো লম্বা, সরু করিডোর। তিন পুলিশের সঙ্গে করিডোরে এলো মিলিন্দ। করিডোরের দু'পাশে মুখোমুখি সারি সারি ঘর। সব ঘরের দরজা বন্ধ। এক পাল্লার কাঠের দরজার ওপর ঘসা কাচ লাগানো। ঘসা কাচের ওপাশে প্রতিটি ঘর আলোকিত। বাইরে থেকে দেখা না গেলেও মিলিন্দ বুঝলো, আলো জ্বলছে সব ঘরে। আলোকিত কফিনের মতো নিস্তব্ধ প্রতিটি ঘর। করিডোরের শেষ ঘরের দরজা খুলে এক পুলিশ ভেতরে যেতে বলল মিলিন্দকে। মিলিন্দ ঘরে ঢুকতে নিঃশব্দে বন্ধ হলো পেছনের দরজা। ঘরে ঢুকে প্রচণ্ড আলোয় ধেঁধে গেল তার চোখ। যন্ত্রণায় চোখ বুজলো সে। কয়েক সেকেণ্ড পরে চোখ খুলে দেখলো, বিরাট হল ঘরের এককোণে দুটো চেয়ারে বসে আছে সাদা পোষাকের দুই পুলিশ। টেবিলে ঘাড় গুঁজে কাজ করছে তারা। মিলিন্দ ঢুকতেও তাকালো না কেউ। খুকখুক করে কাশলো মিলিন্দ। তবু ফাইল থেকে চোখ তুললো না তারা। হলের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে মিলিন্দ। ক্লান্তি, অবসাদে ভেঙে পড়ছে তার শরীর। হাঁটু থেকে দু'পা যেন খসে যাবে। ঘরের কোণে দুটো চেয়ারে একভাবে বসে আছে দু'জন অচেনা মানুষ। মিলিন্দর মনে হলো, লোক দুটো বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। তা না হলে ফাইলের একটা পাতা খুলে এতোক্ষণ বসে থাকবে কেন? পরমুহূর্তে সে ভাবলো, চেয়ারে যারা বসে আছে, তারা বোধহয় রক্তমাংসের মানুষ নয়। পাথর বা কাঠের পুতুল।

এভাবে কতো সময় দাঁড়াতে হবে, বুঝতে পারলো না মিলিন্দ। চিন্তার বিদ্যুৎ ঝলসে উঠলো মাথায়। এখান থেকে পালানো যায় না? দরজার দিকে তাকালো মিলিন্দ। সেই মুহূর্তে গম্ভীর গলার প্রশ্নে গমগম করে উঠলো ঘর। একজন প্রশ্ন করলো, কি চাও, জীবন, না মৃত্যু?

দু'জনের কে প্রশ্নটা করল, বুঝতে পারলো না মিলিন্দ। অচেনা দু'জন মানুষের দিকে মিলিন্দ কয়েক পা এগিয়ে গেলেও চোখ তুললো না তারা। তীব্র আলোয় জ্বালা করছে মিলিন্দর চোখ। আবার সেই প্রশ্ন, কী চাও, জীবন, না মৃত্যু, শুনলো মিলিন্দ। দু'জনের দিকে তাকিয়ে সে বলল, একদিনের স্বাধীনতার বিনিময়ে মরতে রাজি আছি আমি। একটা দিন নিজের মতো করে বাঁচতে চাই।

মিলিন্দ চুপ করতে নিস্তব্ধ হলো ঘর। টেবিলের ওপাশে একজন ধীরে ধীরে মুখের সামনে থেকে ফাইল সরালো। টাক মাথা মাঝবয়সী লোকটার মুখে সীমাহীন বিরক্তি। সে বলল, এটা যাবজ্জীবন মৃত্যুদণ্ডের বিভাগ। ভুল জায়গায় আনা হয়েছে তোমাকে।

বাইরে ঘণ্টা বাজতে চেনা দুই পুলিশ ঘর থেকে নিয়ে গেল মিলিন্দকে। অন্ধকার, সরু করিডোরে ছায়ার মতো চলাফেরা করছে দু'একজন মানুষ। সঙ্গী

পুলিশদের একজনকে মিলিন্দ বলল, একদিনের জন্যে স্বাধীনভাবে বাঁচতে চাই আমি। যে কোনো দামে রাজি।

দুই পুলিশের কেউ কথা বলল না। করিডোরের ফ্যাকাশে আলোয় অস্পষ্ট দেখাচ্ছে তাদের। লম্বা, সরু করিডোরে দু'পাশে দু'সঙ্গী নিয়ে হাঁটছে মিলিন্দ। করিডোরের এ-মাথা, ও মাথা দেখা যায় না। মিলিন্দ হেঁটেই চলেছে। নিঃশ্বাস যখন কণ্ঠনালীতে প্রায় আটকে গেছে, একটা ঘরের বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে গেল দুই পুলিশ। তারা দাঁড়াতে খুলে গেল বন্ধ দরজা। মিলিন্দকে ঠেলে তারা ঘরে ঢুকিয়ে দিতে দরজা বন্ধ হলো। এটাও একটা হলঘর। ঘরে চড়া আলো। এ ঘরের কোণে তিনটে চেয়ার, তিনটে টেবিল। মাঝখানের চেয়ারে বসে আছে একজন। বাকী দুটো খালি। এখানেও বাইরের কারো বসার জায়গা নেই। প্রখর আলোয় টনটন করছে মিলিন্দর চোখ। এ ঘরে মিলিন্দকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। চেয়ারে বসা বেঁটেখাটো, সুখিসুখি মুখ লোকটা মিলিন্দকে বলল, সবচেয়ে দুর্লভ, দামী জিনিস চেয়েছো তুমি। কিন্তু একদিনের স্বাধীনতা কেন চাও?

লোকটার গলায় সহানুভূতি টের পেয়ে মিলিন্দ খোলাখুলি জানালো সব। এধা এবং চন্দনের জন্যে নিজের দায়িত্ব, উদ্বেগের বিশদ ব্যাখ্যা দিল। তার কাহিনী শুনতে শুনতে কঠিন, নির্মম হতে থাকলো বেঁটে লোকটার সুখি, পরিতৃপ্ত মুখ। মিলিন্দ থামতে লোকটা বলল, ফুঃ, তুমি একটা অপদার্থ, গাড়োল। একশো মহিলাকে ধর্ষণ না করলে কারও মামলা আমি শুনি না। মাত্র একটা মেয়েকে পোয়াতি করে এখানে ইয়ার্কি মারতে এসেছো? গেট্ আউট্।

হুঙ্কার ছাড়ার পরের সেকেন্ডে আবার হাসিহাসি হলো লোকটার মুখ।

যন্ত্রণাকাতর চীৎকারে হঠাৎ দুলে উঠলো গোটা বাড়ি। অন্ধকার নামলো মিলিন্দর চোখে। তার কানের পর্দায় বাজতে থাকলো একটা প্রশ্ন, কী চাও, জীবন না মৃত্যু?

আর্তনাদ, হৈচৈ, কান্নার স্রোতে ভেসে যাবার মুহূর্তে মিলিন্দ বলল, একটা দিনের স্বাধীনতার জন্যে মরতে পারি আমি।

পাড়ায় শতদলের মুখে সকালে মিলিন্দর ধরা পড়ার খবর শুনে দমে গেল পরমেশ। বেলা এগারোটার আগে সাধারণত বাড়ি থেকে সে বেরোয় না। এগারোটায় খালি হয়ে যায় পাড়া। রাস্তায় চেনা-জানা এমন কেউ থাকে না, যে প্রশ্ন করবে, কোথায় চললেন? অফিসে নাকি? কোন্ অফিসে যেন আপনি?

সকলের প্রশ্নেই হাসি মুখে পরমেশ জবাব দেয়, খুদ-কুড়োর সন্ধানে।

মুখে হাসি থাকলেও বিষিয়ে যায় তার মন। চারপাশের লোকগুলো কি অভদ্র! একজনের পেশা জানার জন্যে কি অসম্ভব তাদের কৌতূহল! সে কোথায় যায়,

কাজ করে, তাতে কার বাবার কি ? কোনো বেটা বিপদে একটা পয়সা সাহায্য করবে না। অথচ হাঁড়ির খবর জানতে চাইবে। ছাগল, বিশাল ছাগল সব। চাকরি করা যেন এক দারুণ পুণ্যকর্ম। না করা মহাপাপ। আহার, নিদ্রা, মৈথুনের মতো দশটা পাঁচটার চাকরিতে জুতে না যাওয়া কি অপরাধ ? স্থির কোনো পেশায় লেগে না থাকা কি সন্দেহজনক ? প্রশ্ন জাগতে পরমেশের মনে হলো, নির্দিষ্ট পেশা সে ছেড়ে দেবার পরে চোখের পলকে চলে গেল দশ বছর। কতো কাজ করার ছিল, কিছুই করা হয়নি। নিষ্ফল ঝরে গেল দশটা বছর। ত্রিশ থেকে চল্লিশে পেঁছে পরমেশ টের পাচ্ছে. গড়গড় করে বাড়ছে সময়ের গতি। মনে পড়লো ঘৃণায় কুঁকড়ে ওঠা বন্দনার মুখ। তখনই মিলিন্দর খবর তাকে শোনালো শতদল।

খবর শুনে দাঁড়িয়ে গেল পরমেশ। শতদলকে দেখলো। কাঁচ দাড়ি ভরা মুখ। বছর একুশ, বাইশের বেশি নয় শতদল। পরমেশ প্রশ্ন করল, কবে হয়েছে ব্যাপারটা ?

কাল রাতে।

জবাব দিয়ে পরমেশকে দেখছে শতদল।

পরমেশ বিড়বিড় করল, আশ্চর্য ব্যাপার ! কালই।

কিছু বলতে গিয়ে পরমেশ চুপ করে যেতে শতদল বলল, কালই মিলিন্দদার সঙ্গে দেখা হলো আপনার। কালই ধরা পড়লো সে। সত্যি আশ্চর্য !

পরমেশের শিরদাঁড়ায় বয়ে গেল হিমেল স্রোত। শতদল কী বলতে চাইছে, বুঝেছে সে। দ্রুত পায়ে গলির ভেতরে ঢুকে গেল শতদল। তার কথা, আচরণে পরমেশ স্তম্ভিত। মিলিন্দদের দলের সঙ্গে শতদলের গোপন যোগাযোগ, পরমেশ জানে। মাঝরাতে শতদলকে দেওয়ালে একাধিকবার পোস্টার মারতে দেখেছে সে। কথা বলা দূরে থাক, তাকে এড়িয়ে গেছে শতদল। সে ছেলে আজ যেচে কেন মিলিন্দর গ্রেপ্তারের খবর শোনালো ? তার মুখ দেখে কি কিছু আঁচ করতে চাইলো ? তার সঙ্গে মিলিন্দর দেখা হওয়া এবং ধরা পড়ার মধ্যে কোন্ যোগসূত্র খুঁজে পেল শতদল ?

ম্লান হয়ে গেছে ঝলমলে শীতের সকাল। পরমেশের মাথায় দুশ্চিন্তা। কোনো কাজ হবে না আজ। মেজাজ নষ্ট হয়ে গেছে। এসপ্ল্যানেডে ন্যাশানাল লাইব্রেরিতে পুরোনো সংবাদপত্র পড়ার ইচ্ছে ছিল। আজ আর সম্ভব নয়। পরমেশের কাঁধে কাপড়ের ঝোলায় আছে লেখার প্যাড, কলম, কিছু সংবাদপত্রের ক্লিপিংস্, কাঁচিতে কাটা খবরের টুকরো। সাংবাদিক প্রমাণ করতে এগুলো রাখতে হয় তাকে। গত দু'দিন লাইব্রেরিতে বসে কিছু নোটও নিয়েছে। আজ বসলে প্রায় শেষ হতো কাজ। কিন্তু তাকে বেসামাল করে দিয়েছে শতদল। সে আতঙ্কিত। এধার সঙ্গে দেখা করে পুরো ঘটনা জানতে হবে। এখনই জানা দরকার। হ্যাঁ, এখনই। একটা ভিড় ট্রামে উঠলো পরমেশ। মুরগি বোঝাই জাল লাগানো ঝাঁকার মতো ট্রাম, বাস। বোধহয় তার চেয়েও খারাপ। গরু, ছাগলের চলমান খোঁয়ার। কী দুর্গন্ধ ! এভাবে মানুষ বাঁচে নাকি ? আসলে মানুষ আর মানুষ নেই। গরু ছাগলের স্তরে নামিয়ে আনা

হয়েছে তাকে। মানুষ আজ গরু, ছাগল। আরও নিকৃষ্ট হতে পারে। গাদাগাদি ভিড়ে নাজেহাল, বিধ্বস্ত পরমেশ পৌঁছোলো এধাদের বাড়ি। এধার কাকা নিরুপম, পরমেশের বন্ধু। অফিসে বেরিয়ে গেছে নিরুপম। এধা বাড়ি নেই। এধার মা রেনুকা বলল, বারোটায় ভাত খেয়ে বেরিয়ে গেছে এধা। কখন ফিরবে, বলা মুশকিল।

এধাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে পরমেশ কী করবে ভেবে পেল না। একটু দূরে পুরসভার পার্ক। পার্কের এক দিকে সবুজ ঘাস, গাছপালা, আর এক পাশ ন্যাড়া, ঘাস, গাছপালা নেই। ন্যাড়া মাঠে ক্রিকেট খেলছে একদল ছেলে। ঘাসে ঢাকা পার্কের সবুজ, নির্জন একটা বেঞ্চে বসলো পরমেশ। ঘাসে ছড়িয়ে আছে চনমনে রোদ। মুখে গামছা ঢেকে ঘাসের ওপর আরামে ঘুমোচ্ছে একজন মানুষ। লাঠি হাতে পোষা কুকুর চরাচ্ছে এক প্রৌঢ়। এধার সঙ্গে দেখা না করে ফিরবে না পরমেশ। যতোক্ষণ দরকার, অপেক্ষা করবে। হাতঘড়িতে দুটো পাঁচ। ঘুমের মধ্যে পাশ ফিরলো ঘাসে শোয়া লোকটা। কুকুর নিয়ে ফিরে যাচ্ছে প্রৌঢ়। ক্রিকেট খেলছে অক্লান্ত ছেলের দল।

শীতের দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে ঠাণ্ডা নামছে। রাস্তার ওপর চোখ রেখে বসে আছে পরমেশ। এধার বাড়ি ফেরার এটাই পথ। একমাত্র পথ। মিলিন্দর ধরা পড়ার জন্যে কেন, কীভাবে তাকে জড়ানো হয়েছে, পরমেশ জানতে চায়। এধার মুখ থেকে আসল খবর শোনা যাবে। দশবছর হলো পরমেশের সংসার ভেঙেছে। তার আগে বন্দনার সঙ্গে ঘর করেছে পাঁচ বছর। বিয়ের দু'বছর পরে জন্মালো সায়ন। তখন এক দৈনিক সংবাদপত্রে কাজ করতো পরমেশ। সত্যিকার সাংবাদিক ছিল। বন্দনা ছিল স্কুলশিক্ষিকা। চিরকালই পরমেশ একটু বিশৃঙ্খল। উচ্ছৃঙ্খল নয়। এমন স্বাধীনতা সে ভোগ করতো, যা প্রায় স্বেচ্ছাচার। সমাজ, পরিবার এ স্বেচ্ছাচার মেনে নিলেও বিয়ের দু' বছর না যেতেই বন্দনার সঙ্গে তার খটাখটি লাগলো। দুপুর একটায় অফিসে যেতো সে। সাধারণভাবে এ সময়েই সাংবাদিকরা অফিসে যায়। বাড়ি ফিরতে রাত বারোটা হতো। বেলা দশটার আগে ঘুম থেকে উঠতো না। ঘুম থেকে উঠে পরমেশ দেখতো, স্কুলে চলে গেছে বন্দনা। বাড়ি ফিরে দেখতো, বন্দনা ঘুমোচ্ছে। হপ্তায় দু' তিন দিন মদ খেতো পরমেশ। হুটহাট চলে যেতো কলকাতার বাইরে। কখনো কাজে, কখনো বেড়াতে। অথচ বেয়াদপি ছিল না তার স্বভাবে। মদ খেয়ে কখনও মাতাল হয় নি। নীতি, রুচি বিরোধী কাজ করেনি। নৈতিক অধঃপতনকে ঘৃণা করতো সে। তবু তার জীবনযাপনের ধারা মেনে নিতে পারলো না বন্দনা। শুরু হয়ে গেল মতান্তর, ঠাণ্ডা সংঘর্ষ। বিয়ের পর বছর ঘুরতেই বিধবা মা হেমনলিনীকে দেশের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিল পরমেশ। তবু ঝগড়া, অশান্তি লেগে থাকলো। বন্দনার সঙ্গে ঝগড়া হলে মধ্যবিত্ত জীবনের বাঁধা ছকে কিছুদিনের জন্যে ফিরে আসতো সে। আবার ছিটকে বেরিয়ে যেতো। বিশাল, মহৎ কিছু করার স্বপ্ন দেখতো। মদ্যপান, স্ত্রীসংসর্গে বিয়ের পর, কয়েক বছরের মধ্যে অরুচি ধরে গিয়েছিল তার। বন্দনার উদগ্র ক্ষুধা তখনও কাটেনি। তাকে

অতৃপ্ত রেখে মজা পেত পরমেশ। সংবাদপত্রের মালিকের সঙ্গেও পরমেশের সদ্ভাব ছিল না। বামপন্থী মতামতের জন্যে চাকরি থেকে তাকে হটাবার সুযোগ খুঁজছিল মালিকপক্ষ। মালিকপক্ষের মতলব পরমেশ জানতো। একদিন সে নিজেই স্বেচ্ছায় জমা দিল পদত্যাগপত্র।

তার চাকরি ছাড়ার খবর এক, দেড় মাস পরে জেনেছিল বন্দনা। বরফের ইটের মতো শীতল, কঠিন, নিস্তব্ধ হয়ে গেল সে। তারপর নামলো বিধ্বংসী হিমবাহ। বন্দনার হুলফোটানো কথা, আক্রমণ মুখ বুঝে সহ্য করছিল পরমেশ। সংকট তুঙ্গে গেল যেদিন তার মায়ের প্রসঙ্গে বন্দনা বলল, মা বেশ্যা হলে ছেলের চরিত্র আর কী হবে ?

কথাটা শুনে ঝাঁঝাঁ করে উঠলো পরমেশের মাথা। সপাট চড় কসিয়েছিল বন্দনার গালে। মেঝেতে বন্দনা পড়ে গিয়েছিল। তার ফর্সা গালে ফুটে বেরিয়েছিল পাঁচ আঙুলের গোলাপি দাগ। বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল পরমেশ। ফিরলো পরের দিন। খালি বাড়ি। কেউ নেই। তিন বছরের সায়নকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেছে বন্দনা। পরমেশ বুঝেছিল, বন্দনা ফিরবে না। তাই হলো। তিন মাস পরে উকিলের নোটিস পেল সে। বিবাহবিচ্ছেদ চেয়েছে বন্দনা। পরমেশ আপত্তি করল না। তার মনে হয়েছিল, মায়ের কুমারীজীবনের এক গোপন দুর্ঘটনার খবর অন্তরঙ্গ মুহূর্তে বন্দনাকে জানানো ভুল হয়েছে। ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্যে স্বামীদের সব খবর, কথা নিজেদের তূণে সাজিয়ে রাখে মেয়েরা। নিকটতম মানুষকেও রেয়াত করে না।

খালি বাড়িতে দেশ থেকে আবার হেমনলিনীকে নিয়ে এলো পরমেশ। বন্দনার অনুপস্থিতিতে ফিরে পেলো হারানো স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা। শুরু হলো বিরাট কিছু করার স্বপ্ন। তবু এক অভাব, নিঃসঙ্গতা প্রায়ই কাবু করে তাকে। নিভেজাল বেকার জীবনের সুখের মধ্যে অনুভব করে পোকার কামড়। পেশাবিহীন পরমেশকে নিয়ে সে সময়ে পরিচিত মহলে দেখা দিয়েছিল সন্দেহ, অবিশ্বাস। দেশের জমিজমা এবং মায়ের জমানো টাকার আয়ে সংসার চলছে, একথা কাউকে বলতে পারতো না সে। সন্দেহ এমন পর্যায়ে পেঁছোলো, যে একদিন পার্টি নেতা, স্বয়ং কৈফিয়ৎ চেয়ে বসলো। পরমেশ বলেছিল, এ আমার ব্যাক্তিগত ব্যাপার।

নেতা বলেছিল, দলের মধ্যে থাকলে ব্যক্তিগত ব্যাপারও দলকে জানাতে হয়।

সেদিন থেকে আর দলীয় দপ্তরে যায় নি সে। তবে ঘটনাগুলো চোখ খুলে দিয়েছিল তার। পেশার ছদ্মবেশ পরা দরকার, বুঝেছিল সে। তখন থেকে স্বাধীন সাংবাদিক সাজলো। কেউ বিশ্বাস করল, কেউ করল না। কিন্তু গত দশ বছর একটানা সাংবাদিক পরিচয় দেবার জন্যেই বিশ্বাসীর সংখ্যা বেড়েছে। পরমেশও বিশ্বাস করে নিয়েছে এই বানানো পরিচয়। কিন্তু বড়ো কিছু করতে না পারার যন্ত্রণা আজও তার কাটেনি।

বিকট হরিধ্বনি তুলে রাস্তা দিয়ে চলে গেল একদল শ্মশানযাত্রী। তাদের দেখে পরমেশের মনে হলো, পিক্‌নিক্‌ করতে যাচ্ছে তারা। জীবন এবং মৃত্যু মিলে একটা

চড়ুইভাতি। পড়ন্ত বেলা। এধাকে ফিরতে না দেখলেও বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো পরমেশ। এধার কাছ থেকে অনেক খবর জানার আছে। রাস্তার আলো এখনও জ্বলে নি। কুয়াশায় মিশছে গৃহস্থ বাড়ির চুলোর ধোঁয়া। এক কাপ চায়ের তেষ্টায় রাস্তার ডান পাশের দোকানে নজর ফেলতে এধাকে দেখতে পেল পরমেশ। অন্যমনস্ক এধা শিথিল পায়ে বাড়ি ফিরছে। ডাকতে গিয়েও পরমেশ ডাকলো না তাকে। জরুরী কথাগুলো রাস্তায় বলা যাবে না। তাছাড়া এধাকে দেখে ক্লান্ত মনে হচ্ছে। বিশ্রাম দরকার তার। ম্লান দেখাচ্ছে তাকে। পরমেশ ঠিক করল, চা খেয়ে আধঘণ্টা পরে যাবে এধাদের বাড়ি।

আধঘণ্টা পার করে এধাদের বাড়ি ঢুকলো পরমেশ। সাবেক আমলের বাড়ি। শ্রী, ছাঁদ নেই। সদর দরজার পরেই বড়ো উঠোন, ঠাকুর দালান, লম্বা রোয়াক। পরিকল্পনাহীন বাড়ি। বাইরে থেকে ইট, সিমেন্টের ঢিবি মনে হয়। অন্ধকার এক-তলা। কোথাও আলো জ্বলেনি এখনও। উঠোনের শেষে একটুকরো চাতাল। তারপর দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। সরু সিঁড়ি, উঁচু ধাপ। এ বাড়ি, সিঁড়ি পরমেশের চেনা। একান্নবর্তী এ পরিবারের মানুষগুলোও তার পরিচিত। সংসার যৌথ হলেও মন, চিন্তা, রুচিতে পরিবারের প্রত্যেকে আলাদা। এক ছাতের নিচে বয়ে চলেছে কয়েক ডজন মানুষের স্বতন্ত্র জীবন প্রবাহ। কারো ব্যাপারে নাক গলায় না কেউ। যান্ত্রিক নিয়মে পাশাপাশি বাস করছে। নিরুপমকে ফোন করে হয়তো শুনলো, বাড়িতে নেই। পরে দেখা হতে পরমেশ জানলো, নির্দিষ্ট দিন, সময়ে বাড়িতেই ছিল সে। নিরুপমও করেছে এ কাণ্ড। তাকে ফোন করে এধাকে কোনো খবর পাঠিয়ে পরমেশ পরে জেনেছে, খবরটা পায়নি এধা। নিরুপমকে প্রশ্ন করতে আলস্যে হাই তুলে সে বলেছে, একদম ভুলে গেছলুম।

পরমেশ হেসেছে। সে জানতো, মিথ্যে বলেনি নিরুপম। এ বাড়িতে কারো সঙ্গে যেমন কারো যোগাযোগ নেই, মনকসাকসি, ঝগড়াও নেই। সে সব করার উদ্যমই হারিয়ে ফেলেছে সবাই। এ ইমারতের সর্বাঙ্গে, এমনকি বাতাসেও মিশে আছে উদ্যমহীনতা। এখানে এলে পরমেশের তাই মনে হয়, হাজার বছর আগের এক পৃথিবীতে ঢুকে পড়েছে সে। এ বাড়িতে সে উটকো, অবাঞ্ছিত। অন্ধকার সিঁড়িতে যে লোকটার মুখোমুখি হলো, এখানে তাকে আগে কখনও দেখেনি পরমেশ। সে এধার খুড়তুতো ভাই অঞ্জন। সে নিজেই তার পরিচয় দিল। অথচ পরমেশের পরিচয় জানতে চাইলো না। নিরুপম বাড়ি ফিরেছে কিনা বলতে পারলো না অঞ্জন। নিরুপমের ঘর ছুঁয়ে এধার ঘরে গেলে কারও চোখে খারাপ ঠেকবে না। তাই করল পরমেশ। নিরুপমের তালা বন্ধ ঘরটা দেখে তিনতলার দালানের শেষে এধার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো। কম পাওয়ারের একটা আলো জ্বলছে দালানে। ফ্যাকাসে আলোয় দেখা যাচ্ছে তিনতলার দালানের চারপাশে ছড়ানো অনেকগুলো ঘর। কোনো ঘরের দরজার বাইরে থেকে তালা ঝুলছে, ভেতর থেকে বন্ধ কোনো ঘর। সব ঘরের দরজাই বন্ধ। কে এলো, গেলো, আছে, নেই দেখার আগ্রহ বোধ করে না কেউ। বাড়ির যে কোনো জায়গায় যে কোনো লোক ঢুকে যেতে পারে।

বসবাস করলেও কেউ ঠেকাবে না।

এধার ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। নিস্তব্ধ ঘর। ঘরে আলো জ্বলছে কিনা বুঝতে পারছে না পরমেশ। বন্ধ পাল্লায় দু'বার টোকা মারলো সে। ভেতর থেকে সাড়া দিল না কেউ। আবার টোকা লাগিয়ে পরমেশ দাঁড়িয়ে থাকলো। তার বুকের ধুকপুকুনি উত্তেজনায় বেড়ে গেছে। ঘরে হালকা পায়ের শব্দ। দরজা খুলে গেল। পরমেশ দেখলো দরজার একটা পাল্লা ধরে দাঁড়িয়ে এধা। অন্ধকার ঘর। দালানের ফিকে আলোয় ধোঁয়াটে দেখাচ্ছে এধাকে। তার মুখ, চোখ দেখে ঘাবড়ে গিয়ে পরমেশ প্রশ্ন করল, শরীর খারাপ ?

নাহ্। তেমন কিছু নয়। মাথা ধরেছে।

কথাটা বলে ঘরে আলো জেলে পরমেশকে এধা বলল, আসুন।

এধার পেছনে ঘরে ঢুকলো পরমেশ। মাঝারি সাইজের চৌকোনা ঘরের মেঝেতে সাদা, কালো পাথর লাগানো। ডান পাশে জানলার গা ঘেঁসে পুরোনো আমলের সিঙ্গল্ খাটে এধার বিছানা। বাঁ দিকের দেওয়ালের সামনে পড়ার টেবিল, চেয়ার, বই-এর আলমারি। আয়না লাগানো কাঠের ছোট একটা আলমারি। অগোছালো বিছানা, পড়ার টেবিল দেখে অবাক হলো পরমেশ। এ ঘরে আগেও এসেছে সে। কখনও এরকম দেখেনি। বরং সব সময়ে নিখুঁত, পরিপাটি সাজানো এধার ঘর দেখে মনে হয়েছে, এ বাড়িতে এধাই একমাত্র জীবন্ত, উদ্যমী মানুষ।

পরমেশকে চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বিছানায় আধশোয়া হয়ে বসলো এধা। লালচে মুখ, ঝুলে পড়া চোখের পাতা দেখে বোঝা যাচ্ছে, সত্যি মাথা ধরেছে তার। তবু কিছু কথা তাকে বলতে চায় পরমেশ। কীভাবে শুরু করবে, সে ভাবছে। সারা দুপুর নির্জন মাঠে একা বসে তৈরি সংলাপের একটাও স্মরণ করতে পারলো না। আলটপকা সে প্রশ্ন করল, কীভাবে ধরা পড়লো মিলিন্দ ?

ধরিয়ে দিয়েছে কেউ।

জবাব শুনে আশঙ্কায় আঁতকে উঠলো পরমেশ। তাকে দেখছে এধা। সাংঘাতিক কিছু শোনার জন্যে কান খাড়া করে আছে পরমেশ। শতদলের চেয়ে হয়তো আরো জঘন্য আক্রমণ তাকে করবে এধা। তার বিপন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে এধা বলল, বিশ্বাসঘাতকতা।

শব্দটা উচ্চারণ করে বিছানা থেকে নেমে দৌড়ে কলঘরে ঢুকলো এধা। কলঘরে বমি করার আওয়াজ। এধা বমি করছে নাকি ? অনড় বসে বমি করার শব্দ শুনছে পরমেশ। মুখ, কপাল ধুয়ে তোয়ালে হাতে ঘরে ফিরলো এধা। মাথার সামনের চুলে জল লেগে আছে। তোয়ালেতে মুখ মুছে বিছানায় বসে সে হাঁপাচ্ছে।

কী হয়েছে তোমার ? ডাক্তার ডাকবো ?

পরমেশের কথা কানে না তুলে এধা বলল, বেইমান আছে আমাদের মধ্যে। আমি চিনি তাকে। সনাক্ত করেছি।

এধার কথায় পরমেশের বুকের ধড়ফড়ানি বেড়ে গেল। তাকেই এধা দোষী সাব্যস্ত করছে নাকি ?

দম বন্ধ হয়ে আসছে পরমেশের। পুরোনো বাড়ির শীতলতা জড়িয়ে ধরছে তাকে। নিজেকে আর সামলাতে না পেরে সে প্রশ্ন করল, কাকে সন্দেহ করছো ?

এখনই নামটা বলবো না, জবাব দিল এধা, ঠিক সময়ে মুখোস খুলে দেবো। শেষ করে দেবো তার শয়তানির খেলা।

প্রলাপের মতো বকে চলেছে এধা। পরমেশের সন্দেহ হলো, মেয়েটা নেশা করেছে। এ্যালকোহলের হালকা গন্ধও পেল। গত চব্বিশ ঘণ্টা ধরে এধাকে বলার, প্রশ্ন করার যে তাগিদ পরমেশ বোধ করছিল, মরে গেছে। এধা স্বাভাবিক, সুস্থ নয়, বুঝে গেছে সে।

অনুনয়ের সুরে এধা হঠাৎ বলল, আমাকে একটু সাহায্য করবেন পরমেশদা ?

শিশুর মতো সরল, অসহায় তার গলা শুনে চমকে গেল পরমেশ। পরমুহূর্তে নিজেকে গাধা মনে হলো তার। সে বুঝতে পারলো, সন্দেহের তালিকায় তার নাম নেই। মিলিন্দর ধরা পড়ার সঙ্গে তাকে জড়ায়নি পার্টি। কাল্প্রিট্ অন্য কেউ।

করুণ চোখে পরমেশের দিকে তাকিয়ে আছে এধা। প্রত্যাশায় চকচক করছে তার দৃষ্টি। ভারহীন, সজীব বোধ করছে পরমেশ। নরম গলায় সে প্রশ্ন করল, কী সাহায্য ?

করবেন ?

সম্ভব হলে নিশ্চয় করবো।

পরমেশের গলা আন্তরিক। হারানো আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে সে। জানলার বাইরে কুয়াশা-জড়ানো অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছে এধা।

কিছু ভাবছে। এক সেকেণ্ড পরে পরমেশের দিকে তাকিয়ে বলল, আমার সঙ্গে একবার হাসপাতালে যেতে হবে আপনাকে।

অবশ্যই যাবো।

এধাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বুক, পেট, গলা, মাথা, জেনারেল্ মেডিসিন্ এবং অন্য নানা রোগের এক ডজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের নাম গড়গড় করে বলে পরমেশ জানালো, এরা সকলেই তার বন্ধু, চেলা। ডাকলেই চলে আসবে। তার আগে জানা দরকার, রোগটা কী ?

একটানা কথা বলছে পরমেশ। নির্বোধ ধ্বনিপ্রবাহের মতো শোনাচ্ছে তার কণ্ঠস্বর। পরমেশ বলল, তোমার লিভারটা খারাপ। সাত বছর বয়সে, যেবার তোমার জন্ডিস্ হলো, বিস্তর ভুগেছিলে তুমি। অতি বাজে রোগ। সেরেও সারে না। লিভার কামড়ে পড়ে থাকে। ডাক্তার দেখার আগেই আমি বলে দিচ্ছি, লিভারের ট্রাব্ল তোমার। হেপাটাইটিসের প্রাইমারি স্টেজ। তবে একথাও বলছি, সবে রোগের শুরু। এখনও বাড়েনি। ঠিকঠাক চিকিৎসা হলে সাতদিনে সেরে যাবে।

পরমেশের আশঙ্কা কেটে গিয়েছিল। সুযোগ পেয়ে কথার ফুলঝুরি ছোটাচ্ছে সে। কথা বলার আনন্দে ঝলমল করছে তার মুখ।

এধার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চুপ করে গেল পরমেশ। কঠিন, তীক্ষ্ণ এধার দৃষ্টি। ভূমিকা না করে এধা বলল, আপনি যা ভাবছেন, তা নয়, আমি প্রেগ্‌নান্ট,

অন্তঃসত্ত্বা।

কেঁপে উঠলো পরমেশ। ফ্যাকাসে মুখ। মনে হলো সাপের বিষ ছড়িয়ে পড়ছে তার শরীরে।

পরমেশের প্রতিক্রিয়া দেখেও এধা বলল, বাবা, মা জানে না। গোপনে মুক্ত হতে চাই আমি। আমার সঙ্গে আপনি কি হাসপাতালে যাবেন?

এক, দু সেকেন্ড চুপ থেকে এধা বলল, আমার স্বামী সেজে হাসপাতালে যেতে হবে আপনাকে। সঙ্গে স্বামী না থাকলে এ্যাবরশন করতে হয়তো রাজি হবে না হাসপাতালের ডাক্তার।

পরমেশ চুপ। আতঙ্ক, কষ্ট কমে যেতে সে ভাবছে, এধার এই ক্ষতি কে করলো? নানা নাম, মুখ মনে এলেও একজনের ওপর ঘনীভূত হচ্ছে সন্দেহ। কিছু বলল না সে। এধা বলছে, কয়েক ঘন্টার জন্যে স্বামী সাজবেন। আমার কাকার বন্ধু আপনি। কিন্তু এ ঘটনা শুধু আপনি, আমি ছাড়া জানবে না কেউ।

নিরুত্তেজ ভঙ্গিতে কথা বলে যাচ্ছে এধা। কথা থামিয়ে জানলার বাইরে সে তাকাতে তাকে দেখলো পরমেশ। দেখার সাহস পেল। নিষ্পাপ, সরল এধা হঠাৎ অচেনা হয়ে গেছে। চাপা গলায় পরমেশ বলল, ঠিক আছে। যাবো। কবে, কখন কোথায় যেতে হবে আমাকে?

এধা বললো, পরশু, সকাল আটটায়।

হাসপাতালের নামও জানিয়ে দিল এধা। স্তব্ধ ঘর। পরমেশের কথা বলার আনন্দ কেটে গেছে। ঘাড় গুঁজে বসে আছে সে। দেড়, দু মিনিট পরে চোখ তুলে সে দেখলো, খাটের ছত্রিতে ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে এধা। সাবলীল নিঃশ্বাসে ওঠা নামা করছে তার বুক, পেট। লালচে দু'ঠোঁট আধখোলা। চোখ আটকে গেল পরমেশের। তারপর সসংকোচে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো সে।

রাস্তায় এসে পরমেশের মনে হলো, দুপাশের বাড়িঘর, মানুষ, ঘটনা, সবকিছু অবিশ্বাস্য, অলীক। কিন্তু তার মাথার যন্ত্রণাটা বাস্তব। টনটন করছে দুটো রগ। রাস্তার ঘন কুয়াশার মধ্যে দাঁড়িয়ে বাস্তবতায় ফিরতে চাইছে সে। মাথার যন্ত্রণার সঙ্গে শ্বাস কষ্ট হচ্ছে। বাসস্টপের দিকে হাঁটতে হাঁটতে ঘটনাগুলো সাজাতে চেষ্টা করল পরমেশ। নাম না জানা গেলেও বিশ্বাসঘাতকতা করে পুলিশের হাতে মিলিন্দকে তুলে দিয়েছে কেউ। মিলিন্দ অ্যারেস্ট হবার পর এধা বেসামাল। অন্তঃসত্ত্বা এধা বমি করল। অথচ তাকে কে ফাঁসিয়েছে, নাম বলল না। গর্ভপাতের সুবিধের জন্যে পরমেশকে স্বামী সাজাতে চাইছে। কয়েকঘন্টার স্বামী। স্বামীর অভিনয় করবে পরমেশ। এধার গর্ভে কার সন্তান? মিলিন্দর সন্তান হলে তার বন্ধুদের সাহায্য কেন চাইছে না এধা? তাদের কি এধা বিশ্বাস করে না? তার চোখে মিলিন্দর বন্ধুদের চেয়ে পরমেশ কি বেশি আস্থাভাজন, বিশ্বাসী?

প্রশ্নগুলোর সঙ্গে এক গভীর, গোপন অনুভূতি, প্রত্যাশা জাগলো পরমেশের মনে। সে সব কথা মুখে বলা যায় না। পরমেশের মনে হলো, দশ বছর ধরে সাংবাদিকের অভিনয় করার চেয়ে কয়েকঘন্টার জন্যে এধার স্বামীর অভিনয় অনেক সহজ। গুরুত্ব

পূর্ণও হতে পারে এ অভিনয়। ঘণ্টাকয়েকের অভিনয় যদি আরও লম্বা হয়ে দিন, মাস, বছরে গড়ায়, তাহলে? দশবছরের ধ্বংসস্তূপ থেকে বেরিয়ে আসবে ফসিল পরমেশ। বিরাট, মহৎ কিছু সৃষ্টি করবে সে। ফনা তোলা সাপের মতো দুলতে থাকে তার প্রত্যাশা, স্বপ্ন।

খুব ভোরে পুষুর কান্না শুনে ছায়ার ঘুম ভেঙে গেল। মানুষের মতো করুণ সুরে কাঁদছে ছায়ার আদরের বেড়াল পুষু। বন্ধ জানলার কাচের বাইরে আবছা পৃথিবী। ঘুম ভাঙলেও লেপের উষ্ণতা ছেড়ে কুনালের উঠতে ইচ্ছে করছে না। ঘুমে জুড়ে আছে দু'চোখের পাতা। জেগে ওঠার চেষ্টা করেও ঘুমিয়ে পড়ছে। ছায়ার আর্ত গলা শুনে তার ঘুমের চটকা কেটে গেল। বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লো সে। ভাঁড়ারঘরে ঢুকতে চোখে পড়লো এক বীভৎস দৃশ্য। আঁতকে উঠলো সে। দিন দুই আগে ঘরের কোনে তিনটে বাচ্চা প্রসব করেছিল পুষু। সাদা, কালো উলের বলের মতো তুলতুলে তিন বেড়ালছানা। ঘরের কোণে এখন পড়ে আছে তিন বেড়াল শাবকের মাথা। দেখে মনে হচ্ছে আঁশবটিতে মুড়িয়ে কেটে নেওয়া হয়েছে তিনটে ধড়। তিন শাবকের মুণ্ডুর চারপাশে ঘুরে ঘুরে কাঁদছে পুষু। দুহাতের পাতায় মুখ ঢেকে ওয়াক তুলে দৌড়ে কলঘরে গেল ছায়া। কুনালের শরীরের স্নায়ু, শিরা কাঁপছে। পাশের বাড়ির কার্নিসে চোখ বুজে বসে নিরীহ ভঙ্গিতে থাবা চাটছে একটা কালো হুলো বেড়াল। মাঝে মাঝে হুলোটা আড়চোখে দেখছে পুষুকে। চেনা হুলো। প্রায়ই ছায়ার রান্নাঘরে হানা দেয়। কুনালের সঙ্গে চোখাচোখি হতে কার্নিস ধরে গম্ভীর মুখে হুলোটা চলে গেল।

কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত পুষু একসময়ে ছায়ার পা ঘেঁসে শুয়ে পড়লো। কুনালের ভাগ্য ভালো, কলঘর ধুতে তখনই এলো লক্ষ্মণ জমাদার। মাথা তিনটে নিয়ে গেল সে। বিরক্তি, ঘৃনায় রিরি করছে কুনালের শরীর। ছায়া বলল, হুলোটাকে বিষ খাইয়ে মারবো আমি।

শাবকভোজীকে চিনতে ভুল হয় নি তার। রোদ উঠেছে আকাশে। শুরু হয়েছে নতুন দিন। খালের পাশ থেকে ভেসে আসছে শিশুর গলা। এক কদর্য দৃশ্য দেখে এমন চমৎকার দিনটা শুরু করার জন্য মুষড়ে পড়লো কুনাল। সারাদিনের কথা ভেবে আতঙ্ক হলো তার। চা খেয়ে শুরু হলো অফিসে যাবার তোড়জোড়। রোদে পিঠ দিয়ে দাড়ি কামাতে বসেছে সে। আয়নায় ভেসে আছে সাবান মাখা মুখ। হাতে জার্মান সিলভারের ঝকঝকে ক্ষুর। একপাশের গাল কামাবার পরেই সে শুনলো কলিংবেলের ঘণ্টা। ক্ষুর হাতে দরজার দিকে তাকালো সে। বন্ধ দরজা ছায়া খুলতে এক তরুণ প্রশ্ন করল, কুনালবাবু আছেন?

ছায়া কথা বলার আগেই এক গালে সাবান, ক্ষুর হাতে দরজার কাছে গিয়ে

দাঁড়ালো কুনাল। সে পরিচয় দিতে অচেনা ছেলেটি বলল, গত রাতে অ্যারেস্ট্‌ হয়েছে মিলিন্দ।

খবর দিয়ে এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে তরুণটি চলে গেল। মিলিন্দ কোথায়, কেমন আছে, প্রশ্ন করতে ভুলে গেল কুনাল। স্থির, অপলক চোখে সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে আছে সে। ঘাড় নিচু করে অচেনা ছেলেটি একতলায় নেমে যাচ্ছে। দাড়ি কামাবার আয়নার সামনে এসে আবার বসলো কুনাল। মুখে শুকিয়ে গেছে সাবান। আয়নার কাচে একফালি রোদ তিরতির করে কাঁপছে। কাচের অনেক ভেতরে ঢুকে রোদ হয়েছে আগুন। মুখে আবার সাবান লাগাতে গিয়ে কুনাল টের পেল হাত কাঁপছে। হাতের এ কাঁপুনি কিছুদিন ধরেই লক্ষ্য করেছে সে। অফিসের ফাইলে গোলমাল হয় সই। মার্কেটিং ম্যানেজার কৌশিক রায় একদিন বলেছিল, ডাক্তার দেখাও মিলিন্দ। অবহেলা করো না।

ব্যাঙ্কের চেক্‌ নিয়ে সম্প্রতি গোলমাল হয়েছে কয়েকবার। সই না মেলায় চেক্‌ ফিরে এসেছে। লজ্জার একশেষ হয়েছে কুনাল! নিজের এ্যাকাউণ্ট থেকে চেকে টাকা তুলতে এখন সে স্বয়ং যায়। অচেনা ভয়ে অনবরত কাঁপে। ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করলে ভয় আরও বাড়ে।

মাস তিন আগে তাকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা কার এক বন্ধু ডাক্তার বলেছিল, কিছু হয়নি। স্ট্রেন্‌ অ্যাণ্ড স্ট্রেস্‌ অব মাইণ্ড। চাপ পড়ছে মনে। ছুটি নিয়ে বিশ্রাম করো কিছুদিন।

ডাক্তারের পরামর্শ মনে ধরলেও ছুটি নেবার সুযোগ পায়নি কুনাল। কাঁপুনিও কমেনি। ছুটি নিয়ে বাড়ি বসে থাকলে কাঁপুনি আরও বাড়বে। গালে ভিজে সাবান ঘসে ক্ষুর হাতে আয়নার দিকে তাকালো সে। আয়নার ভেতরের আগুন এসে লেগেছে ক্ষুরে। দীপ্তি বেড়ে লোভনীয় হয়েছে ধারালো ক্ষুর। আয়নায় নিজের মুখ, রোদ, আগুন, ক্ষুরের ঝিলিকে ধাঁধা লেগে গেল কুনালের। দ্বিতীয়বার লাগানো সাবান গালে শুকিয়ে ওঠার আগেই ক্ষুর ছোঁয়ালো সে। জুলপির তলা ধরে গাল বেয়ে ধীর গতিতে গলায় নামালো ক্ষুর। তারপর ধারালো ক্ষুরের প্রান্ত নড়লো না। গলায় বসে যেতে থাকলো। পেছন থেকে ক্ষুরটা ছিনিয়ে নিল ছায়া। রক্তে ভেসে যাচ্ছে কুনালের গলা, বুক। ছায়া বলল, সাহস নেই তোমার, লোক হাসিও না।

ক্ষত বেয়ে দু তিন ফোঁটা রক্ত পড়েছে আয়নার ওপর। কাচের ভেতর কুনালের ঝাপসা, লালচে মুখ। বেসিনের ওপর ডেটল্‌, তুলো রেখে ছায়া বলল, ধুয়ে নাও।

গভীর ক্ষত। ডেটল্‌ মাখানো তুলো, লুকোপ্লাস্ট সেঁটে রক্ত ঠেকালো কুনাল। মুখের ডান পাশে, চিবুকে আধ কামানো দাড়ি, গলায় লুকোপ্লাস্টের তাপ্পি, নিজেকে নাটকের কিম্ভূত এক চরিত্র মনে হলো তার। এক বিয়োগান্ত দাম্পত্যনাটক ক্রমশ অতিনাটকীয় হয়ে উঠছে। কুনাল ঠিক করল, এই চেহারায় আজ অফিস যাবে না। সকালের ঘটনাগুলোয় মাথা অসাড়, বুকে তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা। দিকচিহ্নহীন শূন্যতায় ভাসছে সে। অসতর্ক আঘাত প্রথমে যেমন বোঝা যায় না, সময়ের সঙ্গে বেড়ে ওঠে বিষ ব্যথা, প্রায় সেরকম। শিশুর মতো কুণালের কাঁদতে ইচ্ছে হয়। পারে না। আর

কখনও প্রাণ খুলে কাঁদা যাবে না, সে জানে। কুনাল টের পেল গলার ক্ষতের রক্ত বন্ধ হলেও বুকের ভেতরে টুপটুপ করে রক্ত ঝরছে। মিলিন্দর জন্যে উতলা হলো সে। এ দুঃসময়ে ছেলেটাকে কে দেখবে? তার বাবা, মা আছে, দল আছে, অথচ কেউ নেই। এধার মুখ মনে পড়লো কুনালের। এধা সন্তান-সম্ভবা। তার পেটে মিলিন্দর সন্তান। মেয়েটা কী করবে?

কুনাল ভাবলো, কিছু করার আছে তার। প্রেমের সম্মান রাখতে করা দরকার। ভালোবাসায় অবিশ্বাসী মিলিন্দকে বিশ্বাসী করতে এধার পাশে গিয়ে দাঁড়াবে সে। ভ্রাতৃবধূর সম্মান দিয়ে এখানে আনবে এধাকে। বেঁচে থাকার একটা তাৎপর্য, এ মুহূর্তে কুনাল পেয়ে গেল।

বিছানায় আধশোয়া ছায়া সকালের খবরের কাগজ পড়ছে। ঘর ছেড়ে চলে গেছে পুষু। বেড়ালটার কান্নাও শোনা যাচ্ছে না। ঘরে ঢুকলো কুনাল। ছায়ার হাঁটুর ওপর রোদ পড়েছে। কুনাল এসেছে, টের পেয়েও মুখের সামনে খবরের কাগজ ধরে আছে ছায়া। কথা বলার অনিচ্ছায় কাগজের আড়াল তুলেছে। কুনাল বলল, মিলিন্দর এই দুর্দিনে তাকে আমাদের সাহায্য করা উচিত।

কথা বলল না ছায়া। মিলিন্দর নাম উচ্চারণ করে কান্না পেল কুনালের। ঠোঁট টিপে এক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থেকে সে বলল, মিলিন্দর প্রেমিকা এধা। এখনও বিয়ে করেনি দু'জন। কিন্তু এধা প্রেগনান্ট্।

ছায়ার মুখের সামনে থেকে খবরের কাগজ সরে গেছে। উদ্বেগের চিহ্ন নেই তার মুখে। অন্তঃসত্ত্বা এধার জন্যে কোনো আগ্রহ দেখালো না সে।

কী করা যায়?

কুনালের প্রশ্নে ছায়া চুপ। তার নির্বিকার ভাব দেখে গা জ্বলছে কুনালের। নিজেকে শান্ত রেখে সে বলল, একটা কিছু করতে হবে।

কী করার আছে?

ছায়ার নীরস গলার প্রশ্ন শুনে কুনাল বলল, কিছু একটা। তাদের ভালো-বাসার সম্মানে।

কুনাল কথা শেষ করার আগে ছায়া বলল, ভালোবাসায় বিশ্বাস করি না আমি।

ছায়ার কথায় পাথরের দেওয়ালে যেন ধাক্কা খেল কুনাল। এ বাড়িতে এধাকে আনার চিন্তা ক্রমশ ধূসর হচ্ছে। কিছু বলতে গিয়ে চুপ করে থাকলো সে। ছায়া বলল, যে সব মেয়ে, পুরুষ সন্তানের জন্ম দিতে পারে না, অক্ষম, তাদের সংসার, দাম্পত্যজীবন বজায় রাখার অজুহাত হলো ভালোবাসা। বিশেষ করে অক্ষম পুরুষরা ভালোবাসার দোহাই পেড়ে বৌদের আটকে রাখে। ভোগদখল করে।

জ্বালা করছে কুনালের গলার টাটকা ক্ষত। এখনই হয়তো রক্ত উপচে পড়বে।

তার মনে পড়লো, এক বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের অভিমত। বছর দুই আগে সেই বিশেষজ্ঞ বলেছিল, কুনালবাবু, আপনি অক্ষম। সৃষ্টির বীজ নেই আপনার শরীরে। তবে সবই একটা চক্র, শরীরচক্র। ভবিষ্যতে অবস্থাটা বদলাতেও পারে।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ছায়া। কুনালের মনে হলো, শরীরের অক্ষমতার জন্যেই কি ভালোবাসা নিয়ে তার এই মাতামাতি? ঘর ছেড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো কুনাল। বারান্দার ডানদিকে কলঘর। কলঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করেছে ছায়া। পাশের বাড়ির কার্নিসে চোখ পড়তে থ হয়ে গেল কুনাল। সন্তানখাদক সেই হুলোর সঙ্গে মিলনে মেতেছে ছায়ার সোহাগের পুষু।

কলঘরে ঢুকে শাড়ি, শায়া বদলালো ছায়া। একটু আগে বিছানায় বসে হঠাৎ মনে হয়েছিল, পোষাক নষ্ট হচ্ছে। অনুমান মিথ্যে নয়। কলঘর থেকে বেরোবার মুহূর্তে পাশের বাড়ির কার্নিসে পুষু, হুলোর মত্ততা দেখে গা ঘিনঘিন করে উঠলো তার। রান্নাঘরে ঢুকে বিষ মেশানো একবাটি দুধ নর্দমায় ঢেলে দিল সে।

একটা দুটো করে তারা জেগে উঠছে আকাশে। মিটমিটে আলো। বাসস্টপে দাঁড়িয়ে আছে দু'তিনজন। রাস্তায় যাতায়াত করছে হাতে গোণা মানুষ। বাসে উঠে বসার জায়গা পেল পরমেশ। শান্ত মাথায় সে ভাবতে চাইছে এধার প্রস্তাব। কেন এই সিদ্ধান্ত এধা নিল? সব রাস্তা কি বন্ধ হয়ে গেছে? কোন সম্ভাবনা খোলা নেই?

প্রশ্ন জাগতে মৃদু উত্তেজনা বোধ করল সে। সামান্য দুশ্চিন্তা জাগলো। এধার সঙ্গে হাসপাতালে গিয়ে চেনা কারও সঙ্গে যদি দেখা হয়ে যায়? ডাক্তারদের মধ্যে পরিচিত কেউ বেরিয়ে পড়ে? আতঙ্ক হলো পরমেশের। এসব ঝামেলার চেয়ে সাদাসিধে রাস্তায় হাঁটাই তো ভালো! রাস্তাটা পরমেশ জানে। বলতেও পারে। কিন্তু এধা কি রাজি হবে? বিপদ এড়াতে যে উপায় এধা ভেবেছে, তার থেকে আরও বড়ো বিপদ হতে পারে। মামুলি, তুচ্ছ অপারেশন থেকেও জীবনহানি ঘটে। দুর্ঘটনার কথা আগাম বলা অসম্ভব। সেরকম হলে পরমেশ দাঁড়াবে কোথায়?

এধার জন্যে সহানুভূতির সঙ্গে চোরা আশঙ্কা কাজ করছে পরমেশের মনে। আশঙ্কা ঘন হচ্ছে।

ভিড় বাড়ছে বাসে। এধাকে বাঁচাতে পরিচ্ছন্ন বিবেকে এক নতুন সম্ভাবনার কথা ভাবছে পরমেশ। অপচয় হয়ে গেছে জীবনের দামী দশটা বছর। তবু সব শেষ হয়নি। হাসপাতালে যাবার আগে এধার মুখোমুখি বসতে হবে একবার। বাস থেকে পরমেশ নামতে অল্প দূরে পরপর দুটো বোমা ফাটলো। চারপাশে অন্ধকার। ঝুপ-ঝাপ বন্ধ হচ্ছে দোকান। একটা চা দোকানে ঢুকে পড়লো পরমেশ। খালি দোকান। মুখ চেনা পরমেশকে দেখে ভরসা পেল দোকানী। বাস রাস্তা থেকে দু'মাইল ভেতরে

পরমেশের বাড়ি। বেশিরভাগ দিন রাস্তায় আলো জ্বলে না। বোমাচালাচালি, খণ্ডযুদ্ধ লেগেই আছে। বাড়িতে মুখ কালো করে প্রতীক্ষায় থাকে হেমনলিনী। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার চেষ্টা করেও পরমেশ পারে না। দেরী হয়ে যায়। ছেলের জন্যে আশঙ্কায় কাঁপলেও অভিযোগ নেই হেমনলিনীর। কিছুদিন ধরে হেমনলিনীর মনে হচ্ছে, শত্রু বাড়ছে পরমেশের। তার বন্ধুর চেয়ে শত্রুর সংখ্যা বেশি। মায়ের মুখ মনে পড়তে চায়ের দাম মিটিয়ে দোকান থেকে বেরোলো পরমেশ। নির্জন, নিস্তব্ধ রাস্তা। পায়ে হেঁটেই রোজ বাড়ি ফেরে পরমেশ। বাস রাস্তা ছেড়ে ডানদিকে ঘুরে সাইকেল-রিকশার আড্ডা। আজ রিকশা ধরা ঠিক করল পরমেশ। একটা রিকশা নেই আড্ডায়। গেল কোথায় সব ? দুটো বোমার শব্দে দরজা এঁটে গোটা পাড়া ঘুমিয়ে পড়েছে দেখে হাসি পেল পরমেশের। হাঁটতে শুরু করল সে। শীতের রাত। সবে নটা বেজেছে। রাস্তায় একটা মানুষ নেই। সন্ধ্যা হতেই হয়তো বোমাবাজি শুরু হয়েছিল। পরমেশের পেছনে ঘেউঘেউ করছে একটা কুকুর। ফাঁকা রাস্তায় হনহন করে হাঁটছে সে। অন্ধকার ফুঁড়ে হঠাৎ তার সামনে এসে দাঁড়ালো তিনজন। মানুষ নয়, যেন তিন ছায়ার শরীর। তাদের কাউকে চেনে না পরমেশ। আরও তিনজন দুপাশ থেকে এসে গেল। পরমেশকে ঘিরে তৈরি হয়েছে শক্ত ব্যূহ। দ্বিতীয় দলের তিনজনের মধ্যে একজনকে চিনতে পারলো পরমেশ। স্পষ্ট দেখলো। একটা, দুটো কথা বলতে চাইলো সে। সুযোগ পেল না। সুতোর মতো দু'ঝলক আলো দেখলো। জ্বলন্ত দুটো তীর এসে লাগলো তার শরীরে। পরমেশ অনুভব করল দু'টুকরো ইটের আঘাত। আঘাত খুব জোরালো না হলেও চোখের সামনে অন্ধকারের পর্দা নেমে এলো। ঢেউ-এর মতো দুলে উঠলো পায়ের তলার মাটি। পড়ে যাবার আগে কিছু বলতে চাইলো সে।

সমুদ্রের অনেকটা সাঁতরে, নোনাজলে হাবুডুবু খেয়ে তীরে পৌঁছেও ডুবো-জাহাজের যাত্রী যেমন বিবশ, বেপথু থাকে, পরমেশেরও সেই দশা। তার চোখের সামনে বয়ে চলেছে ধোঁয়াটে কুয়াশার স্রোত। কী হয়েছে, বুঝতে পারছে না। ধীরে ধীরে শরীরে যন্ত্রণা বাড়ছে। মনে হচ্ছে, গুঁড়িয়ে গেছে সব হাড়। তীব্র যন্ত্রণায় সজাগ হলো স্মৃতি। অন্ধকার, সরু রাস্তা। ছ'জন ছায়া শরীর, ব্যূহ, আগুনের তীরের সঙ্গে তার ধারণা হলো, সে হাসপাতালে। তার কানের পাশে মেয়েলি চাপা কণ্ঠস্বর বলল, জ্ঞান ফিরেছে।

পরমেশের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লো দুটো অচেনা মুখ। দু'জন পুরুষ। তাদের একজন প্রশ্ন করল, কেমন আছেন ?

কিছু বলতে গেল পরমেশ। গলা দিয়ে স্বর বেরলো না। বিছানার ওপর জ্বলছে কটকটে আলো। উর্দিপরা নার্স বলল, খবর গেছে আপনার বাড়িতে। পুলিশই খবর দিয়েছে।

অচেনা দু'জনের একজন প্রশ্ন করল, কাউকে চিনতে পেরেছেন ?

পরমেশের চোখের সামনে পাউডারের মতো তুষারপাত হচ্ছে। চোখ বুজলো সে। গম্ভীর গলা একজন বলল, ওরা আপনার পাড়ার ছেলে। একজন ছাড়া। নামগুলো

কি ?

মড়্মড়্ করছে পরমেশের শরীরের গুঁড়ো হাড়। গম্ভীর গলা বলল, এসবই হচ্ছে মিলিন্দ বোসকে অ্যারেস্টের জের। অথচ তাকে আমরা এখনও ধরতে পারিনি।

হুঁশ, বেহুঁশের মধ্যেও কথাটা শুনে চমকে গেল পরমেশ। মিলিন্দকে ধরেও খবরটা পুলিশ চেপে যেতে চাইছে কেন ? অশুভ এক সম্ভাবনায় শিউরে উঠলো সে। একজন বলল, খুনেদের দুজনকে ধরেছি।

আর একজন বলল, বাকি চারজনকেও ধরবো। প্রথমজন আবার পরমেশকে বলল, আপনি একটু সাহায্য করলেই।

নির্জন ওয়ার্ডে ডুকরে কেঁদে উঠলো এক রুগী।

পরমেশের কানের কাছে ঝুঁকে একজন বলল, দু-একটা নাম, চেষ্টা করুন, একটু ভাবুন।

বিড়বিড় করে পরমেশ বলল, দু'জনকে তো ধরেছেন। তারাই বলবে।

তার কথা শুনে প্রশ্নকারী খ্যাকখ্যাক করে হাসলো। পাশের জন বলল, তারা আর কথা বলবে না।

পরমেশের মনে হলো সাঁতরে সমুদ্র পেরিয়ে তীরে উঠে চোরাবালিতে ডুবে যাচ্ছে সে। হাত পা ছুঁড়ে বাঁচতে গিয়ে বালি গিলছে।

নার্স বলল, পেশেন্টের ঘুম দরকার। ঘুমের ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছে।

সিমেণ্টের মেঝেতে দু'জোড়া জুতোর শব্দ মিলিয়ে যেতে শুনলো পরমেশ।

ছেঁড়া ছেঁড়া ঘুমের মধ্যে সারারাত দুঃস্বপ্ন দেখলো চন্দন। রাত ফুরোবার আগেই দারুণ তেষ্টায় ঘুম ভেঙে গিয়েছিল তার। টেবিল থেকে জলের গ্লাস নিয়ে এক চুমুকে শেষ করেছিল। জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে শরীর। স্নায়ু, শিরার দপদপানি স্পষ্ট টের পাচ্ছে। প্রভাবতী চাপাচাপি করলেও রাতে কিছু খায়নি চন্দন। ডাক্তার ডাকার উদ্যোগ নিয়েছিল প্রভাবতী। চন্দন ঠেকিয়েছে। মাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিল, ইনফ্লুয়েঞ্জা। কাল সকালেই জ্বর ছেড়ে যাবে।

অন্ধকার ঘরে চোখ বুজে শুয়ে আছে চন্দন। চিন্তাগুলো দানা বাঁধছে না, নিটোল চেহারা নিচ্ছে না। টুকরো, টুকরো, অরাজক ছড়িয়ে পড়ছে। মিলিন্দ, এধা, সবিতের জন্যে তার ভাবনা টুকরো, খণ্ড, আধখানা। দল, সংগঠন, নেতা, পার্টি-

কর্মসূচীর মূল্যায়ণ, এলোমেলো জনতার মতো ছত্রভঙ্গ হয়ে যাচ্ছে। চন্দনের মনে হলো, পৃথিবীর সঙ্গে ছিন্ন হয়েছে তার নাড়ির যোগ। মায়ের সঙ্গে নাড়ির বাঁধন কাটলে শিশু মুক্তি পায়, স্বাধীন হয়। পৃথিবীর সঙ্গে সেরকম ঘটার নাম মৃত্যু। পৃথিবী থেকে তখন মুছে যায় মানুষ। পার্টি ছিল তার পৃথিবী। পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক চুকে যেতে তার মৃত্যু ঘটেছে। মৃত্যুর কথা ভাবতেই তার মাথায় বইতে লাগলো মরুভূমির ঝড়। আতঙ্কে সে চেঁচিয়ে উঠলো, আমি মরবো না, মরতে চাই না।

চায়ের কাপ হাতে ঘরে ঢুকে ছেলের দিকে তাকালো প্রভাবতী। জ্বর কমেনি, প্রলাপ বকছে। ডাক্তার ডাকতেই হবে। বিছানার পাশে টেবিলে চা রেখে ঘর থেকে চুপচাপ বেরিয়ে গেল প্রভাবতী। গরম চা। ধোঁয়া বেরোচ্ছে। ধোঁয়ার দিকে ফাঁকা চোখে চেয়ে আছে চন্দন। বিছানা ছেড়ে উঠে চায়ের কাপ নিতে আগ্রহ বোধ করল না সে। চায়ের ঘন ঘোঁয়া কমে এলো। ঠাণ্ডা হলো চা। সর পড়লো কাপে। মৃত্যুর কথা ভুলে যাবার জন্যে পার্টির বাইরে কার কার সঙ্গে মেলামেশা করবে, ভাবতে থাকলো সে। জানলার বন্ধ কাচ ভেদ করে রোদ এসেছে ঘরে। কাচের বাধায় জুড়িয়ে যাওয়া রোদ। রাস্তায় শুরু হয় মানুষ চলাচল। ভেসে আসে তাদের কাথার শব্দ। চন্দন কিছুই শোনে না। সকালের খবরের কাগজ হাতে ঘরে ঢুকলো বাতাসি। এ বাড়িতে কাজ করে বাতাসি। ঠিকে কাজ। সকালে একবার, দু'তিন ঘণ্টা কাজ করে যায়। বিকেলে আসে না। বাতাসি কাগজ আনতে অবাক হলো চন্দন। সকালের কাগজ আগে পড়ে প্রভাবতী। পঁয়তাল্লিশ মিনিট, একঘণ্টা তার দখলে থাকে খবরের কাগজ। তারপর পায় চন্দন।

বাতাসির হাত থেকে কাগজ নিয়ে চন্দন প্রশ্ন করল, মা কোথায় ?

ঠাকুরঘরে।

জবাব দিয়ে ঘরের জানলা খুলতে শুরু করল বাতাসি। এক টুকরো কাপড় নিয়ে জানালার শার্সি, খড়খড়ি মুছেছে সে। প্রভাবতী ঠাকুরঘরে শুনে, অবাক হয়েছে চন্দন। মায়ের এখন ঠাকুরঘরে ঢোকার সময় নয়। অসময়ে কেন মা ঢুকেছে সেখানে ? জ্বরের ধমকে আবোলতাবোল ভাবছে চন্দন। কী এমন মানসিক চাপে আছে মা ? জানলা খুলতে আলোয় ভাসছে ঘর। খবরের কাগজ তুলে নেড়েচেড়ে বুকের ওপর রাখলো চন্দন। দু'চোখে ঝাপসা দেখছে। খবরের কাগজ পড়ার আগ্রহ পাচ্ছে না। রুচিও নেই। কাগজ বোঝাই দুঃসংবাদ, পোকামাকড়ের মতো মানুষের মৃত্যুর খবর। ফলে, খবরের কাগজ এড়িয়ে চলে সে। তাগিদ না থাকলে পড়ে না। তবু সকালের টাটকা সংবাদপত্রের ভাঁজে ভাঁজে এমন মাদক গন্ধ থাকে, যা লোভাতুর করে। বাধ্য করে পাতায় চোখ বোলাতে। চোখের সামনে প্রথম পাতাটা মেলে ধরে একচমক দেখেই চন্দন বুঝলো, আজ প্রথম পাতা পড়েই তাকে কাগজ পাঠিয়ে দিয়েছে মা। আতঙ্কে ধড়পড় করছে চন্দনের বুক। খবরটার ওপর দ্রুত চোখ বোলালেও প্রতিটি শব্দ গিলছে সে। বিচালিঘাটে গঙ্গার ধারে দু'জন অজ্ঞাত পরিচয় তরুণের বুলেটবিদ্ধ

মৃতদেহ পাওয়া গেছে। সম্ভবত রাত এগারোটায় খুন হয়েছে তারা।

কাল সন্ধেতে বিচালিঘাটের নাম সবিতের কাছে বলেছিল চন্দন। সকালে কাগজে সেই নাম দেখে শরীর কাঁপছে তার। জোড়ালাশ পাওয়া গেছে সেখানে। তাকে সেখানে নিয়ে যেতে সবিত রাজি হলে লাশের সংখ্যা হতো তিন। চন্দনের হাত থেকে কাগজ খসে পড়লো। সবিতের সঙ্গে মিলিন্দ, এধা হাজির হলো তার স্মৃতিতে। কাল তাকে খুন করতে এসেছিল সবিত। এধার চোখে সে বেইমান। মিলিন্দ নিশ্চয় এরকম কিছু ভাববে না। তার বিশ্বাস, অবিশ্বাস, দুটোই যুক্তি নির্ভর। চন্দনের মনে হলো, মিলিন্দ ছাড়া পেলে অনেক সংকট মিটে যায়। কবে ছাড়া পাবে সে? আদৌ কি পাবে?

সদরদরজার লোহার কড়া সজোরে বেজে উঠতে ছিঁড়ে-খুঁড়ে গেল চন্দনের চিন্তা। তবু বিছানায় কাঠ হয়ে পড়ে থাকলো সে। তার ঘরের জানলার ঠিক তলায়, কারা কড়া নাড়ছে, দেখার আগ্রহ জাগলো না। দ্বিতীয়বার শোনা গেল লোহার কড়ার ঝনৎকার। কাজ শেষ করে বাতাসি নিশ্চয় চলে গেছে। হ্যাঁ, ঠিক তাই। চন্দন টের পেল ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে একতলায় নামছে প্রভাবতী। দরজা খোলার শব্দ পেল সে। কান খাড়া হয়ে উঠেছে তার। প্রভাবতীর সঙ্গে চাপা গলায় কথা বলছে কেউ। পাড়া এখনও নির্জন, নিস্তব্ধ। প্রতিটা কথা শুনতে পাচ্ছে চন্দন। মাসিমা, কাল রাতে ওরা খুন করেছে সবিতকে। শেলটার থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে গুলি করেছে।

চন্দনের ঘরে যেন বাজ পড়লো। তালা লেগেছে কানে। সে বধির। কিছু শুনতে পাচ্ছে না। সেই বধিরতার মধ্যে চন্দন শুনলো, প্রভাবতী বলছে, জানি। বিচালি-ঘাটে, গঙ্গার ধারে।

হ্যাঁ, আজ কাগজে বেরিয়েছে। কিন্তু কারও নাম ছাপেনি।

নাম না ছাপলেও বুঝেছি আমি।

চন্দনের কানে প্রভাবতীর কথা স্বগতোক্তির মতো শোনালো। কিছুক্ষণ চুপচাপ। দরজা বন্ধের শব্দ শুনলো চন্দন। সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে প্রভাবতী। ঠাকুরঘরে ঢুকবে। দু'তিনদিন হয়তো বেরোবে না সেখানে থেকে। আগেও হয়েছে এরকম। নিচু গলায় রাস্তায় কারা যেন কথা বলছে। চন্দনের মনে হলো, সবিতের খবর যারা এনেছে, তারা যায় নি। নজর রাখছে তার ওপর। সবিতের মুখ মনে পড়তে তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো কান্না। সে বিড়বিড় করল, ফিরে আয় সবিত।

বিছানা ছেড়ে উঠে ঘরের জানলা বন্ধ করল চন্দন। জানালার বাইরে ভয়ে তাকালো না। দালানের দিকের জানালা বন্ধ করতে গিয়ে প্রভাবতীর নরুনপাড় থানের আঁচল দেখে থমকে গেল চন্দন। ঠাকুরঘরে না ঢুকে তার ঘরের জানলার বাইরে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল মা। কেন? কী দেখছিল? ভয়ানক এক অবিশ্বাস,

ষড়যন্ত্রের থাবা দেখতে পেল সে। পাশের ঘরে ফোন বাজছে। একঘেয়ে, একটানা ধাতব আওয়াজ। ফোন ধরতে ভয় পাচ্ছে সে। রিসিভার থেকে যদি গুলি বেরিয়ে আসে। আসতেই পারে। সময় খুব খারাপ। ফোনটা বিকল করে দিলে কেমন হয় ?

সবিতের মৃতদেহ এখন কোথায় ? ময়নাতদন্তে গেছে নিশ্চয়। পচা, গলা কিছু লাশের সঙ্গে অন্ধকার মর্গে পড়ে আছে সবিত। কেমন হয়েছে মৃত সবিতের মুখের অভিব্যক্তি ? মরার আগে কি ভাবছিল সে ? তার কি কিছু বলার ছিল ? সবিতের মৃত মুখ একবার দেখলে তার না বলা কথা, ভাবনা বুঝতে পারতো চন্দন। সবিতকে একবার দেখার জন্য মুচড়ে উঠছিল তার বুক।

ঘরের ভেজনো দরজা ফাঁক করে বীভৎস এক মুখ উঁকি দিতে ভয়ে কঁকিয়ে উঠলো চন্দন। মুখের মালিক থতমত খেয়ে বলল, আমি শ্রীনাথ গোয়ালা বাবুজি !

দশাসই শরীর, ভাটার মতো চোখ, চওড়া পাকানো গোঁফ, শ্রীনাথ ঘরে ঢুকে বলল, মাইজি আজ দুধের দাম দিবে বলেছিলেন। পুজো করছেন তিনি। তাই আপনার কাছে এলাম।

কাল এসো।

চন্দনের কথায় নিঃশব্দে চলে গেল শ্রীনাথ। চন্দন দেখলো শ্রীনাথের চওড়া কব্জিতে স্টিলের চকচকে বালা। চন্দনের মনে হলো অবিশ্বাস, প্রতিহিংসা ঘিরে ফেলেছে তাকে। ঘরে, বাইরে সে বন্দী। রেহাই নেই তার। গত আটচল্লিশ ঘণ্টায় বদলে গেছে পরিস্থিতি। পৃথিবীর সঙ্গে ছিন্ন হয়েছে তার নাড়ির সম্পর্ক। চন্দনের কানে ভাসছে মিলিন্দর কণ্ঠস্বর, এধার মধুর হাসি, রসিকতা, সবিতের স্নেহাতুর সংলাপ। নিরীহ শ্রীনাথ গোয়ালার সেবা, সাহচর্যই বা সে ভুলবে কী করে ! এখন সবটা অতীত। মৃত অতীত। স্থান কালের বোধ একাকার হয়ে শুধু অতীত জেগে আছে। চন্দন টের পেল, মরতে চলেছে সে।

সন্তর্পনে দরজা খুলে ঘরে ঢুকলো প্রভাবতী। দুপুরের আলো বিঁধলো চন্দনের চোখে। প্রভাবতীর হাতে কাঁচের গ্লাসে দুধ। টেবিলে দুধ রাখতে গিয়ে প্রভাবতী দেখলো সকালে দেওয়া কাপভর্তি চা পড়ে আছে। মাকে দেখলো চন্দন। প্রভাবতী তাকালো চন্দনের দিকে। দ'জোড়া চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে থাকলো পরস্পরের ওপর। চন্দনের শরীরে বয়ে গেল হিমেল স্রোত। মায়ের চোখের দৃষ্টি স্বাভাবিক নয়।

প্রভাবতী চলে যেতে বিছানায় উঠে বসলো চন্দন। গরম দুধের গ্লাসের মুখে ভাসছে ফ্যাকাসে বাষ্প। মুখের কাছে গ্লাস তুলতে ঝাঁঝালো গন্ধ শিউরে উঠলো সে। দুধে এ গন্ধ আগে কখনও পায়নি। দুধে আজ কী মিশিয়েছে মা ? ভয়ে থরথর করে কাঁপছে চন্দনের হাত। দরজার দিকে একপলক তাকিয়ে ঘরের কোণে নর্দমায় দুধের গ্লাস উপুড় করে দিল সে। ষড়যন্ত্র ধরে ফেলার তৃপ্তি তার মুখে। তবু

রাশ আলগা করা চলবে না। যুদ্ধ শুরু হয়েছে। ঘরে, বাইরে লড়াই।

স্তব্ধ দুপুর। একটু পরেই খাবার নিয়ে ঘরে আসবে প্রভাবতী। উন্মাদিনী মা খাবারে কী মেশাবে ভেবে ভয়ে কুঁকড়ে আছে চন্দন। নাহ্, এখান থেকে পালানো দরকার, চন্দন ভাবলো, চটপট, এখনই। পাজামার ওপর পাঞ্জাবি গলিয়ে বিছানায় বসলো সে। একটা চাদর গায়ে জড়ালো। এক, দু'সেকেন্ড চুপচাপ বসে আলতো হাতে দরজার একটা পাল্লা খুলে দালানে এলো। ঠাকুর ঘরের সিঁড়িতে বসে আছে প্রভাবতী। নজর চন্দনের ঘরের দরজার ওপর। প্রভাবতীকে চন্দন বলল, একটা নেমন্তন্ন আছে আমার। গেলাম।

প্রভাবতী কিছু বলার আগেই সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে একতলায় নেমে গেল সে। সিঁড়ির শেষ ধাপে পা দিয়ে মাথা ঘুরে গেল। দু'চোখ থেকে মুছে যাচ্ছে আলো। দেওয়াল ধরে টলমল করছে সে। কোনমতে সামলে নিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালো। অনেকদিন পরে মিছে কথা বললো মাকে। বাড়ির বিষাক্ত খাবার খাওয়া থেকে রেহাই পেতে মিথ্যে বলা ছাড়া উপায় ছিল না। রাস্তায় লোকজন কম। তবু চারপাশ সতর্ক চোখে দেখে নিল চন্দন। সন্দেহজনক কিছু নজরে পড়লো না। শরীরের মধ্যে হামাগুড়ি দিচ্ছে হিলহিলে ভয়। উল্টো ফুটপাতে অনন্তর চা দোকানে ঢুকলো সে। ঘরের কোনে পা থেকে মাথা পর্যন্ত চাদর মুড়ে শুয়ে আছে একজন। কে? ছ্যাঁৎ করে উঠলো চন্দনের বুক। অসুস্থ চন্দনের দিকে তাকিয়ে অনন্ত বলল, আমার ছেলে সনাতন। কাল থেকে খুব জ্বর। ঘুমোচ্ছে।

চন্দন চেয়ারে বসতে অনন্ত প্রশ্ন করল, চা খাবেন?

খাবার কী আছে?

ঘুগনি, আলুরদম।

দুপিস রুটি, আলুরদম।

কাচের প্লেটে গরম আলুরদম, দু-টুকরো পাঁউরুটি চন্দনের সামনে টেবিলের ওপর রাখলো অনন্ত। আলুর দমের প্লেট ধোঁয়া ছড়াচ্ছে। ভক করে বিষগন্ধ ঢুকলো চন্দনের নাকে। চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলো সে। তার দিকে তাকিয়ে আছে অনন্ত। মুখের চাদর সামান্য সরিয়ে কোণের বেঞ্চ থেকে নজর করছে সনাতন। আতঙ্কে হুড়মুড় করে দোকানের বাইরে এলো চন্দন। চেনাজানা জায়গা ছেড়ে পালাতে চায় সে।

তুমুল বৃষ্টির মধ্যে দ্রুত ছুটে যাওয়া গাড়ির ভেতর থেকে উইন্ডস্ক্রিনের কাচের বাইরে পৃথিবী যেমন দেখায়, সময়, ইতিহাস, বস্তুজগৎ সেভাবে মিলিন্দর চোখের সামনে বয়ে যাচ্ছে। মাঝরাতে সেই ভুতুড়ে বাড়ির ঘটনাবলী আবছা মনে পড়ছে তার। কী যেন হয়েছিল, ভাবার চেষ্টা করল সে। হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লো এক

বিশাল বাড়ি। বাড়ি চাপা পড়লো সে। সত্যি কি ঘটেছিল এসব ? মাথার মধ্যে চলেছে টুকরো, ছিন্ন নানা ধোঁয়াটে দৃশ্যের দৌড়। একটা দৃশ্যও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না সে। কখনও মনে হচ্ছে রোদ উঠেছে, পরের মুহূর্তে দেখছে রাত। পুকুরে খালি কলসি ভরার একটানা ভকভক শব্দ শুনছে কানে। বুঝতে পারছে চেনা, অচেনা পৃথিবীর মাঝখানে পাঁচিল ধরে দাঁড়িয়ে আছে সে। হঠাৎ শুনলো, অপার্থিব কণ্ঠস্বর, একদিনের জন্যে বাঁচতে চাই আমি। একটি দিনের স্বাধীনতা।

অচেনা গলা কেউ বলল, হুঁশ ফিরেছে।

কী বলছে, ঘরের শেষ মাথা থেকে প্রশ্ন করল একজন।

একই কথা।

হুম্।

মানুষের গলা শুনে সজাগ হলো মিলিন্দ। জ্ঞান, অজ্ঞানের সীমানা ছেড়ে সচেতনতার কাছাকাছি চলে এলো। বৃষ্টি কমে আসছে। পরিষ্কার হচ্ছে উইন্ড্স্ক্রিন্। মিলিয়ে যাচ্ছে কলসি ভরার ভকভক ধ্বনি। মিলিন্দ প্রশ্ন করল, আমি কোথায় ?

এক, দু' সেকেন্ড নীরবতার পর অচেনা গলা বলল, এ বাড়ির নাম, বিরামভবন। শহরের হৈহল্লা ছেড়ে যারা নির্জনতা, বিশ্রাম খোঁজে তাদের এখানে আনা হয়।

কথাগুলোর মানে না বুঝলেও নিজের চিন্তা, যুক্তি, বুদ্ধি, গুছিয়ে নেবার সুযোগ পাচ্ছে মিলিন্দ। মনে পড়েছে সব ঘটনা। মাঝরাতে ধরা পড়ে গেল সে। পেছন থেকে একটা গুলি লেগেছিল। লাগতেই পারে। তাকে দেখলেই গুলি করে মারার হুকুম ছিল। গুলি বোধ হয় বুকে লাগেনি। তাই বেঁচে গেছে। অ্যারেস্টের পর আদালতে বন্দীকে হাজির করা হয়। এটাই নিয়ম। আদালতে তোলা হয়নি তাকে। সেরকম ঘটনা মনে করতে পারলো না সে না। তার মানে সে নথিবহির্ভূত বন্দী। চালু আইনের আওতায় পড়ে না। চিরকাল নিখোঁজের তালিকায় হয়তো থেকে যাবে তার নাম। কিন্তু একদিনের স্বাধীনতা তার চাই। একদিনের জন্যে মুক্তি পেতেই হবে। তা না হলে যৌবনের মান থাকে না। শরীরের মহিমা নষ্ট হয়। তাছাড়া আছে চন্দনকে নির্দোষ সাব্যস্ত করার দায়িত্ব।

মাথা পরিষ্কার হয়ে আসতে কলে পড়া জন্তুর মতো ছটফট করতে থাকে সে। এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্নে প্রেম, বন্ধুতা, সর্বস্ব বাজি রেখেছিল। স্বপ্ন মরে নি। কিন্তু স্বপ্নের চেয়ে জীবন্ত মানুষগুলোর জন্যে উদ্বেগ আরও তীব্র হয়েছে। এখন, চন্দনের জন্য মমতায় যে কোনো কাজ করতে সে রাজি।

আপনার পোষাক বদলাতে হবে।

মিলিন্দর বুকে হাত রেখে কথাটা বলল, সাদা প্যান্ট শার্ট পরা একজন লোক।

লোকটা পুলিশ নয়, এক চমক দেখে বুঝতে পারলো মিলিন্দ। তার পাঞ্জাবি খুলে সাদা ফতুয়া পরাবার সময় চাপা গলায় লোকটা বলল, এখানকার মেল্ নার্স আমি।

মিলিন্দ দেখলো তার পাঞ্জাবি শতচ্ছিন্ন রক্তাক্ত। ময়লা পাঞ্জাবি, পাজামা খুলে ধোপদুরস্ত, পরিষ্কার একটা পাজামা পরালো পুরুষ নার্স। কীভাবে পোষাকের

এ দশা হলো, মিলিন্দ ভেবে পেল না। তার স্মৃতিতে ভাসছে আকাশছোঁয়া এক খাড়াই সিঁড়ি, অন্ধকার করিডোর, আলোকিত দুটি ঘর, গমগমে গলার প্রশ্ন, কী চাও, জীবন, না মৃত্যু ?

একগ্লাস গরম দুধ নিয়ে ফিরলো পুরুষ নার্স। মিলিন্দর মুখের সামনে গ্লাস ধরে বলল, খেয়ে নিন। একটু পরে ডাক্তারবাবু আসবেন।

গ্লাসে চুমুক দিল মিলিন্দ। দুধ গিলতেও কষ্ট হচ্ছে তার। লোকটা বলল, আমার নাম জাফর। আমিও একজন বন্দী।

আবছা অন্ধকার ঘর। মিটমিটে আলো জ্বলছে। সময়ের ধারণা করতে পারছে না মিলিন্দ। সকাল, সন্ধ্যে, দিন, রাত একাকার হয়ে গেছে। পাশের বিছানায় কেউ গোঙাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে জাফর বলল, ওর নাম তুষার। ওর ডান হাত সেপ্টিক হয়ে গেছে। কষ্ট পাচ্ছে খুব। তবে আজ ওর শেষ দিন।

মিলিন্দর গলায় দুধ আটকে গেল। হেঁচকি তুললো সে। ফিসফিস করে জাফর বলল, আমার কাছে কোনো প্রশ্ন করবেন না। আপনাদের সংগঠনেরই আমি একজন।

মিলিন্দ তাকালো জাফরের দিকে। জাফর বলল, আপনাকে ওরা বাঁচিয়ে রাখবে কিছুদিন। খবর জানার চেষ্টা করবে। তারপর।

কথার মধ্যে দরজার দিকে সতর্ক চোখে তাকাচ্ছে জাফর। মিলিন্দ বলল, একদিনের স্বাধীনতা চাই আমি।

অবাক চোখে এক মুহূর্ত মিলিন্দকে দেখে জাফর প্রশ্ন করল, একদিনের স্বাধীনতা কেন ?

আমার একদিনের স্বাধীনতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে দু'জন মানুষের বাঁচা, মরা।

শুধু দু'জন ?

হ্যাঁ, শুধু দু'জন।

আশি কোটি মানুষের মধ্যে মাত্র দু'জনের কথা ভাবছেন আপনি ?

দু'জনের মধ্যেই আছে আশি কোটি।

মিলিন্দর জবাব ঠিকঠাক বুঝতে না পেরে তাকিয়ে থাকলো জাফর। তারপর ফিসফিস করে বলল, আপাতত তিন, চারদিন ওষুধ, পথ্য, দিয়ে চাঙ্গা করে তোলা হবে আপনাকে। ডাক্তারবাবুও তাই বলে গেছেন।

চুপ করে গেল জাফর। একটা প্রশ্ন মনে জাগলেও করল না মিলিন্দ। জাফর বলল, আপনাকে যে ধরিয়ে দিয়েছে, তার হদিশ পেয়েছে সংগঠন। বেহুঁশ অবস্থায় তার নাম অনেকবার বলেছেন আপনি। কঠিন শাস্তি পাবে সে।

জাফরের কথায় ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইলো মিলিন্দর হৃৎপিণ্ড। মনে হলো আবার বেহুঁশ হয়ে যাবে সে। নিচু স্বরে জাফর বলছে, রেহাই পাবে না চন্দন। তার জন্যে তার ভাই সবিতও খুন হয়েছে। সব খবর পেয়ে যাচ্ছি আমি।

ভাঙা গলায় মিলিন্দ বলল, আপনি যা বলছেন, ঠিক নয়। আমার ধরা পড়ায় চন্দনের হাত নেই। সে নির্দোষ। নিজের গাফিলতিতে ধরা পড়েছি আমি।

যন্ত্রণায় বেঁকে গেছে তার মুখ। হতবাক জাফর তাকিয়ে আছে। তার হাত ধরে মিলিন্দ বলল, জাফর ভাই, একদিনের জন্যে মুক্তি চাই আমি। চন্দন নির্দোষ একথা সবাইকে জানাতে হবে। আর।

এধার নাম মুখে এলেও চুপ করে গেল মিলিন্দ। কান খাড়া করে বসে আছে জাফর। মিলিন্দ বলল, এধার গর্ভে আমার সন্তান। বিয়ে হয়নি আমাদের। ধরা না পড়লে কাজটা চুকিয়ে আসতাম।

মলিন হলো জাফরের মুখ। সে বলল, এই বিরামভবন থেকে কেউ জীবন্ত ফেরে না। আজ পর্যন্ত ফেরে নি। আইন, আদালতের বাইরে এ জায়গা। বিনা বিচারে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয় এখানে। কাকপক্ষী টের পায় না। কী করবেন আপনি?

ঘরের বাইরে পায়ের শব্দ শুনে জাফর বলল, তাড়াতাড়ি খান। আরও কাজ আছে আমার।

দু'জন লোক এসে তুষারকে তুলে নিয়ে গেল। জাফর কাঁপছে। মিলিন্দ ভাবছে, এধা কী করছে এখন? তাকে দেখার সুযোগ চন্দন পাবে না। কুনালদা কি দেখবে তাকে? এধার কথা পার্টিতে জানাজানি হলে নেতারা ছি ছি করবে। চরিত্র-হীন, কামুক ভাববে মিলিন্দকে। আত্মীয়স্বজন আগেই জেনে গেছে তার গোল্লায় যাবার খবর।

অসহায়তায় ছটফট করতে থাকে মিলিন্দ। অকালবৃষ্টির এক সন্ধ্যে ধরাশায়ী করেছে তাকে। তখনই উল্টো যুক্তি এলো তার মাথায়। মনে হলো, কোনো অন্যায় সে করেনি। নিজের মতো করে এধার সঙ্গে মিশেছে সে। ছেঁদো প্রেম, ভালোবাসার চেয়ে এ মেলামেশা অনেক বেশী অকপট, পরিচ্ছন্ন। এধাকে সে প্রতারণা করেনি। ফেলে পালাতে চায় নি। তার মুখ থেকে প্রেম, ভালোবাসার কথা শুনতে চেয়েছিল এধা। সে বলে নি। কেন বলেনি? এর নাম কি স্বার্থপরতা, আত্মপ্রেম? আত্ম-প্রেমের অন্ধতায় সে কি নাভালোবাসা, অপ্রেমের প্রেমে মশগুল ছিল? সেই নাভালোবাসা, অপ্রেমের মান রাখতে কি একদিনের মুক্তি স্বাধীনতা চাইছে সে? হয়তো তাই। প্রেম, ভালোবাসার সংজ্ঞা নানাজনের কাছে নানারকম। শব্দ দুটো সাদামাটা ব্যবহার করে তৃপ্তি পায় কেউ। ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে ব্যাখ্যা করে কারও অহমিকা তুষ্ট হয়। আসল কথা হলো অহমিকা। এই অহমিকার নামই বোধহয় ভালোবাসা। শ্রদ্ধা, ভয়, ভক্তি, কামনা, সবই অহমিকার আলাদা আলাদা পোষাক। মিলিন্দর চিন্তায় ক্রমাগত বদলাতে থাকে সত্যের রূপ, রঙ, অর্থ, আদল। সে বুঝতে পারে এধা বা চন্দনের স্বার্থের চেয়ে নিজের অহমিকা বাঁচাবার তাগিদে একদিনের স্বাধীনতা, মুক্তি খুঁজছে সে। যদি তাই হয়, তাহলেই বা ক্ষতি কী? এধা, চন্দনের রক্ষাকবচ হবে তার অহমিকা। এধা, চন্দনের হাতে এ কবচ তুলে দিয়ে আসবে সে। জান কবুল, সে পিছপা হবে না।

নিস্তব্ধ ঘরে একা বিছানায় শুয়ে তার মনে হলো, সত্যি কি কোনো আদর্শে

বিশ্বাস করে সে ? এ বিশ্বাসও কি তার অহমিকা ? প্রশ্নটা ভেবে দিশাহারা হলো মিলিন্দ । প্রশ্নের জবাব নেই । অথচ জবাব পাওয়া খুব জরুরি । একঝলক আলোর মতো জেগে উঠলো জবাবের ক্ষীণ সংকেত । আদর্শ খুঁজে বেড়ানোও একটা আদর্শ । পার্টি, সংগঠন, রাজনীতি ধরে এক নির্ভুল আদর্শের হদিশ করেছে সে । এই খোঁজার সঙ্গে আছে সন্দিগ্ধতা । সন্দেহ না থাকলে খোঁজার কাজ এগোয় না । বলা যায় অনুসন্ধানের প্রেরণা হলো সন্দেহ । তার সব কাজে তাই দ্বিধা । দ্বিধাও এক ধরনের অহমিকা ।

তিন, চারটে আলো জ্বললো ঘরে । ডাক্তার এসেছে । ডাক্তারের পাশে জাফর, সাদা পোষাকের দুই পুলিশ । গম্ভীর মুখে মিলিন্দকে পরীক্ষা করছে ডাক্তার । উসখুস করছে জাফর । দুই পুলিশের একজন বলল, আজই একে একবার নিয়ে যাওয়া দরকার ।

ডাক্তার বলল, আটচল্লিশ ঘণ্টার আগে পেশেণ্টকে নাড়াচাড়া করা যাবে না । দু'দিন অপেক্ষা করুন আপনারা ।

মুখ চাওয়াচায়ি করল দুই পুলিশ । জাফরকে ডাক্তার প্রশ্ন করল, ঠিকমতো ওষুধ পড়ছে ?

জাফর বলল, হ্যাঁ ।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল চারজন । আপন মনে মিলিন্দ বলল, একদিনের মুক্তি, স্বাধীনতা আমার অহমিকা । অহমিকা না থাকলে বেঁচে কী লাভ ?

বিরামভবন থেকে বেরোতে হবে । বেরোতেই হবে । জীবনের ঝুঁকি আছে । তা থাক । জীবনের চেয়ে অহমিকা অনেক বড়ো ।

সারারাত ঘুমোতে পারেনি এধা । বিছানায় শুয়ে দুর্ভাবনায় ছটফট করেছে । অন্ধকার পাতলা হতে কাক, চড়াই ডাকলো । সকাল হলো । টুকিটাকি দরকারী জিনিস রাতেই একটা কাপড়ের থলিতে ভরে রেখেছিল সে । সকাল আটটায় পৌঁছোতে হবে হাসপাতালে । হাসপাতালের গেটে অপেক্ষা করবে পরমেশ । গতকাল বিকেলে পরমেশের ফোন করার কথা ছিল । দুপুর থেকে রাত দশটা পর্যন্ত ফোনের আশে পাশে ঘুরঘুর করছে এধা । ফোন বাজলে থরথর করে কেঁপে উঠেছে তার শরীরের সব স্নায়ু । অনেকগুলো ফোন এলেও পরমেশের ফোন পায়নি । শরীরের কোষে কোষে অসম্ভব ক্লান্তি নিয়ে রাত এগারোটায় শুয়েছে সে । আবছা তন্দ্রার মধ্যে শুনেছে পৃথিবী জুড়ে বাজছে লক্ষ লক্ষ টেলিফোন । চমকে জেগে উঠেছে বারবার ।

পরমেশ ফোন না করায় ভয় পেয়েছে এধা। ফোন করার কথা নিজেই বলেছিল পরমেশ। শেষ মুহূর্তে সে পেঁছিয়ে গেল নাকি? ফোনের যা অবস্থা, হয়তো লাইন পায়নি। হাসপাতালের গেটে সোজা চলে যাবে সে। কথা দিলে কথা রাখে পরমেশ। তবুও এধার দুশ্চিন্তা কমেনি। প্রায় না ঘুমিয়ে রাত কেটেছে। তার চেহারা, চালচলন দেখে সন্দেহ করেছে রেণুকা। মেয়েকে বেশ কয়েকবার প্রশ্ন করেছে, কী হয়েছে তোর? শুকনো দেখাচ্ছে কেন?

পাশ কাটানো জবাব দিয়েছে এধা। গতকাল সকালেই তার মনে হয়েছিল, কিছু টাকা জোগাড় করতে হবে। মাকে এড়াতে বাবার কাছ থেকে টাকাটা চাওয়ার কথা মনে এসেছিল। কিন্তু বাবা যদি কোনো প্রশ্ন করে, খুঁটিয়ে তাকে দেখে কিছু বুঝতে পারে? কোনরকম ঝুঁকি না নেওয়াই ভালো। গলার একটা সোনার হার নিয়ে বৌবাজারে গিয়েছিল এধা। হারটা সে পরে না। আলমারিতে পড়েছিল অনেকদিন। রেণুকাও নিশ্চয় ভুলে গেছে মেয়ের এই গয়নার কথা।

বেলা এগারোটায় সোনার দোকানে ঢুকেছিল এধা। অচেনা দোকান। একজনও খদ্দের ছিল না। খুব সহজেই দেড়হাজার টাকায় বিক্রি হয়ে গেল হার। দোকানী ঠকালেও চুপচাপ মেনে নিয়েছিল এধা। টাকাটা খুব দরকার। দোকানের খাতায় ভুল নাম, ঠিকানা লিখে সই করল আসল নাম। নামের সঙ্গে সই মেলে নি, খেয়াল করল না দোকানদার। ভয়ে ঘামছিল এধা। দোকান থেকে বেরিয়ে তাড়াতাড়ি একটা ট্যাক্সি ধরে বাড়ি ফিরেছিল। পরিচয় ভাঁড়িয়ে অপরাধী লাগছিল নিজেকে। কিছু করার নেই, সে ভেবেছিল। তারপর আট, দশ ঘণ্টা কেটেছে ফোনের প্রতীক্ষায়।

কাঁধে থলি ঝুলিয়ে বাড়ির বাইরে এলো এধা। মাকে বলেছে, বন্ধুদের সঙ্গে বারুইপুরে পিক্‌নিক করতে যাচ্ছে। সন্ধ্যের আগে বাড়ি ফিরবে।

মেয়েকে অবিশ্বাস করেনি রেণুকা। বাস রাস্তা থেকে ট্যাক্সি ধরলো এধা। গত তিন, চারদিনে শরীরে জমেছে স্থায়ী ক্লান্তি। পরশু সকালে কল্যানের মুখে মিলিন্দর ধরা পড়ার খবর শুনে মাথা ঘুরে গিয়েছিল তার। মিলিন্দর অ্যারেস্টে যে চন্দনের হাত আছে, এ খবরও দিয়েছিল কল্যান। বিপন্নতার সঙ্গে চন্দনের ওপর ঘৃণায় নিঃশব্দে ফুঁসছিল সে। পাশাপাশি মনে জেগেছিল অনুতাপ। অন্ধকার মাঠে মিলিন্দকে একা ফেলে চলে আসার জন্যে কান্নায় ফেটে যাচ্ছিল বুক। ঘরে এক বোতল ব্র্যান্ডি ছিল। এম. এ. পরীক্ষার আগে ডাক্তারের পরামর্শে বোতলটা কিনে ছিল। দু'চার চামচ খেয়ে রুচি হয়নি। বোতলটা পড়েছিল আলমারিতে। কল্যান চলে যেতে ঘরের দরজা বন্ধ করে খেয়েছিল আধ বোতল ব্র্যান্ডি। গলা জ্বলছিল। ভোঁভো করছিল মাথা। চন্দনকে কঠিন শাস্তি দেবার মতলব ভেঁজেছিল সে। তারপর চন্দনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। খুন করার ইচ্ছে ছিল চন্দনকে। করতেও পারতো। কিন্তু মনের গভীরে কোথাও সামান্য সংশয় ছিল। মিলিন্দর স্কুলের বন্ধু কল্যান। ভীষণ ভালোবাসে মিলিন্দকে। এধার জন্যেও তার মমতা কম নয়। কল্যানের প্রেমিকা হলো নবনীতা। নবনীতা ছিল মিলিন্দর কলেজের সহপাঠিনী। এক সময়ে নবনীতাও মিলিন্দর প্রেমে হাবুডুবু খেয়েছে। নবনীতা নিজে এ কাহিনী

একদিন এধাকে শুনিয়ে হাসতে হাসতে বলেছিল, আমাকে আমল দিল না মিলিন্দ।

কল্যানকে অবিশ্বাস করার কোন প্রশ্ন নেই। সক্রিয় পার্টি কর্মী সে। তবু একটা খটকা ছিল এধার মনে।

হাসপাতালের গেটে ট্যাক্সি থেকে নামলো এধা। শীতের সকাল আটটা। এমন কিছু বেলা নয়। কুয়াশা জড়ানো লাজুক রোদ উঠেছে আকাশে। রাস্তায় দু'চারজন মানুষ। গেটের সামনেটা ফাঁকা। দু'একজন নার্স, খাকি কোর্তা পরা ওয়ার্ডবয়, জমাদার যাওয়া আসা করছে। গেট দিয়ে হাসপাতালে ঢুকে ডান পাশে সবুজ ঘাস ঢাকা মাঠ। ঘাসের ডগায় টলমল করছে শিশিরবিন্দু। হাতঘড়িতে এধা দেখলো, আটটা বাজতে দশ মিনিট বাকী। একটু আগেই এসে গেছে সে। পরমেশ আসবে ঠিক আটটায়। সামনে দিয়ে চলে গেল একটা খালি ট্রাম। সকালের রোদ, হালকা কুয়াশা, সবুজ ঘাস, শিশির, ট্রাম, কিছুই দেখছে না এধা। পরমেশের জন্যে প্রতীক্ষা করছে। পরমেশের কথা ভাবছে। আটটা বেজে গেল। একজন, দু'জন করে রুগী আসছে হাসপাতালে। এক, দেড় ঘণ্টার মধ্যে প্রতিটা আউটডোরে উপচে পড়বে ভিড়। রাস্তায় লোক চলাচল, গাড়ি বাড়ছে। ব্যস্ত, কর্মচঞ্চল হচ্ছে চারপাশ। গেট ছেড়ে সামান্য ভেতরে ঢুকে দাঁড়িয়ে আছে এধা। গেটের ওপর তার নজর। প্রত্যেক লোককে খুঁটিয়ে দেখছে। মাঝে মাঝে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে দৃষ্টি। তবু চোখ বোজার উপায় নেই। কোন ফাঁকে পরমেশ চলে যাবে, কে বলতে পারে। কেন দাঁড়িয়ে আছে, হঠাৎ ভুলে যাচ্ছে সেকথা। যাতায়াতের পথে তাকে দেখছে কেউ কেউ। দু'একটা মন্তব্য ছুঁড়ে দিচ্ছে। এধা নির্বিকার। সে কিছু দেখছে না, শুনছে না, পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

পূব আকাশ ছেড়ে অনেকটা এগিয়ে এসেছে সূর্য। রোদের তাপ বেড়েছে। শুকিয়ে যাচ্ছে শিশির ভেজা মাঠ। মাঠের মধ্যে কিচিরমিচির করছে এক ঝাঁক চড়াই পাখি। ঘাস ভিজে আছে কিনা দেখে নিয়ে মাঠের মাঝখানে রোদে পিঠ দিয়ে বসলো দু'জন লোক। হাতঘড়িতে সাড়ে ন'টা দেখে এধা বুঝলো, পরমেশ আর আসবে আসবে না।

পাথর হয়ে গেছে এধার দু'পা। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। রাস্তা টপকে একটা চা দোকানে ঢুকলো সে। পাঁচ মিনিট বসতে চাইছিল। চা খাওয়ার চেয়ে একটু বসা বেশি জরুরি। পরমেশের বিরুদ্ধে রাগ, ঘৃণা, অভিমান জাগলো না তার মনে। বরং নিজেকে ধিক্কার দিল। কারও কৃপা কখনও সে চায় নি। আজও চায় না। তবু কেন পরমেশের কাছে হাত পাতলো ?

নিজের ভাঙচুর চেহারা দেখে গ্লানি বোধ করল এধা। কোথায় নেমেছে সে ? আর নয়। আর নামবে না। যা হবার হবে। কারও সাহায্য সে চাইবে না। মিলিন্দর প্রতীক্ষায় বহন করবে অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যৎ।

বেয়ারা চা দিয়ে গেল টেবিলে। মিলিন্দর কথা ভাবতেই সাহস পেল এধা। তার মনে হলো, যে কোনো নিন্দেমন্দ, সমালোচনা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে পারে সে। তাই দেবে। পরমেশ না এসে বাঁচিয়ে দিয়েছে। মিলিন্দর সঙ্গে একবার দেখা করা

দরকার। সে কোথায় আছে, দেখা করার নিয়মকানুন জানতে হবে। একবার দেখা হলে আরও দুর্জয় হবে তার সাহস। এখনই মিলিন্দর পাত্তা নিতে হবে।

নতুন সংকল্পে মাথাটা হালকা লাগলেও পরমেশ কেন এলো না, এ প্রশ্ন এধাকে খোঁচাচ্ছে। কোনো বিপদ হলো নাকি তার? প্রশ্ন জাগতেই এধার মনে পড়লো, পরমেশ সম্পর্কে নানা গুজব। মিলিন্দ, তার বন্ধুরা পছন্দ করে না পরমেশকে। তার পেশা নিয়ে প্রশ্ন আছে অনেকের। কিন্তু এধার বিশ্বাস, পরমেশ নিরীহ, ছাপোষা মানুষ। বেশি কথা বলে নিজেই ডেকে আনে বিপদ। এই তার দোষ।

চা দোকান থেকে বেরিয়ে পরমেশের বাড়িতে যাওয়া ঠিক করল এধা। লোকটার কী হলো, জানা দরকার। প্রচ্ছন্ন অপমানবোধও কাজ করছিল এধার মনে। ট্রামে, বাসে পা রাখার জায়গা সেই। হাসপাতালের গেট থেকে একটা খালি ট্যাক্সি পেল। জেদের বশে ট্যাক্সিতে উঠে পড়লো সে। রাস্তায় জট পাকিয়ে গেছে মানুষ, গাড়ি। সকলেরই তাড়া, ব্যস্ততা। পথ ছাড়তে রাজি নয় কেউ। আধঘণ্টার রাস্তা আসতে একঘণ্টা সময় লাগলো। বড়ো রাস্তায় ট্যাক্সি ছেড়ে একটা সাইকেলরিক্শা নিল সে। সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে। সূর্য মাঝ আকাশে। নির্জন, সরু গলিতে ছুটছে সাইকেলরিক্শা। বাড়িতে হয়তো পরমেশকে পাওয়া যাবে না। না পেলে অসুবিধে নেই। তার কাছে কোন প্রত্যাশা নেই এধার। একজন ছাড়া কারও কাছে আর কোনো প্রত্যাশা নেই। সে একজন, তার প্রেমিক মিলিন্দ। কিন্তু প্রেম একতরফা নয়। মিলিন্দরও কিছু দায়িত্ব আছে। তাকে বলতে হবে, এধা তার প্রেমিকা। সে ভালবাসে এধাকে।

মিলিন্দর শয্যাসঙ্গিনী, স্ত্রী, সন্তানের মা হবার হ্যাংলামি তার নেই। প্রেমিকা হতে চায় সে। মিলিন্দর মুখে এই একটা শব্দ, স্বীকৃতি শুনলে বিয়ে না করেও তার একশো সন্তানের মা হতে এধা রাজি। এসব খবর পরমেশ জানে না। জানবে না কখনও। তাকে বাড়িতে পেলে এ বিষয়ে সামান্য আভাস দেবে এধা। কিছু কড়া কথা শোনাবে।

শহরের কাছে হলেও মফঃস্বলী ছাপ এখনও থেকে গেছে এখানে। রাস্তার ধারে পুকুর, ডোবা, ঝোপ, দু'একটা নারকোল গাছ, এধার চোখে পড়ছে। বছর তিন, চার পরে পরমেশের বাড়িতে যাচ্ছে সে। তবু বাড়ি চিনতে ভুল হলো না তার। রিক্শা থেকে নেমে ভাড়া দিল। সামনে, পেছনে একজন মানুষ নেই। পাশাপাশি বাড়িগুলো নিঝুম। পরমেশের বাড়ির বন্ধ দরজায় খুব আস্তে টোকা দিল এধা। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলো কয়েক সেকেন্ড। ভেতরে কোনো শব্দ নেই। দ্বিতীয়বার একটু জোরে টোকা লাগালো। পাড়ার নির্জনতায় অনেক জোরালো শোনালো সে আওয়াজ। দরজা খোলার জন্যে অপেক্ষা করছে এধা। মানুষের নড়াচড়া, পায়ের শব্দ শোনা যাবে নিশ্চয়। কোনো শব্দ শুনলো না সে।

নিস্তব্ধ বাড়ি। পরিত্যক্ত, ভুতুড়ে লাগছে। কাঠের দরজায় জোরে দু'তিনবার ধাক্কা দিল।

পাশের বাড়ির দোতলার জানলা খুলে রাস্তায় একবার উঁকি দিয়েই পাল্লা বন্ধ করল এক মহিলা। অবাক হলো এধা। বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে তখনই ভেসে এলো লঘু পায়ের শব্দ। সদরের দিকে আসছে কেউ। দরজা খুললো তেরো, চোদ্দ বছরের একটি ছেলে। বোধহয় কাজ করে এ বাড়িতে। মুখ দেখে মনে হলো, ঘুমোচ্ছিল সে।

পরমেশদা আছে ?

প্রশ্ন শুনে এধার মুখের দিকে ভ্যাবলা চোখে ছেলেটা তাকিয়ে থাকলো।

মাসিমা ?

পরমেশের বদলে হেমনলিনীর হদিশ চাইলো এধা। ঘুমের ঘোর কাটিয়ে এতোক্ষণে ছেলেটা ধাতস্থ হয়েছে।

পরমেশ, হেমনলিনীর হদিশ পেতে তাকে আবার একই প্রশ্ন করল এধা।

বিড়বিড় করে ছেলেটা বলল, দাদাবাবু হাসপাতালে।

সে কী, এধা প্রশ্ন করল, কী হয়েছে ?

দাবনায়, কাঁধে গুলি লেগেছে।

গুলি ! কে গুলি করল পরমেশকে ? ভয়ে কেঁপে উঠলো এধা। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলো অল্প সময়। তারপর প্রশ্ন করল, কোন হাসপাতালে আছে তোমার দাদাবাবু ?

হাসপাতালের নাম না বলতে পারলেও ছেলেটা বলল, থানার কাগজে লেখা আছে। থানার এক সিপাই এসে দাদবাবুর খবর দিয়েছিল কাল। কাগজটা ঘরে আছে।

থানা থেকে পাঠানো কাগজ পড়ে হাসপাতালের নাম পেল এধা। সকালে দু'ঘণ্টা যে হাসপাতালের সামনে সে দাঁড়িয়েছিল, সেখানেই একটা ওয়ার্ডে আছে পরমেশ। আশ্চর্য ব্যাপার। অবসাদ, ক্লান্তিতে জড়িয়ে যাচ্ছে এধার পা। নির্জন গলিতে একা হেঁটে চলেছে সে। কাপড়ের থলিটা হাল্কা হলেও কাঁধ বদল করছে বারবার। সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি। গা বমি ভাব। পেটের মধ্যে যে বড়ো হচ্ছে, আকার নিচ্ছে, পৃথিবীর আলো দেখার জন্যে সে ক্ষুধার্ত। দমকা বমি ঠেকাতে মুখে হাত চাপলো এধা। এখনই বাড়ি ফেরা দরকার।

আবার ট্যাক্সিতে উঠলো সে।

চব্বিশ ঘণ্টা পরে বিকেলে হাসপাতালে এসে কুণাল, ছায়াকে দেখলো এধা। ইচ্ছে থাকলেও গতকাল আসতে পারেনি। শরীর মনের অবসাদ, ক্লান্তিতে সারা বিকেল বিছানায় শুয়েছিল। কুণালের সঙ্গে একবার পরিচয় হলেও ছায়াকে আগে দেখেনি সে। তবু চিনতে ভুল হলো না। পরমেশের বিছানার দু'পাশে কাঠের দু'টো টুলে বসেছিল দু'জন। এধা আসতে টুল ছেড়ে তাকে বসতে বলল কুণাল। এধা বসলো না। পরমেশের মাথার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। তীক্ষ্ণ চোখে তাকে দেখছে ছায়া, বুঝতে পারলো এধা। মিলিন্দর মুখে ছায়ার টুকরো বর্ণনা শুনে কল্পনায় তার চেহারা

তৈরি করছিল এধা। কল্পনা, বাস্তবে বিশেষ ফারাক হয়নি। পরমেশের পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে একজন অচেনা লোক। ওয়ার্ডে বিশ, বাইশজন রুগী। ভিজিটিং আওয়ার সবে শুরু হয়েছে। অনেক রুগীর আত্মীয়, বন্ধুরা এখনও এসে পৌঁছোয় নি। কমলালেবুর ঠোঙাটা পরমেশের মাথার কাছে স্টিলের মিটসেফের ওপর রাখলো এধা। ভূত দেখার মতো তার দিকে তাকিয়ে আছে পরমেশ। হাসপাতালে ঢুকতেই ওষুধের ঝাঁঝালো গন্ধে এধার গা গুলোতে শুরু করেছে। কথা বললে বমির ভাব বাড়ার ভয়ে চুপ করে আছে সে। আশপাশের বিছানায় আলোচনা, গুঞ্জন। পরমেশের বিছানা ঘিরে নীরবতা। পায়ের কাছে দাঁড়ানো লোকটাকে হাতছানি দিয়ে ডেকে ফিসফিস করে কিছু বলল পরমেশ। লোকটা তাড়াতাড়ি মিটসেফ খুলে বার করল সন্দেশের বাক্স। ঢাকা তুলে বাক্সটা প্রথমে এধার সামনে ধরলো সে।

রাংতা লাগানো সন্দেশে চোখ পড়তে এধার পেট থেকে ঠেলে উঠলো বমি। প্রায় দৌড়ে টয়লেটের দিকে চলে গেল সে। ওয়ার্ডে ঢোকার সময়ে মহিলা লেখা টয়লেট নজরে পড়েছিল তার। তাই খুঁজতে হলো না। বেসিনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো সে। বমির হিক্কায় শরীর কাঁপলেও বমি হলো না। মুখ, নাক দিয়ে বেরিয়ে এলো খানিক হলদেটে, তেঁতো জল। বেসিনে ঘাড় গুঁজে কিছুক্ষণ দাড়িয়ে থাকলো সে। তারপর মুখে কপালে জল দিল। রুমালে জল মুছে আয়নায় নজর করল নিজেকে।

ফ্যাকাশে মুখ। দু'চোখের তলায় সামান্য কালি পড়েছে। ওয়ার্ডে ফিরে এধা দেখলো, অচেনা লোকটা চলে গেছে। সে আসতে আবার টুল ছেড়ে দাঁড়িয়েছে কুণাল।

আপনি বসুন, মৃদু হেসে কুণালকে বলল এধা। ভিড় বাড়ছে ওয়ার্ডে। ছায়া খুঁটিয়ে দেখছে এধাকে। চোখে চোখ পড়তে বারান্দার দিকে তাকালো এধা। জাল লাগানো বারান্দার বাইরে বড়ো গাছগাছালি। ঝাঁকড়া, সবুজ। বেলা শেষের আলো লেগেছে গাছে। নানারকম পাখি ডাকছে। টুল ছেড়ে বারান্দার দিকে গেল ছায়া। পরমেশকে কুণাল বলল, একটা সিগারেট টেনে আসি।

বারান্দায় ছায়ার পিছনে গিয়ে দাঁড়ালো সে। কুণালের টুলে এধা বসলো। বিছানার দু'পাশ খালি হয়ে যেতে এধাকে ক্ষীণ গলায় পরমেশ বলল, তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে।

পরমেশের দিকে অবাক চোখে তাকালো এধা।

পরমেশের মুখ উত্তেজনায় লাল। চকচক করছে দুচোখের মণি। চাপা গলায় পরমেশ বলল, কথা নয়, প্রস্তাব বলা ভালো। একটা প্রস্তাব আছে আমার।

ফোঁসফোঁস করে শ্বাস ফেলছে পরমেশ। মুখে যন্ত্রণার ছাপ। মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে বুলেট বিঁধেছে তাকে। দপদপ করছে টাটকা ক্ষতের সেলাই। তার দিকে শান্ত চোখে চেয়ে আছে এধা। সিগারেট শেষ করে বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালো কুণাল। দুচোখ বুজে পরমেশ বিড়বিড় করল, আমাকে বলতেই হবে।

অবাক কুণাল একবার পরমেশ, তারপর এধাকে দেখলো। কথাটা বলার জন্যে পরমেশ যখন তৈরি, বিছানার পাশে এসে তার কপালে হাত রাখলো হেমনলিনী।

চোখ খুললো পরমেশ। হাত রাখলো মায়ের হাতে। হেমনলিনীর বয়স ষাট, বাষট্টি। বয়সকালে হেমনলিনী যে ডাকসাইটে রূপসী ছিল, একনজরে বোঝা যায়। দুধে আলতা গায়ের রঙ, টিকোলো নাক, চেহারায় লাবণ্য, ব্যক্তিত্ব মিশে আছে। দেখে মনে হয় হেমনলিনীর বয়স চুয়ান্ন, পঞ্চান্ন। এধার মায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আছে হেমনলিনীর। দুজনে এক পাড়ার মেয়ে। তবে রেণুকার চেয়ে হেমনলিনী বয়সে অনেক বড়ো। হেমনলিনীর কথায়, চালচলনে এমন দৃঢ়তা, গাম্ভীর্য আছে যে, প্রথম আলাপে তাকে কড়া ধাতের মহিলা মনে হয়। আসলে তা নয়। স্নেহপ্রবণ, নরম মনের মানুষ হেমনলিনী, এধা জানে। হেমনলিনীকে টুল ছেড়ে দিয়েছে এধা। বারান্দা থেকে ছায়া ফিরলো ওয়ার্ডে। ভিজিটিং আওয়ার শেষ হয়ে আসছে। দু'চারজন করে বেরিয়ে যাচ্ছে দর্শনার্থীরা। ফাঁকা হচ্ছে ওয়ার্ড। পরমেশকে কুণাল বলল, যাই। পরশু আবার আসব।

একটু দাঁড়াও।

হেমনলিনীর কথায় কুণাল, ছায়া দাঁড়িয়ে গেল। হেমনলিনী বলল, তোমাদের সামনে একটা কথা আজ বলতে চাই। কথাটা জানা দরকার তোমাদের।

হেমনলিনীকে দেখছে এধা। কুণাল, ছায়ার মুখে, চোখে বিস্ময়। ফ্যাকাশে মুখে মায়ের দিকে তাকিয়ে আছে পরমেশ। হেমনলিনী বলল, পরমেশের পেশা নিয়ে নানা গুজব, সন্দেহ আছে। অপবাদের কিছু আমিও শুনেছি। সে পুলিশের লোক, বিদেশী চর, এমন সব নোংরা কথা। এই অভিযোগে তাকে খুন করতে চেষ্টা করেছিল কয়েকজন ছেলে। তারা রাজনীতি করে। কী রাজনীতি জানি না। তবে তাদের রাজনীতির সঙ্গে সত্যের কোনো সম্পর্ক নেই। ভগবানের কৃপায় প্রাণে বেঁচেছে পরমেশ। কিন্তু একবার বাঁচলেও আবার যে তাকে মারার চেষ্টা হবে না, কে বলতে পারে?

আর্তগলায় পরমেশ বলল, মা, চুপ করো।

না, চুপ করবো না।

বিছানায় উঠে বসার চেষ্টা করছে পরমেশ। তাকে ধরে শোয়ালো কুণাল। হেমনলিনীর ভ্রূক্ষেপ নেই। শান্ত গলায় বলল, পরমেশের কোনো পেশা নেই। সে বেকার। কিন্তু টাকারও অভাব নেই তার। পরমেশের স্বর্গীয় বাবা হয়তো গরীব ছিলেন, কিন্তু ওর জন্মদাতা ছিলেন ধনী। মৃত্যুর আগে তিনি সর্বস্ব দিয়ে গেছেন পরমেশকে।

বালিশে মুখ গুঁজে পরমেশ কাঁপছে। তার পিঠের ওপর হাত রেখে ছায়ার দিকে তাকিয়ে হেমনলিনী বলল, আমার দুর্বলতা, অপরাধের জন্যে ছেলেকে মরতে দেবো না আমি। এতোদিন একথা কাউকে বলিনি। পরমেশের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ ছিলাম। কিন্তু আর নয়। মিথ্যে অহমিকা, আত্মসম্মানের চেয়ে ছেলের জীবন অনেক বড়ো।

প্রায় খালি হয়ে এসেছে ওয়ার্ড। আলো জ্বলেছে। টুল থেকে উঠে পরমেশকে

হেমনলিনী বলল, আমি যাই। কাল সকালে খাবার নিয়ে আসবো।

হেমনলিনী চলে গেল। পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে কুণাল, ছায়া। এধা দেখলো, বিছানায় মিশে গেছে পরমেশ। চোখ তুলে তাকাচ্ছে না। আবছা গলায় কুণাল বলল, পরমেশদা যাচ্ছি।

এধাও বাড়ি ফিরবে। কুণাল ছায়াকে এড়াতে সে বসে থাকলো। টং টং করে বাজছে ভিজিটিং আওয়ার শেষ হবার ঘণ্টা।

অফিসে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে কুণাল। দাড়ি কামায়নি। উপায় নেই কামাবার। গলার ক্ষত শুকিয়ে এলেও পুলটিস লাগানো রয়েছে। সকাল থেকে ছায়াকে খুশি খুশি দেখাচ্ছে। কুণালের ব্রিফ্‌কেস নিজের হাতে এগিয়ে দিল সে। ছায়ার এতো খুশির কারণ কুণাল জানে না। তবে বড়ো ঝামেলার পূর্বাভাস ভেবে আশঙ্কিত হয়েছে। কাল পরমেশকে দেখে ফেরার পর থেকে ভার হয়ে আছে তার মন মেজাজ। গভীর হয়েছে কপালের রেখা। হেমনলিনীর কাহিনী শুনে যতটা না বিপর্যস্ত হয়েছে, তার চেয়ে বেশী ব্যাকুল হয়েছে এধাকে দেখে। মনে পড়েছে মিলিন্দর মুখ, কণ্ঠস্বর। এধার জন্যে কিছু করার চিন্তা মন থেকে সরাতে পারছে না কুণাল। কিন্তু কী করার আছে? এধা না চাইলে গায়ে পড়ে কিছু করা সম্ভব নয়। সেটা ভালো দেখায় না। এধার পক্ষেও আগবাড়িয়ে তার সাহায্য চাওয়া অসম্ভব। লজ্জা পাবে সে। স্বাভাবিক। কীভাবে এগানো যায়, কুণাল ভাবছে। একটা উপায় আছে। পরমেশের কাছ থেকে ফোননাম্বার নিয়ে এধাকে ফোন করা যায়। ফোনে তাকে আশ্বাস, সাহস দিতে পারে কুণাল। কথার মধ্যে জানাতে পারে, এধার যে কোন দরকারে পাশে আছে সে। অসংকোচে তাকে ডাকতে পারে এধা।

দায়িত্বের কথা কুণাল যতো ভেবেছে, ততো গম্ভীর হয়েছে তার মুখ। ছায়ার সঙ্গে আলোচনা করার উৎসাহ পায়নি। পাশাপাশি গত সন্ধ্যে থেকে উল্টোরকম হয়েছে ছায়ার প্রতিক্রিয়া। হঠাৎ তার আচরণ বদলে গেছে। রুক্ষতা, ঝাঁঝ মুছে তার চলায়, বলায় ফুটে উঠেছে নরম মাধুর্য। ফলে গত রাতে অনেকক্ষণ জাগতে হয়েছে কুণালকে।

ঠিক ন'টায়, অফিসে কুণাল বেরিয়ে যেতে হালকা খুশি ছড়িয়ে পড়লো ছায়ার মুখে। কাল সন্ধ্যে থেকে তার মাথায় নেচে বেড়াচ্ছে এক রঙীন পরিকল্পনা। বাড়ি

খালি হতে সেই পরিকল্পনা হাতেকলমে কাজে লাগাবার সুযোগ পেল ছায়া। ভিজে খোলা চুলে তাড়াতাড়ি বিনুনি বেঁধে নিল। শাড়ি বদলে পাউডারের পাফ্ মুখে বুলিয়ে আধঘণ্টার মধ্যে রাস্তায় এসে দাঁড়ালো। অফিস টাইম্। রাস্তায় একটা ট্যাক্সি নেই। পনেরো মিনিট পরে একটা খালি ট্যাক্সি পেল। অনেকদিন পরে সে ট্যাক্সি চাপছে। তাও আবার একা। বুক ঢিপঢিপ করলেও রোমাঞ্চ জাগছে শরীরে। ট্যাক্সির জানলা দিয়ে দেখছে রাস্তা, দোকান, নানা রঙের গরম পোষাক পরা মানুষ, নীল আকাশ। ঝলমলে রোদ উঠেছে। হুহু ঠাণ্ডা বাতাসে অচেনা সুবাস পেল সে। হাসপাতালের সামনে ট্যাক্সি ছেড়ে দিল ছায়া। গেট থেকে কিছুটা এগিয়ে হলুদ রঙের তিনতলা বাড়ির দোতলার ওয়ার্ডে আছে পরমেশ। সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠে গেল ছায়া।

বিছানার পাশে ছায়াকে দেখে ঘাবড়ে গেল পরমেশ। গত সন্ধ্যেতে দেখা করে গেছে কুণাল, ছায়া। চব্বিশ ঘণ্টা না পেরোতেই ছায়া আবার কেন এলো, বুঝতে পারছে না পরমেশ। অঘটন কিছু ঘটলো নাকি ?

ছায়া বলল, এ পাড়ায় এসেছিলাম। ভাবলাম দেখা করে যাই। কেমন আছেন এখন ?

ছায়ার কথা অবিশ্বাস করল না পরমেশ। হেসে বলল, ভালো। বেশ ভালো। বাড়ি যেতে পারলে আরও ভালো থাকবো।

সুস্থ হয়ে উঠুন, স্মিত হেসে ছায়া বলল।

সুস্থ আছি।

এধার ফোননাম্বারটা কী।

ছায়ার প্রশ্নে মুহূর্তের জন্যে বিহ্বল হলো পরমেশ। ছায়া কেন এসেছে, বুঝতে পারলো। বিড়বিড় করে এধার ফোননাম্বার বলল সে। হাত ব্যাগ খুলে কাগজ, কলম বার করে নম্বরটা লিখে নিল ছায়া।

আশঙ্কায় কাঁপছে পরমেশের বুক। ছায়া বলল, এধার জন্যে আমাদের কিছু করা উচিত।

পরমেশ সাড়া করল না। নানা দুশ্চিন্তা জাগছে তার মনে। এধাকে ফোন করে একটা জট পাকাবে ছায়া। ফোননাম্বার দেওয়া বোধ হয় ঠিক হলো না। তাছাড়া এধার জন্যে একটা পরিকল্পনা ভেবে রেখেছে সে। আগামীকাল আবার দেখা করতে আসবে এধা। পরিকল্পনাটা তখন তাকে বিশদ জানাবে পরমেশ। ছায়াকে কথাটা বলতে গিয়েও পরমেশ গিলে নিল। দু'চারটে মামুলি কথা বলে ছায়া চলে যেতে বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে লাগলো পরমেশ।

হাসপাতালের সামনের রাস্তায় কিছুটা হেঁটে ছায়া দেখলো সাজানো গোছানো এক মদের দোকান। বেশ বড়ো দোকান। এখানে নিশ্চয় ফোন আছে। দোকানে ঢুকে ছায়া দেখলো, অনুমান ঠিক। কাউণ্টারের পেছনে মালিকের টেবিলের ওপরে রয়েছে টেলিফোন। ছায়া বলল, একটা ফোন করব। খুব জরুরি।

দোকানের এক কর্মচারী যন্ত্রটা তুলে কাউণ্টারে রাখলো। একবার ডায়েল ঘোরাতেই লেগে গেল নম্বর। প্রথমে ধরলো একজন পুরুষ। এক, দেড় মিনিট পরে ছায়া শুনলো এধার গলা। হ্যালো।

পরিচয় দিয়ে ছায়া বলল, আপনার সঙ্গে একটা দরকারী কথা আছে।

বলুন।

ফোনে বলা যাবে না।

ছায়া ফোন করবে, জরুরি কথা বলবে, ভাবেনি এধা। এক মুহূর্ত চুপ থেকে সে প্রশ্ন করল, কোথায় বলতে চান?

লাইটহাউসের সামনে আসুন।

কখন?

এক ঘণ্টার মধ্যে। আমি আগেই পৌঁছোবো।

ঠিক আছে।

ফোনের পয়সা মিটিয়ে রাস্তায় এলো ছায়া। গির্জার বড়ো ঘড়ি ঢং করে ধাতব সম্ভীর শব্দে বাজলো। বেলা সাড়ে দশটা। ছায়া দেখলো, তার হাতঘড়িতে একই সময়। কলকাতার এই দুটো ঘড়ি ঠিকঠাক চলছে, সে ভাবলো। মুচকি হাসলো সে। যে ফুটপাতে রোদ পড়েছে, সেখান দিয়ে ছায়া হাঁটছে। মোলায়েম, উষ্ণ রোদ। আরাম লাগছে। তাড়াতাড়িতে গায়ের চাদর আনতে ভুলে গেছে। পাঁচ, সাত মিনিট হেঁটে প্রায় খালি একটা ট্রামে উঠলো সে। অনেক সময় আছে। এক চক্কর নিউমার্কেট ঘুরে সিনেমাহলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো ছায়া। হলের বাইরের দেওয়ালে এক বিশাল রঙীন পোস্টার। এক সেকেন্ড তাকিয়ে লজ্জায় চোখ নামালো সে। চোখে কালো সানগ্লাস, প্যান্টি, ব্রা পরা এক যুবতী পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে। তার বাঁ হাতে ললিপপ্। আধখানা ললি মুখে ঢোকানো। পেছনে লুকোনো ডান হাতে একটা রিভলভর। একবার দেখেই ছায়া বুঝেছে লোমহর্ষক বিদেশী ছবি। সিনেমাহলের গেটে জটলা করছে কিছু লোক। পার্টিকোর কোণে দাঁড়িয়ে আছে তিনজন মেয়ে। বিশ থেকে পঁচিশের মধ্যে তাদের বয়স। কে যে কার অপেক্ষায় আছে, বুঝতে পারলো না ছায়া। কিন্তু এধার জন্যে দাঁড়িয়ে থেকে মজা পেল সে। কথা চালাচালির জন্যে কিছু সংলাপ ছায়া সাজিয়ে রাখছে। কথা শুরু করাই আসল ব্যাপার। ঠিকঠাক শুরু করলে এধাকে বশে আনতে অসুবিধে হবে না।

সাড়ে এগারোটার দু'চার মিনিট আগে পৌঁছে গেল এধা। ট্যাক্সি থেকে তাকে নামতে দেখলো ছায়া। লম্বা ছিপছিপে শরীর, খাড়া নাক, চকচকে ফর্সা রঙ, প্রত্যেকটা অঙ্গ ছেনিতে কাটা নিখুঁত। যৌবন উপচে পড়ছে। এধা নজর করতে হাসিমুখে এগিয়ে গেল ছায়া। এধার দু'চোখে কৌতূহল। তার হাত ধরে ছায়া প্রশ্ন করল, অবাক হয়েছেন?

ম্লান হেসে এধা বলল, তা একটু হয়েছি।

বিরক্তও হয়েছেন?

নাহ্ ।

চলুন কোথাও বসি ।

এধাকে নিয়ে একটা রেস্টুরেণ্টের দোতলায় উঠলো ছায়া। চেনা রেস্টুরেণ্ট। কুণালের সঙ্গে একাধিকবার ছায়া এসেছে এখানে। এসময়ে রেস্টুরেণ্ট ফাঁকা থাকে। আজও তাই। সাদা উর্দি পরা তিন বেয়ারা আড্ডা দিচ্ছে। রাস্তার গাড়ি, শব্দ, গুঞ্জন আবছা। পর্দা ঢাকা একটা কেবিনে মুখোমুখি দু'জন বসলো। কেবিনের ভিতরে আবছা অন্ধকার। শীতও বেশি। পর্দা সরিয়ে বেয়ারা উঁকি দিতে এধাকে ছায়া প্রশ্ন করল, কী খাবেন ? চা, না কফি ?

চা !

আর কিছু ?

নাহ্ ।

দু'কাপ চা দিতে বলল ছায়া। বেয়ারা চলে যেতে এধার দিকে তাকিয়ে ছায়া হাসলো। ছায়া কেন ডেকেছে, বুঝতে চাইছে এধা। তার সমস্যা ছায়া নিশ্চয়ই জানে। কীভাবে জানলো ? তার মুখ থেকে খবরটা অন্ধকার মাঠে বসে শুনেছিল মিলিন্দ। তারপর কুণালের বাড়িতে সে আর যায়নি। তাহলে ? মিলিন্দ হয়তো আগেই আভাস দিয়েছিল। কিন্তু সরাসরি না বলে বিষয়টা ছায়া এতো রহস্যময় করে তুলছে কেন ?

চা দিয়ে গেল বেয়ারা।

কথা পাড়লো ছায়া। বলল, ধরা পড়ার দিন বিকেলে মিলিন্দ তার দাদাকে জানিয়েছিল আপনার খবর। তাড়াতাড়ি বিয়েটা রেজিস্ট্রি করার ইচ্ছে ছিল তার। হ'লো না।

এধার আরক্তিম মুখের দিকে তাকিয়ে ছায়া বলল, লজ্জার কিছু নেই। এটা কোন অপরাধ, পাপ নয়।

ছায়ার কথায় অবাক হয়েছে এধা। তার মুখে না শুনেও মিলিন্দ জেনে গিয়েছিল, সে অন্তঃসত্ত্বা। কী করে জানলো ? আন্দাজে টের পেয়েছিল। পেতেই পারে। ছায়া বলল, আপনার জন্যে কিছু করতে চাই আমরা। করাটা কর্তব্য। কারণ, আপনি আমাদের পরিবারের একজন।

ভেবে, গুছিয়ে কথা বলছে ছায়া। তার মুখের দিকে স্থির চোখে এধা তাকিয়ে আছে। ছায়া বলল, কবে মিলিন্দ ছাড়া পাবে, কেউ জানে না। দু, পাঁচ, দশ বছরও বন্দী থাকতে পারে সে। তার জন্যে বসে থাকার সময় আপনার নেই। আমাদেরও নেই। যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে।

কথার মধ্যে এধার মুখ, কপালের প্রতিটা ঢেউ, রেখা নজর করছে ছায়া। কথা থামিয়ে পরপর দু'চুমুক চা খেয়ে হাসিমুখে সে বলল, আপনার চা যে জুড়িয়ে জল হয়ে গেল।

চায়ের কাপ তুলে ঠোঁট ঠেকাল এধা। পাশের কেবিনের গুনগুন থেমে গেছে।

এক চুমুককে চা শেষ করল ছায়া। নিস্তব্ধ কেবিন। বেয়ারা এসে পর্দা সরিয়ে দেখে গেল একবার। ছায়া হাসলো। তারপর বলল, একা আমি কথা বলছি। আর বলব না। বরং আপনি বলুন, কী ভেবেছেন ?

ফ্যাকাসে মুখে এধা বলল, কিছু ভাবিনি।

এধার জবাবে ছায়া খুশি হলো। বলল, বুঝতে পারছি আপনার অবস্থা। একা ভাবতে পারছেন না। সম্ভবও নয়।

এক, দু সেকেণ্ড চুপ থেকে ছায়া বলল, আমরা, মানে কুণাল আর আমি একটা প্রস্তাব আপনাকে দিতে পারি।

দুচোখে প্রশ্ন নিয়ে এধা তাকিয়ে আছে দেখে ছায়া বলল, আমাদের বিশ্বাস, বাচ্চাটাকে রাখতে চান আপনি। সব মা তাই চায়।

বাচ্চা, আর মা শব্দদুটো জোর দিয়ে উচ্চারণ করল ছায়া। শব্দদুটো ঘা মারলো এধার বুকে। কালো হলো তার মুখ। নজর করে ছায়া বলল, অবশ্য নানা কারণে নিজের সন্তানকে মেরে ফেলতে মা বাধ্য হয়। তারপর কাঁদে। আপনার বেলায় তা হবে না। আপনার সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে। এই পৃথিবীর আলো হাওয়ায় হেসে খেলে বড়ো হয়ে দাপিয়ে বেড়াবে।

এধার চোখে চোখ রেখে ছায়া বলল, আপনার বাচ্চার দায়িত্ব আমাদের। আমরা তাকে মানুষ করবো। আপনি রাজি ?

ছায়ার প্রশ্নে থতমত খেল এধা। প্রশ্ন করল, কী বলতে চাইছেন আপনি ?

ঈষৎ কঠিন হলো ছায়ার কণ্ঠস্বর। সে বলল, বাচ্চা হওয়া পর্যন্ত আপনার সব দায়িত্ব আমাদের। কোনো অসুবিধে হবে না আপনার। বাচ্চা হবার সাতদিন পরে তাকে দত্তক নেবো আমরা। আমরাই হবো তার বাবা, মা। আপনার কোনো দাবী থাকবে না।

এধা বজ্রাহত, বোবা। ছায়ার কথা শুনতে পাচ্ছে না সে। ছায়া বলছে, সত্যিকার মানুষ করবো তাকে। আপনার আফশোষ থাকবে না।

এধার মনে হলো, কলে পড়া ইঁদুরকে শিশুরা যেমন খুঁচিয়ে আনন্দ পায়, তেমনই তার দুর্দশা উপভোগ করছে ছায়া। আহত ইঁদুরের মতো কোণঠাসা এধা হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ধন্যবাদ কারও সাহায্য লাগবে না আমার।

তার ভাঙা গলা, থমথমে মুখ। ছায়ার কথা জোগালো না। কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল এধা। রাগে দপদপ করছে ছায়ার মাথা। এধার চায়ের কাপ প্রায় বোঝাই। এক, দু চুমুকের বেশি সে খায় নি। ঠাণ্ডা চা যেন জমে গেছে। কয়েক সেকেণ্ড বোকার মতো বসে থেকে দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠলো ছায়া। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলো।

অফিস লাইব্রেরী থেকে আলেকজাণ্ডার কুপরিনের লেখা ইয়ামা দ্য হোল্, উপন্যাসটা নিয়ে বিকেল চারটের আগেই অফিস ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো কুণাল। হাসপাতালে পরমেশকে দেখতে যাচ্ছে সে। উপন্যাসটা নিল পরমেশের জন্যে। জেল আর হাসপাতাল যে বইপড়ার সেরা জায়গা, অভিজ্ঞ লোকদের মুখে একথা কুণাল

শুনেছে। গাড়ি রেখে আধবোঝাই একটা ট্রামে উঠলো সে। বই পড়তে ভালোবাসে পরমেশ। উপন্যাসটা পেয়ে সে নিশ্চয়ই খুশি হবে। বইটা দিয়ে তার কাছ থেকে এধার ফোন নাম্বার নেবে কুণাল। আজই যোগাযোগ করবে এধাকে। তার যে কোনো দরকারে কুণাল আছে, জানিয়ে দেবে। ফাঁকা ময়দানের ভেতর দিয়ে ছুটে চলেছে ট্রাম। অফিসে সারা দুপুর অস্বস্তিতে ছটফট করেছে সে। কাজে মন বসাতে পারে নি। এধার সঙ্গে কথা না বলা পর্যন্ত এ অস্বস্তি ঘুচবে না।

উত্তরের বাতাসে কাঁপছে ময়দানের তড়াগের স্বচ্ছ জল। বিকেলের আলো এসে পড়েছে জলের ওপর।

ওয়ার্ডের দরজায় দাঁড়িয়ে কুণাল দেখলো গলা পর্যন্ত কম্বলে ঢেকে পরমেশ শুয়ে আছে। সে জেগে, না ঘুমোচ্ছে ধরতে পারলো না কুণাল। চোখ বুজে শুয়ে থাকলেও পরমেশ ঘুমোয় নি। কুণালের পায়ের শব্দে তাকালো পরমেশ। কুণাল হেসে বলল, আজ অনেক চাঙ্গা দেখাচ্ছে আপনাকে।

পরমেশ হাসতে কুণাল প্রশ্ন করল, ঘুম ভাঙালাম নাকি ?

ঘুমোইনি, আসন করছিলাম।

এক মুহূর্ত থেমে পরমেশ আবার বলল, ওষুধ, ডাক্তারের চেয়ে আসন করেই তাড়াতাড়ি সেরে উঠছি আমি।

বইটা এগিয়ে দিয়ে কুণাল বলল, অফিস লাইব্রেরী থেকে আপনার জন্য নিলাম। অসাধারণ উপন্যাস। আমি পড়েছি সম্ভবত আপনিও পড়েছেন।

পাতা উল্টে উপন্যাস, লেখকের নাম দেখে পরমেশ বলল, দশ বছর আগে এ ধরণের একটা উপন্যাস লিখেছিলাম আমি। পাণ্ডুলিপি এখনও বাড়িতে আছে। তোমাকে পড়াবো।

কুণাল সচকিত। পরমেশের কথার ফোয়ারা এখনই খুলে যাবে। একঘেয়ে, অনর্গল সে স্রোত থামবে না। তার কথা বলার প্রবল আগ্রহ প্রমাণ করছে, সে সেরে উঠছে। পরমেশ বলল, দু একজন বন্ধুর অভিমত, কুপরিনের চেয়ে আমার উপন্যাসটা বেশি ভালো। আমার বিশ্বাস, তুমিও তা বলবে।

পরমেশের বোকামিতে কষ্ট পাচ্ছিল কুণাল। পুলিশের লোক, বিদেশী চর ছাড়াও পরমেশকে যে গাধা বলে অনেকে, কুণাল শুনেছে। পরমেশের কানেও কথাটা যে যায় নি, এমন নয়। তবু কেন নিজেকে সামলাতে পারে না সে ? নিজের কীর্তিকলাপের ধারাবিবরণী কেন দিচ্ছে পরমেশ ?

বেলা পড়ে আসছে। বারান্দার পাশে গাছগাছালির ডাল পাতায় জমছে ঘন ছায়া। কথার নেশায় আচ্ছন্ন পরমেশের কাছে এধার ফোননাম্বার চাইলো কুণাল। নিভে গেল পরমেশের উৎসাহ। থামলো সে। এক সেকেন্ড চুপ থেকে ফ্যাকাসে মুখে প্রশ্ন করল, সকালে তোমার শ্রীমতী এসে নিয়ে গেল এধার ফোননাম্বার। এখন তুমি চাইছো। ব্যাপার কী ?

বুকের মধ্যে জোরালো ধাক্কা খেলেও সহজ গলায় কুণাল বলল, তাই নাকি ? নেবার কথা ছিল আমার। ছায়া হয়তো এ পাড়ায় এসেছিল।

ঠিক তাই, পরমেশ বলল কি একটা কাজে এপাড়ায় এসে ছায়া দেখা করে গেল আমার সঙ্গে।

অস্থির হচ্ছে কুণাল। এধাকে ফোন করে ইতিমধ্যে হয়তো তালগোল পাকিয়েছে ছায়া। আর দেরী নয়। এধাকে এখনই ফোন করা দরকার। মনের অস্থিরতা চেপে কুণাল বলল, এধার নাম্বারটা আমার ডাইরিতেও লিখে রাখি। বাড়ি ফেরার পথে নম্বর লেখা কাগজের টুকবো হয়তো হারিয়ে ফেলেছে ছায়া।

সরল মুখ কুণালের, চোখের আড়ালে চোরা অস্বস্তি, অস্থিরতা টের পেল পরমেশ। ইচ্ছে না থাকলেও ফোননাম্বার দিতে বাধ্য হলো সে। ডাইরিতে নম্বরটা লিখে নিল কুণাল। মাঝবয়সী দুই স্ত্রী, পুরুষকে নিয়ে বিছানার পাশে হেমনলিনী এসে দাঁড়ালো। টুল ছেড়ে দাঁড়িয়ে কুণাল বলল, মাসিমা বসুন।

হেমনলিনী বসলো। অচেনা দুই মানুষকে দেখিয়ে হেমনলিনী বলল, পরমেশের কাকা কাকিমা।

হাত জুড়ে নমস্কার করল কুণাল। বাইরে ঘন হচ্ছে ছায়া। কুয়াশা জমছে। এক মুহূর্ত আর নষ্ট করতে চায় না কুণাল। ছায়ার আগেই এধার সঙ্গে কথা বলতে চায় সে। তা না হলে কেঁচিয়ে যাবে তার সদিচ্ছা।

পরমেশকে, পরশু আসছি, বলে হাসপাতালের বাইরে এলো সে। কাছে কোথায় ফোন আছে ভেবে নিল। রাস্তায় গিজগিজ করছে মানুষ। বয়ে চলেছে গাড়ির মিছিল। ঢিমে গতি। দু'পা এগিয়ে থেমে যাচ্ছে। রাস্তার মোড়ে এক সুসজ্জিত মদের দোকানে ঢুকল কুণাল। কাউণ্টারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে তিন, চারজন ক্রেতা। ফরমাস অনুযায়ী কাগজে মুড়ে বোতল এগিয়ে দিচ্ছে বছর পঁচিশ, ছাব্বিশের এক তরুণ। ক্রেতার ব্রিফকেস. কাপড়ের ঝোলা, রেশনের থলিতে পাচার হচ্ছে কাগজের প্যাকেট। কাউণ্টারে মানুষের আসা যাওয়ার বিরাম নেই। ভিড় পাতলা হতে মালিক দেখলো কুণালকে। কুণাল বলল. একটা ফোন করতে চাই। খুব জরুরি।

এখানে ফোন করতে দেওয়া হয় না।

মালিকের শীতল জবাব শুনে অপমানে কালো হয়ে গেল কুণালের মুখ। দোকান ছেড়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো সে। রাগে জ্বলছে তার শরীর। কিন্তু রাগ, অভিমানের এখন সময় নয়। ফোনে ধরতে হবে এধাকে। সেণ্ট্রাল এ্যাভিন্যুর পরিচিত এক রেস্টু-রেণ্টের কাউণ্টারে এসে দাঁড়ালো কুণাল। নামী রেস্টুরেণ্ট। চেনা ম্যানেজার এগিয়ে দিল ফোন। তিনবারের চেষ্টায় নম্বরটা পেল সে।

জলদগম্ভীর গলা বলল, হ্যালো।

এধা আছে ?

কুণালের প্রশ্নে উল্টোদিকের গম্ভীর গলা বলল, ধরুন, দেখছি।

একটা করে মুহূর্ত চলে যাচ্ছে। রিসিভার ধরা কুনালের মুঠো ঘামছে। রেস্টু-রেণ্টে বেশ ভিড়। চেয়ার টেবিল দখল করে বসে আছে দামী পোষাক পরা নারী, পুরুষ। নিশ্চিন্ত, উদ্বেগহীন তাদের মুখ। চারপাশে তাকিয়ে ভরসা খুঁজছে কুণাল। রিসিভারে ভেসে এলো মিহি, মেয়েলি গলা, হ্যালো. এধা বলছি।

দ্রুত হলো কুণালের বুকের স্পন্দন। গলা শুকিয়ে গেছে বুঝতে পারে নি সে। ঢোঁক গিলে বললো, আমি কুণাল, মিলিন্দর দাদা।

কেউ কথা বলছে না। রিসিভারের তারে বিজবিজ শব্দ। কুণাল বলল, হ্যালো।

বলুন।

আপনার সঙ্গে জরুরি একটা কথা ছিল।

বলুন।

একবার দেখা হওয়া দরকার।

কট করে কেটে গেল ফোনের লাইন। কুণাল বুঝলো, রিসিভার নামিয়ে রাখলো এধা। বোকার মতো কাউণ্টারে কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থাকলো সে। তার আশঙ্কা ফলে গেছে। এধাকে কচলে তেঁতো করে দিয়েছে ছায়া।

একটা প্রায় খালি বাসে উঠে গড়িয়া গুমটিতে চন্দন নামলো। শেষ হয়ে এসেছে শীতের দুপুর। একটা, দুটো মিষ্টির দোকানের দরজা পর্যন্ত গিয়ে ভেতরে অন্য খদ্দের দেখে ঢুকলো না সে। অনেক ঘুরে একটা খালি দোকান দেখে বসার ভরসা পেল। দোকানী, ছোকরা কাজের ছেলেটা, দুজনে দেখছে চন্দনকে। শরীর বইছে না তার। জ্বর, দুর্বলতায় চোখ মেলে থাকতে কষ্ট হচ্ছে। চন্দন বলল, এক গ্লাস জল।

কম বয়সী ছেলেটা জল দিল। এক চুমুকে গ্লাস শেষ করল চন্দন। খিদে পেয়েছে। দুটো সন্দেশ, দুটো রসগোল্লা চাইলো সে। ডিশ নিয়ে ছেলেটা এগিয়ে যেতে নধর ভুঁড়ি দোকানী কিছু বলল, তাকে। ছেলেটা ফিরে এসে চন্দনকে বলল, চার টাকা।

খাবার দাও আগে।

মাদুরে বসা দোকানী বলল, আগে দাম দিতে হবে।

অপমানে দু'কানের পাতা গরম হয়ে উঠলেও পকেট থেকে চার টাকা বার করে ছেলেটার হাতে দিল চন্দন। খাবার ইচ্ছে মরে গেছে। তবু হাত ধুতে বেসিনের সামনে গেল সে। বেসিনের সামনে হাফআয়না। আয়নায় নিজেকে দেখে সে চমকে গেল। খ্যাপা বাউণ্ডুলের চোহারা। এ দশা হলো কী করে? মিষ্টি দেওয়ার আগে দোকানী কেন দাম নিয়ে নিল, বুঝতে অসুবিধে হলো না তার। কোটরে বসা লাল দুটো চোখ। ঝাঁকড়া চুল জট পাকিয়ে আছে। লম্বা থুতনিতে ছাগল দাড়ি। পায়জামা পাঞ্জাবি কিটকিটে নোংরা। পাঞ্জাবির ওপর জড়ানো বিছানার চাদর। চাদরে দু,তিনটে ফুটো। শাল ভেবে বিছানার চাদর গায়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে সে। এতোক্ষণে নিজের শরীরের দুর্গন্ধ নাকে গেল তার। এই কদাকার মূর্তি দেখে রাস্তার মানুষও পাগল ঠাওরাবে তাকে। জোর করে হয়তো পাগলা গারদে পাঠিয়ে দেবে।

মিষ্টি খেয়ে আরও এক গ্লাস জল খেল চন্দন। একটু সুস্থ লাগছে। এখন মাথার

তার একটা চিন্তা। পরিচিত মানুষদের কাছ থেকে পালাতে হবে। চেনা জায়গায় বাঁচা অসম্ভব। দোকান থেকে বেরিয়ে দু'কদম হাঁটতেই হঠাৎ একজন খপ করে চেপে ধরলো তার কাঁধ। ভয়ে লাফিয়ে উঠলো চন্দন। তার সামনে এসে দাঁড়ালো এক চেনামুখ। মুখে হাসি সে প্রশ্ন করল, চন্দন, কেমন আছিস ?

শেষ বিকেলের আবছা আলোয় প্রসূনকে চিনতে পারলো সে। য়ুনিভার্সিটিতে তার সহপাঠী ছিল প্রসূন। বন্ধুত্বও হয়েছিল। ভয়ার্ত চোখে চন্দনকে তাকিয়ে থাকতে দেখে প্রসূন প্রশ্ন করল, কথা বলছিস না কেন ?

কাঁধ ছেড়ে খুঁটিয়ে চন্দনকে দেখে প্রসূন বলল, ইস্, তোর চোখদুটো কী লাল !

চন্দন চুপ।

তার কপালে হাত ছুঁয়ে প্রসূন বলল, জ্বরে যে পুড়ে যাচ্ছে গা।

রাস্তায় চলমান জীবন, মানুষ, মানুষের মন, বাতাস, সময়। দৃশ্য, অদৃশ্য জীবন বয়ে যাচ্ছে পাশাপাশি।

কী হয়েছে তোর ?

প্রসূনের প্রশ্নে চন্দন বলল, কিছু নয়, কিছু নয়,।

প্রসূনকে কাটিয়ে এগিয়ে গেল চন্দন! সঙ্গ ছাড়ল না প্রসূন। চন্দনের হাত ধরে প্রশ্ন করল, আমি কি তোর শত্রু ?

জবাব দিল না চন্দন। প্রসূন আবার বললো, রাজনীতি না করলেও তোর বন্ধু ছলাম আমি।

একমুহূর্ত চুপ থেকে প্রসূন বলল, বন্ধুত্বের দাম কম নয়। অবিশ্বাস করিস না। আমি আজও তোর বন্ধু।

চন্দনের মাথায় চিকুর দিচ্ছে ছাত্রজীবনের স্মৃতি। প্রসূনের সঙ্গে সত্যি গভীর অন্তরঙ্গতা ছিল তার।

চল চা খাই।

চন্দনের হাত ধরে তাকে প্রায় জোর করে একটা চা দোকানে নিয়ে গেল প্রসূন। মুখোমুখী দুটো চেয়ারে বসলো দুজন। আলো জ্বলছে দোকানে। কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে চন্দনকে দেখছে প্রসূন। চন্দনের জীবনে কিছু একটা গোলমাল হয়েছে টের পেয়েও জানতে চাইলো না সে। তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই। ধীরে ধীরে জানা যাবে। দু'কাপ চা দিয়ে গেল দোকানী। য়ুনিভার্সিটিতে পড়ার সময়ের কথা ভেবে প্রসূনের দু'চোখে অনাবিল কৃতজ্ঞতা। চন্দনের সাহায্য না পেলে তার এম. এ. পরীক্ষা দেওয়া হতো না। কলকাতায় থাকার জায়গা, বই, এমনকি পরীক্ষার ফি সবই টাকা জোগাড় করে দিয়েছিল চন্দন। যে কোনো দরকারে চন্দনের সাহায্য পেয়েছে সে।

মিলিন্দর কি খবর ?

প্রসূনের প্রশ্নে চমকে উঠলো চন্দন। তার মুখ দেখে চন্দন বুঝলো, ভুল প্রশ্ন

করেছে সে। কথা ঘোরাতে বলল, প্রায় চার বছর বাদে তোর সঙ্গে দেখা হলো। কী ভালো যে লাগছে। মুর্শিদাবাদের গ্রামে একটা স্কুলে পড়াই আমি। রেজিনগর স্টেশন থেকে দু'মাইল ভেতরে। অজ পাড়াগাঁ। কিন্তু অপার শান্তি। বাড়িতে থাকি। চারপাশে সবুজ গাছপালা। কতো রকমের পাখি ডাকে।

মন দিয়ে প্রসূনের কথা শুনছে চন্দন। কথা থামিয়ে প্রসূন প্রশ্ন করল, ইংরিজির একজন টিচার দরকার স্কুলে। পড়াবি ?

চন্দন নড়েচাড় বসতে প্রসূন বলল, তোর মতো ভালো ছাত্র পেলে হেডমাস্টার লুফে নেবে। তাছাড়া স্কুলের পরিচালকমণ্ডলীতে আমার বাবাও আছে। আমরা তো ওই এলাকার লোক।

গভীর প্রত্যাশায় প্রসূন তাকিয়ে আছে চন্দনের দিকে। চন্দনের মাথায় ভাসছে রেজিনগরের এক গ্রামের ছবি। য়ুনিভার্সিটিতে পড়ার সময়ে একবার গিয়েছিল প্রসূনের বাড়ি। মা, বাবা, ভাই, বোন, বেশ বড়ো সংসার। স্বচ্ছলতা না থাকলেও প্রসূনদের সংসারে শান্তির অভাব ছিল না। দু'দিন আনন্দে কেটেছিল। প্রসূন বলছে, সারা জেলার মধ্যে আমাদের এলাকা সবচেয়ে সবুজ। গঙ্গা, জলঙ্গী দুই নদীর কৃপা পেয়েছে আমাদের অঞ্চল। গাছপালা বেশি। হরেকরকম পাখির আড্ডা।

এক সেকেন্ড থেমে প্রসূন প্রশ্ন করল, নিশিভোর পাখির ডাক শুনেছিস তুই ?

হাসিমুখে চন্দনের দিকে তাকিয়ে আছে প্রসূন। জল হয়ে যাচ্ছে চন্দনের আতঙ্ক। প্রসূন বলে চলেছে, রাতের শেষ প্রহরে, যখন তরল হয়ে আসে অন্ধকার সূর্য ওঠে না, সূর্য ওঠার গন্ধ পাওয়া যায়, তখন ডাকে নিশিভোর পাখি। সাত আট বছরের কচি মেয়ের মতো রিণরিণে, মিঠে স্বর। স্পষ্ট বলে, নিশিভোর, নিশি-ভোর। সে ডাক মন্ত্রের মতো শোনায়।

পুরোনো প্রসূনকে খুঁজে পেল চন্দন। নিরীহ, সরল, স্বপ্নাতুর প্রসূন কবিতা লিখতো। প্রসূনের মনে কোনো জটিলতা, প্যাঁচ ছিল না। এখনও আগের মতো আছে সে। বদলায় নি। চন্দন টের পেল দশ মিনিট প্রসূনের সঙ্গ পেয়ে নিঃশব্দে নিরাময় ঘটেছে তার। কাঁধে হাত রেখে তাকে আবার প্রসূন প্রশ্ন করল, করবি তো চাকরিটা ?

করবো,।

তার হাত চেপে ধরলো প্রসূন। চন্দন বিড়বিড় করল, অনেরকদিন সবুজ গাছ-পালা, নদী, মাঠ দেখিনি আমি। সাদামাটা মানুষ দেখিনি। প্রায়ই শুনতে ইচ্ছে করে পাখির ডাক। আমি যাবো।

চন্দনের কথার মধ্যে প্রসূন বলল, হ্যাঁ মানুষ। অনেক মানুষ। গরীব, রুগ্ন ঝগড়াটে, আবার নরম মাটির মতো শান্ত, নিখাদ। পছন্দসই গড়ে নেওয়া যায়। তুই পারবি।

চার বছর পরে প্রসূনের সঙ্গে প্রাণখুলে গল্প করল চন্দন। প্রসূন বলল, পরশু সকাল আটটায় শিয়ালদা স্টেশনে তোর জন্যে অপেক্ষা করবো। ভোবাস নি।

দোকানের বাইরে রাস্তায় এসে দাঁড়ালো দু'জন। গড়িয়ায় পিসির বাড়িতে যাবে

প্রসূন। স্কুলের কাজেই কলকাতায় এসেছে সে। চন্দনকে প্রসূন বলল, বাড়ি ফেরার আগে ডাক্তার দেখাবি। ওষুধ নিয়ে বাড়িতে ঢুকবি। পরশুর মধ্যে একদম সেরে ওঠা চাই।

চন্দন বলল, সেরে গেছি আমি।

ছায়াময় দুপুর। জানলার পাল্লার ওপর বসে একটা কাক থেকে থেকে ডেকে উঠছে। অনেক দূরে ধোঁয়াটে আকাশের গায়ে চাবুকের দাগের মতো জেগে আছে একটা নারকোল গাছ। ফাঁকা পাথুরে মাঠের মতো খাঁ খাঁ করছে এধার মাথা। সাতদিন বাড়ি থেকে বেরোয় নি সে। ইচ্ছে করেই বেরোয় নি। কোথায় যাবে, কার সঙ্গে কথা বলবে? চেনাজানা মানুষ, ঘটনা শুষে নিয়েছে তার আত্মবিশ্বাস, ইচ্ছাশক্তি। তাকে নিয়ে মজা করছে সবাই। ক্ষতবিক্ষত করছে। দরদ, সহানুভূতির মুখোস এঁটে গিলে নিতে চাইছে তাকে। তবুও কারও খেলার পুতুল হবে না সে। মরে গেলেও নয়। এ তার জেদ। অস্বাভাবিক স্তব্ধ, কঠিন হয়েছে সে।

আলোর রঙ বদলাচ্ছে। ঘোলা আকাশ। মিলিন্দর সঙ্গে একবার মিলতে চায় সে। পাঁচ মিনিটের দেখা হলেও অসুবিধে নেই। তারপর সে বুক পেতে দেবে ঘূর্ণিঝড়ের সামনে। মিলিন্দর কথা মেজো পিসেমশাইকে বলা যায়। মেজো পিসেমশাই সুহাস কর, রাজ্য সরকারের পদস্থ আমলা। পুলিশ তার হাতের মুঠোয়। সুহাস ইচ্ছে করলে মিলিন্দর সঙ্গে এধাকে দেখা করিয়ে দিতে পারে। বালিগঞ্জে পিসির বাড়িতে গেলে এখন সুহাসকে পাওয়া যাবে। তার কথা শুনে হয়তো অবাক হবে সুহাস। মিলিন্দর মতো একজন বিপজ্জনক ছেলের সঙ্গে এধা কেন দেখা করতে চায়, প্রশ্ন করবে। করুক। এধা বলবে, মিলিন্দ তার প্রেমিক। মিলিন্দকে বিয়ে করবে সে। তারপর মিলিন্দর সঙ্গে দেখা হলে বলবে, তার সন্তান ধারণ করছে সে। তাকে একবার প্রেমিকা বলুক মিলিন্দ।

গত কয়েকদিনের ঘটনা ছিন্নভিন্ন করেছে তাকে। ছায়ার অপমান, কুণালের টেলিফোন, পরমেশের রহস্যময় কথা, আতঙ্ক, কী এক প্রস্তাব দেবার জন্যে ফ্যাকাসে মুখের ব্যাকুলতা, আর ভাবতে পারে না এধা। পিসির বাড়িতে সে পৌঁছলো সাতটায়। অন্ধকার ঘন হয়েছে। অভিজাত, নির্জন পাড়া। উঁচু পদের সরকারি কর্মীরা থাকে এখানে। বাড়ির গেটে কড়া পাহারা। এধাকে দেখে খুশিতে ললিতা-পিসি আটখানা। প্রশ্ন করল, দাদা, বৌদি কেমন আছে?

ভালো।

বাড়ির সকলের খোঁজখবর নিয়ে পিসি বলল, তোকে এমন মনমরা দেখাচ্ছে কেন? কী হয়েছে?

কিছু নয়।

দোতলা বাড়িটা প্রায় ফাঁকা। পিসির দুই ছেলে, এক মেয়ে দার্জিলিং-এ হোস্টেলে থেকে লেখাপড়া করে। দু'তিনজন ঝি চাকর আছে। দরকার ছাড়া দোতলায় ওঠে না তারা।

পিসেমশাই কোথায় ?

এধার প্রশ্নে ললিতা বলল, বসার ঘরে প্রাণায়াম করছে।

যাবো ?

যা।

কোনো কাজের কথা মনে পড়তে, এখনই আসছি, বলে নিচে গেল ললিতা। বিয়াল্লিশ বছর বয়সেও সামান্য টোল খায়নি ললিতার স্বাস্থ্য। দেখতেও ভালো ললিতাকে। বসার ঘরে ঢুকলো এধা। সাজানো, ছিমছাম ঘর। কম পাওয়ারের আলো জ্বলছে। এধা দেখলো দু আঙুলে নাক টিপে শর্টস্ পরে একটা বাঘের ছালের ওপর বসে আছে পিসেমশাই। ঋজু, টানটান শরীর। এধাকে নজর করল না সুহাস। দরজায় পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে থাকলো এধা। এক মিনিট পরে দু'আঙুল আলগা করে ধীরে ধীরে শ্বাস ফেললো সুহাস। শিথিল হলো তার শরীর। এধা কাশলো। দরজায় এধাকে দেখে মুচকি হেসে সুহাস বলল, কুম্ভক। ফুসফুস সতেজ রাখে।

হাফপ্যাণ্ট্ পরা পিসেকে অবাক চোখে দেখছে এধা।

ভেতরে এসো। বসো।

এধাকে ঘরে ডেকে সুইচ্ টিপে আলো জ্বালালো সুহাস। চোখ ধাঁধানো আলো। ঘরে ঢুকে সোফায় বসলো এধা। বাঘের চামড়া গুটিয়ে রেখে এধার মুখোমুখী বসে হালকা গলায় সুহাস বলল, কী খবর, এধাসুন্দরী ?

লম্ব, ফর্সা, মজবুত স্বাস্থ্য সুহাসের। দুচোখে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছাপ। সুহাসের মেজাজ ভালো দেখে সাহস পেল এধা। এক মুহূর্ত চুপ থেকে সে বলল, আপনার একটু সাহায্য চাই।

সুহাস তাকালো। এধার সঙ্গে মিললো তার চোখ। এধার মনে হলো তার বুকের ভেতর পর্যন্ত এক লহমায় দেখে নিল পিসেমশাই।

বলো।

বদলে গেছে সুহাসের কণ্ঠস্বর। এ গলা এধার অচেনা। এধা যা বলতে এসেছিল, বলল। তার মুখে মিলিন্দর নাম শুনে কঠিন হলো সুহাসের মুখ। কখন ললিতা ঘরে এসে বসেছে, খেয়াল করে নি এধা। সে চুপ করতে ললিতা প্রশ্ন করল, ছেলেটাকে কীভাবে চিনলি তুই ?

আমাকে পড়াতো।

সুহাস বলল, ব্রিলিয়াণ্ট ছাত্র। কিন্তু সমাজবিরোধী, এ্যাণ্টিসোশ্যাল। গুলি করে মারার হুকুম আছে।

এধা পাথরপ্রতিমা। স্থির বসে আছে। সুহাস বলল, আমি যতোটা জানি, এখনও ধরা পড়েনি সে।

ভাঙা গলায় এধা বলল, দশদিন হলো অ্যারেস্ট্ হয়েছে।

গম্ভীর মুখে বসে আছে সুহাস। ললিতা বলল, খবর নাও একবার।

সুহাসের সোফার পাশে লাল রঙের টেলিফোন। হাত বাড়িয়ে রিসিভার ধরলো সুহাস। তুললো না। এধাকে প্রশ্ন করল, তার সঙ্গে দেখা করতে চাও কেন?

চুপচাপ বসে আছে এধা। দুজোড়া চোখ দেখছে তাকে। এধা বলল, সে আমার বন্ধু। সত্যিকারের বন্ধু।

গুম হয়ে গেল সুহাস। প্রশ্ন করল, ওদের দলে ঢুকেছো নাকি?

নাহ্।

রিসিভার তুলে নম্বর ঘোরালো সুহাস। কার সঙ্গে সে কথা বলছে, বুঝতে পারছে না এধা। কিন্তু প্রতি মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে তার মুখের চেহারা। প্রথমে লালচে হলো, তারপর কঠিন, ফ্যাকাসে, বিবর্ণ। টিপয়ে টেলিফোনের পাশে একটা বই। নামটা পড়লো এধা, প্র্যাকটিক্যাল হিপ্নোটিজম, লেখক, ও হাসনুহারা।

রিসিভারে মুখ গুঁজে সুহাস প্রশ্ন করল, কিছু করা যায় না? হিট লিস্টে নাম আছে? আজ? হোল্ড ইট! নাহ্, আমার কোনো ইণ্টারেস্ট্ নেই। আসলে আমার স্ত্রী, মানে ললিতার ভাইঝির মাস্টার ছিল। ঠিক আছে। হোল্ড্ ইট্! খবর দাও। বাড়িতে আছি আমি।

রিসিভার রেখে পাথরের মতো মুখ করে কয়েক সেকেন্ড্ বসে থাকলো সুহাস। তারপর বলল, মনে হচ্ছে বাঁচাতে পারবো না। বেঁচে আছে কিনা, কে জানে?

আঁতকে উঠে ললিতা প্রশ্ন করল, সে কি?

খবর পেয়ে যাবো, এখনই।

এধা চুপ। বসে আছে। দুর্বোধ্য ধ্বনির মতো তার কানে বাজছে সুহাসের কথা। এক মুহূর্ত এধাকে দেখে সুহাস প্রশ্ন করল, বাড়ি ফিরবে কীভাবে?

সজাগ হলো এধা। বলল, চলে যাবো।

ললিতাকে সুহাস বলল, দয়ালকে বলো গাড়িটা নিয়ে ওকে পেঁৗছে দিতে।

খেয়ে যাবে ও।

ললিতার কথায় এধা বলল, আর একদিন খাবো। এখনই ফিরতে হবে আমাকে।

সোফা ছেড়ে এধা ওঠার সময়ে সুহাস বলল, সে প্রাণে বাঁচলে দেখা করিয়ে দেবো তোমার সঙ্গে। তবে দেখা না করাই ভালো। মিলিন্দ বোস ইজ এ্যা ডেঞ্জারাস্ এ্যান্ড্ ডেস্পারেট্ এলিমেন্ট্। বিপদ হবে তোমার।

দু'দিন আগে হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরেছে পরমেশ। শরীর দুর্বল। বাড়ি থেকে একদিনও বেরোয়নি। আরও সাত, দশ দিন শুয়ে বসে থাকতে হবে। ডাক্তারের হুকুম। বাড়িতে আটকে থাকা তার ধাতে নেই। বেরোবার জন্যে তাই ছুঁকছুঁক করছে সে। লুকোনো এক তাগিদও আছে। কুণাল, ছায়া, এধা সেই যে

গেল, হাসপাতালে আর আসেনি। কেন এলো না? তিনজনে বসে কি সমস্যার কোন সুরাহা করেছে? করলে এধার মঙ্গল! পরমেশের কোন দুঃখ নেই। এধাকে সাহায্যের জন্যে তৈরি ছিল সে। কুণাল, ছায়ার সাহায্য এধা পেলে পরমেশের আর দুশ্চিন্তা থাকে না। তার দায়িত্ব শেষ। হাসপাতালে সাতদিন একঝাঁক মুমূর্ষু রুগীর মধ্যে থেকে মৃত্যুভয় ঢুকেছে তার মনে। কী ঠাণ্ডা ভয় দেখানো পরিবেশ! প্রতিদিন কেউ না কেউ মরছে। পাশের রুগীই মারা গেল একদিন। আতঙ্কে সারারাত ঘুমোতে পারেনি পরমেশ। শুধু কেঁদেছে। আর দশটা বছর বাঁচতে চায় সে। চল্লিশ বছরের জীবনের সব ব্যর্থতা বাকী দশ বছরে কাটিয়ে উঠবে। তার কাছে আত্মীয়, বন্ধুদের আজও অনেক প্রত্যাশা। প্রত্যাশা মেটাবে সে।

পরমেশের ঘরের পেছনে একটা শিউলির ঝাড়। শিউলি পাতায় কাঁপছে বিকেলের আলো। ধীর চালে বইছে উত্তরের বাতাস। শিউলি ঝাড়ের তলায় শুকনো পাতায় পোকামাকড়ের চলাফেরার শব্দ। কাজের ছেলেটার সঙ্গে ঘরে ঢুকলো এধা। তাকে দেখে চমকে গেল পরমেশ। কী চেহারা হয়েছে এধার! দুরারোগ্য অসুখ ধরলো নাকি মেয়েটাকে? প্রশ্ন করতে ভুলে গেল পরমেশ। বিছানার পাশে চেয়ারে এধা বসতে সহজ হবার জন্যে পরমেশ বলল, ভাবলাম তোমরা বোধহয় ভুলে গেলে আমাকে!

পরিহাসের সঙ্গে প্রচ্ছন্ন অভিমান ছিল পরমেশের গলায়। কথা বলল না এধা।

কুণাল, ছায়া কেমন আছে?

পরমেশের প্রশ্নে সচকিত এধা প্রশ্ন করল, মানে?

এধার গলার স্বর শুনে একটু অবাক হয়েই পরমেশ বলল, আমার কাছ থেকে তোমার ফোন নাম্বার নিয়ে তারা সেই যে গেল, আর পাত্তা নেই। তোমার সঙ্গে তারা নিশ্চয় যোগাযোগ করেছিল?

হ্যাঁ।

তারপর?

কী শুনতে চাইছেন?

সুরাহা হলো?

সুরাহা হবার কিছু নেই।

জবাব শুনে জুড়িয়ে যাচ্ছে পরমেশ।

চন্দনের কোন খবর জানেন?

এধার প্রশ্ন শুনে পরমেশ বলল, কোন চন্দন? আচ্ছা বুঝেছি। তবারিশ চন্দন। কী ব্যাপার?

মিলিন্দ, ধরা পড়ায় চন্দনকে সন্দেহ করেছিল পার্টি। মিলিন্দ খবর পাঠিয়েছে, চন্দন নির্দোষ। আপনার বাড়িতে আসার পথে চন্দনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে সে। কোথায় গেছে মাসিমাও জানেন না। চন্দন নির্দোষ শুনে হাউ হাউ করে কাঁদলেন মাসিমা। বুক ফেটে যাচ্ছে আমার। বেচারি চন্দন! অভিমান করে নিরুদ্দেশ হয়েছে।

চন্দনের জন্য এধার মর্মবেদনা পরমেশের পছন্দ হলো না। তার মনে হলো,

এখন নিজের বিপদের কথা এধার ভাবা উচিত। শরীর যা হয়েছে, মরে যাবে।

সুহাসের বাড়ি থেকে কাল রাত ন'টায় বাড়ি ফিরে এধা দেখলো, সদর দরজায় কল্যাণ দাঁড়িয়ে আছে। দরজার ঠিক সামনে নয়, বাঁ দিকে অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিল কল্যাণ। এধাকে দেখে এগিয়ে এলো। চাপা গলায় বলল, মিলিন্দকে গুম করেছে পুলিশ। সে কোথায় আছে, কিভাবে আছে, জানি না। তবে একটা খবর পাঠিয়েছে।

মিলিন্দর খবর একটু আগেই সুহাসের বাড়িতে পেয়েছিল এধা। বাড়তি কিছু জানার জন্যে কল্যাণের মুখের দিকে তাকালো সে। এক সেকেন্ড চুপ থেকে কল্যাণ বলল, দু'তিন দিন আগে পার্টি জেনেছে এ খবর।

একটা ঢোঁক গিললো কল্যাণ। চারপাশে একবার নজর বুলিয়ে বললো, মিলিন্দর সন্তানের মা হতে চলেছো তুমি। খুব ভাল খবর।

লজ্জায় মুখ লাল হলেও অপমানের দংশন টের পেল এধা। তার মুখের চেহারা খেয়াল না করে কল্যাণ বলল, মিলিন্দ আরও জানিয়েছে চন্দন নির্দোষ, পার্টির সেরা কর্মীদের একজন। নিজের গাফিলতিতে ধরা পড়েছে মিলিন্দ।

চন্দনের জন্যে সে মুহূর্তে কান্না পেয়েছিল এধার। পাশাপাশি প্রবল অভিমান হলো মিলিন্দর ওপর। পিতৃত্ব মেনে নিয়ে সে কি করুণা করছে তাকে? সে যে এধার প্রেমিক, বললে কি মান যেত তার?

চিন্তিত এধাকে ভালো করে দেখছে পরমেশ। বাইরে অন্ধকার নামলেও আলো জ্বলেনি ঘরে। পরমেশ, এধা, কেউ আলোর অভাব বোধ করছে না। বরং এই ফিকে অন্ধকারে আরাম পাচ্ছে তারা। পরমেশ বুঝে গেছে, কুণাল, ছায়ার সঙ্গে এধার পটেনি। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে তারা সবাই। সে নিজেও। পরমেশের আবার মনে পড়লো পুরোনো সেই প্রস্তাব। এতো তাড়াতাড়ি সুযোগ হবে, সে ভাবে নি। বলার জন্যে নিঃশব্দে সাহস সংগ্রহ করছে পরমেশ। তখনই এধা প্রশ্ন করল, আপনার যেন কি বলার ছিল? কি এক প্রস্তাব?

হাতুড়ি পড়ছে পরমেশের বুকে। দ্রুত হয়েছে শ্বাস। ডান হাতে মুখ মুছতে গিয়ে টের পেল ভিজে উঠেছে হাতের পাতা। এক দৃষ্টিতে এধা দেখছে পরমেশকে। চোখ তুলছে না পরমেশ। এধার দিকে তাকাতে ভরসা পাচ্ছে না সে। ঘরের মধ্যে অস্বস্তিকর স্তব্ধতা। আর চুপ থাকা যায় না। পরমেশ বলল হ্যাঁ, আমার একটা প্রস্তাব ছিল। তোমার বন্ধু, শুভাকাঙ্খী হিসেবে কথাটা ভেবেছিলাম আমি।

একটু কেশে গলার শ্লেষ্মা সাফ করে পরমেশ বলল, ঠিক প্রস্তাব নয়।

পরমেশের যন্ত্রণাদায়ক ভনিতায় করকর করছে এধার কান। পরমেশ বলল, প্রস্তাবটা রাখার আগে দু'একটা প্রশ্ন আছে আমার।

চুপচাপ তাকিয়ে আছে এধা। পরমেশ প্রশ্ন করল, মিলিন্দ কি সত্যি ভালবাসে তোমাকে? প্রশ্ন শুনে এধা স্তম্ভিত। এ প্রশ্নের জবাব মিলিন্দর মুখে না পেয়ে মাথা কুটছে সে। ছুটে এসেছে পরমেশের দরজায়। অন্ধকার ঘর। চেয়ারে বসা এধাকে পরমেশ বলল, আমি বুঝতে পারি, তুমি ভালোবাসো মিলিন্দকে। নিখাদ তোমার ভালোবাসা। কিন্তু মিলিন্দ কি তোমাকে ভালোবাসে? তার পক্ষে ভালো-

বাসা কি সম্ভব ?

বিদ্রোহে, প্রতিবাদে চৌচির হচ্ছে এধার অন্তরাত্মা। পরমেশের মুখে এসব কথা সে শুনতে চায় না। সে এসেছে পরমেশের প্রস্তাব শুনতে। অথচ সেটা না বলে।

পরমেশ বলে চলেছে, সংগঠন, আদর্শ ছাড়া অন্য কিছু মিলিন্দ ভালোবাসে না। ভালোবাসা সম্ভব নয়। মিলিন্দর চরিত্রে এটাই স্বাভাবিক। অবশ্য আমার বিচার, মূল্যায়ন ভুল হতে পারে।

সংগঠন, আদর্শে ভালোবাসা থাকলে ব্যক্তিকে কি ভালবাসা যায় না ?

এধার প্রশ্নে পরমেশ বলল, নিশ্চয় যায়। সংগঠন, আদর্শের সঙ্গে ভালোবাসার মানুষ মিলে গেলেই এটা সম্ভব।

পরাজয়, অপমানে ঘুলিয়ে উঠলো এধার বোধবুদ্ধি। সে বলল, মিলিন্দর কোনো সংগঠন নেই, আদর্শ নেই।

কী বলছো ?

আঁতকে উঠলো পরমেশ। এক সেকেন্ড চুপ থেকে বলল, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাজনীতি করছে সে।

আপনার ধারণা ভুল, এধা বলল, জীবনের ঝুঁকি সে নিয়েছে, একথা ঠিক। কিন্তু কোন নির্দিষ্ট রাজনীতি, আদর্শ, সংগঠনের জন্যে এ ঝুঁকি নেয়নি। নির্ভুল, সঠিক এক আদর্শ খুঁজতেই সে বাজী রেখেছে জীবন। সঠিক আদর্শ খুঁজে বার করাই তার আদর্শ। আদর্শের খোঁজেই ঘুরে বেড়াচ্ছে সে। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ঘুরবে। সে প্রমাণ করবে, সত্যের খোঁজে জীবন উৎসর্গ করাই আসল সত্য। সত্য সবসময়ে সচল। সত্যান্বেষীর তাই দাঁড়িয়ে পড়ার সুযোগ নেই।

অবাক হয়ে এধার কথা শনছে পরমেশ। অন্ধকারে এধা এখন কয়েকটি রেখায় জেগে আছে। এক মুহূর্ত চুপ থেকে এধা বলল, এবার বলুন আপনার প্রস্তাব।

খুকখুক করে কেশে পরমেশ বলল, মুচলেকা দিয়ে বেরিয়ে আসতে বলো তাকে। তোমার জন্যে তার ভালোবাসাই হবে এ কাজের সবচেয়ে বড়ো যুক্তি, প্রেরণা।

এধা হাসলো। অন্ধকারে তার হাসি দেখতে পেল না পরমেশ। পরমেশের প্রস্তাব শোনার আশা ঝেড়ে ফেললো এধা। টের পেল ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে তার হাত, পা, নাকের ডগা, কানের লতি। এধা বলল, মিলিন্দকে অ্যারেস্ট করার কথা অস্বীকার করেছে পুলিশ। তাদের খাতায় মিলিন্দ এখনও পলাতক। কে দেবে মুচলেকা ? খাতায় কলমে অ্যারেস্ট হলেও মুচলেকা লিখত না সে।

লজ্জায় সাদা হয়ে গেছে পরমেশের মুখ। ভাগ্য ভালো, ঘর অন্ধকার। অন্ধকার বাঁচিয়ে দিয়েছে তাকে। সামনে তাকের ওপর টিকটিক করে বেজে চলেছে টাইমপিসু। সময় সমুদ্রে খসে পড়ছে বিন্দু বিন্দু মুহূর্ত। এধা ভাবছে এখন কী করছে মিলিন্দ ? সুহাস পিসেমশাই কি কিছু খবর পেল ? চন্দন এতো অভিমানী ? যাবার আগে একবার দেখা করল না ? কুণাল, ছায়া নতুন কোনো ঘোঁট পাকাচ্ছে নিশ্চয়।

পরমেশ ভাবছে, হাজার চেষ্টাতেও প্রস্তাবটা সে বলতে পারবে না এধাকে।

এধা হঠাৎ বলল, এক, দু'ঘণ্টার জন্যে আমার স্বামী সাজতে রাজি হয়েছিলেন আপনি।

পরমেশ বলল, এখনও রাজি।

কয়েক সেকেণ্ড নিস্তব্ধ হলো ঘর। এধা বলল, সারা জীবন যদি এ অভিনয় করতে হয়, রাজি হবেন ?

অন্ধকারে বলির পশুর মতো কাঁপছে পরমেশ। বোবা হয়ে গেছে সে। এধা বলল, ঘণ্টার সঙ্গে ঘণ্টা জুড়ে হয় দিন। দিনের সঙ্গে দিন জুড়ে মাস, বছর, জীবন। জীবনও কিছু ঘণ্টার যোগফল। যোগফলটা একটু বড়ো।

অনেক কষ্টে পরমেশ বলল, এই আমার বয়স, চল্লিশ পেরিয়েছি। তাছাড়া আমার পারিবারিক পরিচয়।

এতো দুঃখেও হাসলো এধা। বলল কোনো দুশ্চিন্তা নেই আপনার। আমি তো বলেছি, এ শুধু অভিনয়। মঞ্চে কতো নাটকের হাজার রাত অতিক্রান্ত হয়। নাটকে হাজার হাজার রাত স্বামী, স্ত্রী অভিনয় করেও অভিনেতা, অভিনেত্রী স্বামী, স্ত্রী হয়ে যায় না। আমাদের ব্যাপারও সেরকম হবে।

লজ্জায় পরমেশ নিস্পন্দ।

আপনি কি রাজি ?

এধার গলায় অধৈর্য টের পেল পরমেশ। বরফে চাপা পড়েছে সে। বরফের কবরের তলা থেকে সে বলল, রাজি।

আলো না জেলে কেন বসে আছো তোমরা ?

ঘরে ঢুকে প্রশ্ন করল নলিনী। পাড়ার লাইব্রেরি থেকে পরমেশের জন্যে বই নিয়ে হেমনলিনী বাড়ি ফিরলো। ঘরের আলো জেলে এধা, পরমেশকে হেমনলিনী প্রশ্ন করল, চা খাবে কেউ ?

পরমেশ বললো, হ্যাঁ।

এধা বলল, উঠতে হবে আমাকে।

দুপুর থেকে শুরু হয়েছে অঝোর বৃষ্টি। বাতাসে ধোঁয়ার মতো উড়ে বেড়াচ্ছে জলের গুঁড়ো। বৃষ্টি, বাতাসের দুরন্ত শব্দে রোমাঞ্চ লাগছে এধার। হেমন্ত শেষের বৃষ্টির পর শেষ শীতে এলো তুমুল বর্ষণ। খোলা জানলা দিয়ে ধুলোর মতো জলকণা এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে তার মুখ, কপাল, চুল। চোখ বুজে বৃষ্টির আদর খাচ্ছে সে।

রাত প্রায় আটটা। জানলার পাশে চেয়ারে বসে আছে এধা। তার মুখে বিজয়িনীর দেমাক। হাত দিয়ে সে স্পর্শ করল ব্লাউজের তলায় রাখা মিলিন্দর চিঠি। আজ দুপুরে এ চিঠি দিয়ে গেছে কল্যাণ। এ চিঠির আশাতেই যেন বসেছিল

এধা। চিঠিটা তাকে দিয়ে কল্যাণ বলেছিল, পড়ে পুড়িয়ে ফেলবে। পুলিশের হাতে এ চিঠি গেলে মিলিন্দর বিপদ হবে।

কল্যাণ চলে যেতে দরজায় খিল এঁটে দিয়েছিল এধা। হাত কাঁপছিল তার। ধড়ফড় করছিল বুক। দু'হাতে চিঠিটা বুকে জড়িয়ে বসেছিল অনেকক্ষণ। গতকালের ঘটনা মনে পড়ছিল। পরমেশের সঙ্গে কথা বলে বাড়িতে ঢুকেই মন্দ গেয়েছিল তার মন। উঠোন, দালান, চাতাল এমন কি সিঁড়ির সব আলো জ্বলছে। উৎসব, অনুষ্ঠান ছাড়া বাড়িতে এতো আলো জ্বলে না। সেরকম উপলক্ষ নেই। থাকলে এধা জানতো। তাহলে? দোতলায় উঠে বাঁ পাশে বসার ঘর। সাবেক আসবাবে সাজানো। একটা ঝাড়বাতিও আছে। অসাধারণ কেউ এলে এ ঘর খোলা হয়। কে এলো? ঘরে উঁকি দিয়ে এধা দেখলো, সুহাস পিসেমশাই, ললিতাপিসি বসে আছে। তাদের সামনে বাবা, মা। গম্ভীর থমথমে পিসেমশাই-এর মুখ। বাবার মুখে উদ্বেগ। মা, পিসি, কথা বলছে। বছরে একবারও এ বাড়িতে সুহাস আসে না। ব্যস্ত মানুষ। সময় পায় না আসার। সুহাস এলে সাড়া পড়ে যায় বাড়িতে। তার খাতিরে আলো জ্বলে ওঠে। সুহাস প্রশাসনের পয়লা সারির লোক। কম কথা নয়। এধাকে দেখেই সুহাস বলল, এসো। তোমার জন্যে বসে আছি।

মিলিন্দর খারাপ কিছু হয়েছে ভেবে ধড়াস করে উঠেছিল এধার বুক। ললিতা, রেণুকা কথা থামিয়ে দেখছিল এধাকে। উদ্বিগ্ন বাবা ডাকলো, আয়। তোর সঙ্গে কিছু কথা বলবে সুহাস।

ঘরে ঢুকে সুহাসে সামনে একটা চেয়ারে বসলো এধা। চব্বিশ ঘণ্টা আগে সুহাসের মুখে, চোখে যে দৃঢ়তা, দীপ্তি এধা দেখেছিল, তা নেই। গলার স্বর বসে গেছে। সুহাস প্রশ্ন করল, মিলিন্দর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কী?

সামান্য দ্বিধা সত্ত্বেও এধা বললো, মিলিন্দকে ভালোবাসি আমি। হয়তো বিয়ে করবো।

ললিতা তাকালো রেণুকার দিকে। সোফার মধ্যে প্রায় ঢুকে গিয়েছিল বাবা। জবাব শুনে প্রশ্ন ভুলে গেল সুহাস। এক সেকেন্ড চুপ থেকে সুহাস প্রশ্ন করল, তোমার সিদ্ধান্ত পাকা?

এখনও পর্যন্ত।

মানে?

একটা শর্ত আছে। আমার ব্যক্তিগত শর্ত। বলবো না।

কঠিন হলো সুহাসের মুখ। কোনমতে নিজেকে সামলে সুহাস বলল, খাতায় কলমে না হলেও পুলিশের হেপাজতে মিলিন্দ ছিল। বাঁচার কথা তার নয়। কালই হয়তো মারা যেত সে। আমি নাক গলানোয় সে মরে নি। কিন্তু কাল রাতে পুলিশ হেপাজত থেকে সে পালিয়েছে। সঙ্গে নিয়ে গেছে আর একজন বন্দীকে। মেলনার্সের কাজ করতো সে। তার নাম জাফর। কিন্তু কী লাভ? আজ, বা কাল অ্যারেস্ট সে হবেই। এবং সঙ্গে সঙ্গে মারা পড়বে।

বাইরে তুমুল বৃষ্টি, জলকণার উদ্দাম নাচ, বিদ্যুতের ঝলক, কড়কড় কড়াৎ, বাজ পড়লো বিকট শব্দে। ক্ষ্যাপা হাওয়ায় বৃষ্টির ঝাপটা এসে লাগছে এধার মুখে। আহ, কী আরাম। খুশিতে থৈথৈ করছে তার বুক। গত রাতে সুহাসের মুখে মিলিন্দর খবর শুনে খুশিতে ফেটে পড়েছিল সে। পাগল বাতাসের মতো নাচতে ইচ্ছে করছিল তার। খুশি চেপে গম্ভীর মুখে তবু বসেছিল সে।

সুহাস বলছিল, না পালালে তাকে হয়তো বাঁচাতে পারতাম আমি। চেষ্টা করলে ব্যর্থ হতাম না নিশ্চয়। অ্যারেস্টের সরকারি নথিতে তার নাম একবার তুলে দিতে পারলে আদালতে হাজির করা হতো তাকে। তুমি চলে আসার পর দু'জন সহকর্মীর সঙ্গে ফোনে কথাও বলেছিলাম। পন্ড হয়ে গেল সব। সরকারের কানে যাবে আমার উদ্যোগের খবর। সে আর এক কেলেঙ্কারি।

চাকরি নিয়ে পদস্থ আমলার এ আতঙ্ক উপভোগ করছিল এধা। সুহাস বলল, তোমার সাহায্য চাই আমি।

এধার চোখে চোখ রেখে সুহাস বলেছিল, আজ হোক, কাল হোক, সে যোগাযোগ করবে তোমার সঙ্গে। নিশ্চয় করবে! তার সঙ্গে একটা এ্যাপয়েন্টমেন্ট করে খবর দেবে আমাকে।

চেয়ার থেকে ছিটকে দাঁড়িয়েছিল এধা। জ্বলজ্বল করছিল তার দুচোখ। সুহাস বলল, রাগ করো না, উত্তেজিত হয়েও লাভ নেই। মিলিন্দ এবং তোমার ভালোর জন্যে অনেক ভেবে একথা বলছি। আমি খবর পেলে প্রাণে বাঁচবে সে। আমার অনুগত অফিসারদের বলে অ্যারেস্টের সঙ্গে সঙ্গে থানা হেপাজতে বন্দীর খাতায় নথিবদ্ধ করে দেবো তাকে। ব্যস, দুশ্চিন্তা শেষ। প্রাণের আশঙ্কা থাকবে না।

এক মুহূর্ত চুপ করে সুহাস বলেছিল, মাথা ঠান্ডা করে কথাটা ভেবো।

চেয়ার ধরে দাঁড়িয়েছিল এধা। সুহাস বলল, তোমার মা, বাবাকেও বুঝিয়ে বলেছি সব।

আনন্দের তুফান বইছিল এধার বুকে। একা থাকতে চাইছিল সে। সুহাসই বলল, তুমি যাও। সাবধানে থেকো। ছেলেটা দুর্ধর্ষ! ক্ষতি করে দিতে পারে তোমার।

ঘরে ফিরে দরজা এঁটে বালিসে মুখ গুঁজে হাউহাউ করে কেঁদেছিল এধা। সুখের কান্না। মরে গেলেও দুঃখে কখনো কাঁদবে না সে। আধ ঘণ্টা পরে বিছানা ছেড়ে এধা কল ঘরে ঢুকলো। অনেকক্ষণ ধরে স্নান করলো। অনেকক্ষণ ধরে চুল আঁচড়ালো। হালকা সবুজ শাড়ি পড়ে ক্রিম পাউডার ঘসলো মুখে। চোখের তলায় কাজল টানলো তিন মাস পরে। ভীষণ ঘুম পাচ্ছিল তার। রাত সাড়ে ন'টায় এলো কুণাল। শুকনো মুখ, চোখের তলায় কালি, কুণাল যে বাড়ি পর্যন্ত আসবে, এধা ভাবেনি। আতঙ্কে কাঁপছিল কুণাল। তার বাড়িতে কাল রাত থেকে তিনবার হানা দিয়েছে পুলিশ। ছায়ার মাথায় নাকি গন্ডগোল দেখা দিয়েছে। চিকিৎসার জন্যে তাকে বোম্বে নিয়ে যাচ্ছে কুণাল। এধার সঙ্গে দেখা করার পর থেকে বিগড়ে গেছে

ছায়ার মাথা। কুণাল জানে, এ দুর্ভোগের জন্যে ছায়াই ছায়া। এধার কোনো ভূমিকা নেই। বরং তার সঙ্গে ছায়ার দেখা, এলোমেলো আচরণ আন্দাজ করে বারবার মাপ চেয়েছিল কুণাল। যাবার সময় বলেছিল, যে কোনো দরকারে এধার পাশে সে আছে।

একমাসের মধ্যে বোম্বে থেকে কুণাল ফিরবে। ফোনে তার সঙ্গে এধা যেন যোগাযোগ করে তারপর। এ হলো গতকালের ঘটনা। আজ পরিস্থিতি অন্যরকম। খুশির বান ডেকেছে এধার মনে।

আজই ছায়াকে নিয়ে বোম্বে রওনা হচ্ছে কুণাল। এই দুর্যোগে স্টেশনে পৌঁছতে পেরেছে তো তারা? ব্লাউজের ভেতর থেকে চিঠিটা বার করে পড়তে শুরু করলো এধা। বিকেল থেকে কতবার পড়লো? আট, দশবার তো বটেই। মনে হচ্ছে মুখস্থ হতে দেরী নেই। কিছু লাইন. এখনই চিঠি না দেখে বলতে পারে। লাইনগুলো স্মরণ করলো এধা।

'পুলিশ হেপাজত, নাম বিরাম ভবনে বসে ভাবছিলাম এক দিনের জন্যে স্বাধীনতা চাই, মুক্তি চাই। তোমার আর চন্দনের জন্যে চেয়েছিলাম চব্বিশ ঘন্টার মুক্তি। বাইরে এসে বুঝতে পারছি, স্বাধীনতা অখণ্ড, অবিভাজ্য, দেশ, কালব্যাপ্ত এক চরম সত্য। সে সত্য প্রমাণের জন্যে বেঁচে থাকবো আমি। আমার মুখে প্রেম, ভালোবাসার কথা না শুনে, আমি জানি, অভিমান আছে তোমার। অভিমান ক'রো না। আমি নাভালোবাসার, অপ্রেমের পথিক। তোমাদের প্রেম, ভালোবাসার চেয়ে আমার নাভালোবাসা, অপ্রেম কম সাচ্চা নয়। আমার এই নাভালোবাসা, অপ্রেমের নাম, এধা আর সেই আগন্তুক, যে আসছে। খুব তাড়াতাড়ি দেখা হবে। হয়তো এক অন্ধকার বৃষ্টির সন্ধ্যেতে, যখন ঝোড়ো বাতাস বইছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, রাস্তা নির্জন, নিস্তব্ধ, তখন তোমার জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াবো আমি। বিশ্বাস হারিও না। আমি আসছি। তোমার চিরদিনের অপ্রেমিক, মিলিন্দ।

চিঠিটা চোখের সামনে মেলে এধা বলল, আমি জানি, তুমি আসবে। আজ অথবা কাল আসতেই হবে তোমাকে। তুমি যে আমার অপ্রেমিক! তুমি অসাধারণ, আর পাঁচটা প্রেমিকের চেয়ে আলাদা। তোমার সন্তানকে বাঁচাতেই হবে। বাঁচাবো। বৃষ্টি, বাতাসের শব্দে মিশে গেল এধার কণ্ঠস্বর।
